ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র

দ্য ওডেসা ফাইল

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

পরাজিত নাৎসী আপরাধীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুসংগঠিত হয়ে একটি মিশনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে আর নিতান্তই ঘটনাচক্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিক পিটার মিলার তাতে জড়িয়ে পড়ে।

মৃত্যুর ঝুঁকি পরোয়া না ক'রে মিলার ভয়ংকর গোপন সংগঠন ওডেসা'র অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লে তাদের মহা-পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার উপক্রম হয়। কিন্তু নিতান্তই কি একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্যে মিলার এতোটা ঝুঁকি নিলো নাকি এর পেছনে রয়েছে তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য – ওডেসা ফাইল পাঠককে বাস্তব পৃথিবীর অজ্ঞাত এক জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে।

'দ্য ওডেসা ফাইল খুবই সুচিন্তিত, গবেষণালব্ধ এবং সুগঠিত একটি উপন্যাস। এটি দারুণ তথ্যসমৃদ্ধ... বিতর্কিতও বটে' *–শিকাগো ট্রিবিউন*

'গল্পটা বোমার মতোই ... পাঠক সাসপেন্স আর উদ্বিগ্নতার মধ্যে পাতা ওল্টাতে থাকবে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যে এই উদ্বিগ্নতা আর থ্রিল ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকবে ...* *–নিউইয়র্ক টাইমস্*

'এর কাহিনী বাস্তবতা থেকে নেয়া, তাই পাঠককে আরো বেশি রোমাঞ্চিত করে' *–ওয়াশিংটন পোস্ট*

'এটি ফরসাইথের আরেকটি জাদুকরী কাজ'

–ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872922-4

বৃটেনে জন্ম নেয়া ফরসাইথ'র শৈশব কেটেছে কেন্ট-এর এ্যাশফোর্ড এলাকায়। ১৭ বছর বয়সে স্কুলের লেখাপড়া শেষ করেন। জঙ্গী বিমানের পাইলট এবং বৈদেশিক সংবাদদাতা হওয়া ছিলো তাঁর জীবনের দুটো উচ্চাভিলাষ। দুটো স্বপ্নই বাস্তবায়িত হয়েছিলো। প্রথমে রয়্যাল এয়ারফোর্সে যোগদান করেন, পরবর্তীকালে বিবিসি এবং রয়টারের সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৭১ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস *দ্য ডে অব দি জ্যাকেল* প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যপী সাড়া প'ড়ে যায়। তাঁর এই উপন্যাস অবলম্বনে হলিউডে নির্মিত হয় তিন-তিনটি চলচ্চিত্র। ক্রমেই জ্যাকেল নামটি গুপ্তহত্যাকারীদের প্রতীক হয়ে ওঠে। এরপর তিনি আরো দশটি চমৎকার থ্রিলার লেখেন যার সবকটিই অসাধারণ জনপ্রিয়তা পায় এবং দীর্ঘদিন বেস্টসেলার হিসেবে শীর্ষস্থান দখল ক'রে থাকে। তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে এ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে সাতটি চলচ্চিত্র।

তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে *দ্য ওডেসা ফাইল, দ্য ডগস্ অব ওয়ার, দ্য ফিস্ট অব গড* এবং *ফোর্থ প্রটোকল* উল্লেখযোগ্য। লেখা লেখি ক'রে কোটি কোটি ডলার উপার্জন করলেও তিনি বলেন, "আমি যখন লিখি তখন সিনেমার কথা মাথায় রেখে লিখি না"– সম্ভবত সত্যিকারের লেখকদের বৈশিষ্ট এমনই হয়।

মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Saftex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2011.02.18 15:06:23 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

তথ্য :

১৯৬৪ সালের বসন্তের শুরুতে জার্মানির বন শহরের মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস-এ অঘোষিত এবং অজ্ঞাত একটা প্যাকেজ এসে পৌছায়। হাতে গোনা অল্প কয়েকজন অফিসারই কাগজের তালিকাটা দেখেছিলো। ঐ প্যাকেজটা 'দ্য ওডেসা ফাইল' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

ওডেসা কি?

ওডেসা দক্ষিণ রাশিয়ার কিংবা আমেরিকার কোনো শহরের নাম নয়। এটা জার্মান ভাষায় *অর্গানাজাইশন ডার এমেলেইন এসএস-এঙ্গেহোরিগেন*-এর আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত একটি শব্দ। যার অর্থ 'এসএস-এর সাবেক সদস্যদের সংগঠন'।

www.boiRboi.blogspot.com

মুখবন্ধ

ইন্টেলিজেন্স বিশ্লেষক তার রিপোর্টটা যখন টাইপ করা শেষ করলো তখন তেল আভিভের আকাশে ডিমের কুসুমের মতো আভা নিয়ে ভোর উদয় হয়েছে। নিজের আড়ষ্ট কাঁধটা এপাশ ওপাশ ক'রে আরেকটা ফিল্টার টিপড্ সিগারেট ধরিয়ে লেখাটা আবারো পড়ে নিলো সে। যে লোকটা এই রিপোর্ট পাঠিয়েছে, ঠিক একই সময়ে সেই লোকটা পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে ইয়াদ ভাশেম নামক একটি জায়গায় প্রার্থনা করছে। তবে বিশ্লেষক ভদ্রলোক এটা জানে না। সে এও জানে না ঠিক কিভাবে এই রিপোর্টটা সংগ্রহ করা হয়েছে অথবা এটা তার কাছে আসার আগে কতোজন লোক মারা গেছে। তার অবশ্য এটা জানার দরকারও নেই। তার কেবল জানা দরকার, এই তথ্যটি সঠিক আর তার নিজস্ব বিশ্লেষণটিও যুক্তিনির্ভর।

তার কাছে যে রিপোর্টটি রয়েছে তাতে একজন নির্ভরযোগ্য এজেন্ট একটি ফ্যাক্টরির নিশ্চিত অবস্থান সম্পর্কে জানিয়েছে। যদি যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাহলে এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, পশ্চিম জার্মান কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনায় প'ড়ে যাবে। এটা রিকমেন্ডমেন্ট করা হয়েছে, যতো জলদি সম্ভব কর্তৃপক্ষের কাছে এই ব্যাপারটি জানিয়ে দেয়া উচিত। এই এজেন্সি মনে করে, এইভাবেই ওয়াল্ডোর্ফ চুক্তির ব্যাপারে বন'র সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের আচরণের ধারাবাহিকতাকে সবচাইতে ভালোভাবে নিশ্চিত করতে পারে। ভালকান নামে পরিচিত প্রকল্পটি নস্যাৎ ক'রে দেয়াই হবে এই সম্মানিত কমিটির মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে, কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, রকেটগুলো কখনই সময় মতো নিক্ষেপিত হতে পারবে না। অবশেষে বলা যায়, এরকমটি হলে মিশরের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেলে সেই যুদ্ধে সাধারণ অস্ত্রই ব্যবহৃত হবে এবং ইসরায়েল জয় লাভ করবে।

বিশ্লেষক রিপোর্টটার একেবারে নিচে স্বাক্ষর ক'রে তাতে তারিখ লিখে দিলো: ফেব্রুয়ারি ২৩, ১৯৬৪ সাল। তারপর সে একটা বেল টিপে একজন ডিসপ্যাচারকে ডেকে সেটা প্রধানমন্ত্রীর অফিসে পাঠিয়ে দিলো।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১

১৯৬২ সালের ২২শে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যুসংবাদ যারা শুনেছিলো তাদের আজও স্পষ্ট মনে আছে সেদিন সে সময় তারা কোথায় কী করছিলো। ডালাস-সময় ১২টা ২২ মিনিটে আঘাত হানা হয়েছিলো তাঁর ওপরে আর তিনি যে মৃত সেই সংবাদটি প্রচার হয়েছিলো সেদিন দুপুর দেড়টায়। নিউইয়র্কে তখন আড়াইটা বাজে, লন্ডনে সাতটা আর হাম্বুর্গে এক হিম-শীতল তুষারপাতের রাত সাড়ে আটটা।

শহরের উপকণ্ঠ অডর্ফ থেকে মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে নিজের গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলো পিটার মিলার। তার মা থাকেন আলাদা বাড়িতে। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নিয়ম ক'রে পিটার তাঁকে দেখে আসে। তাতে ক'রে সপ্তাহান্তে মায়ের কি প্রয়োজন সেটাও জেনে নেয়া হয়, আবার সপ্তাহের একদিন মায়ের দেখাশোনা করবার কর্তব্যও পালন কার হয়। অবশ্য মায়ের বাড়িতে টেলিফোন থাকলে পিটার হয়তো টেলিফোনেই খবরাখবর নিতো। কিন্তু তা যখন নেই তখন তাকে গাড়ি নিয়েই যেতে হয়। মা-ও হয়তো সেইজন্যেই বাড়িতে টেলিফোন রাখেন না।

অন্যসব দিনের মতো আজও তার গাড়ির রেডিও চালু ছিলো। নর্থ ওয়েস্ট জার্মান বেতারকেন্দ্র থেকে গানের মুর্ছনা শুনতে শুনতে অর্ডফ ওয়েতে এসে পড়লো সে। বেশিক্ষণ হয়নি, মাত্র মিনিট দশেক হলো মায়ের ওখান থেকে রওনা হয়েছে। হঠাৎ করেই গানের মাঝে ছেদ পড়লো... অনুষ্ঠান থেমে গেলো। ভয়ার্ত এক কণ্ঠে ঘোষক তার ঘোষনাটি জানালো।

"*আখতুং আখতুং।* একটি জরুরি ঘোষণা। প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হয়েছেন। আবারো জানাচ্ছি, প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হয়েছেন।"

পিটার বিস্ময়ে রেডিওর দিকে তাকালো। ভুল স্টেশন ধরা নেই তো, যারা আজেবাজে গুজব ছড়ায়। না, ঠিকই আছে।

"হায় যিশু!" চাপা কণ্ঠে ব'লে ব্রেক কষলো পিটার।

www.pathagar.blogspot.com

ডান দিকে গাড়িটা সরিয়ে নিয়ে যেতে দেখে সামনের গাড়িগুলো একে একে পেছনের লাল বাতি জ্বালিয়ে ডান দিকের ফুটপাতের পাশে আশ্রয় নিচ্ছে। যেন একই সাথে রেডিও শোনা আর গাড়ি চালানো দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন একটা করলে আর একটা সম্ভব নয়।

রেডিওতে চটুল কোন গানের রেশমাত্র নেই। তার বদলে বাজছে গম্ভীর ফিউনারেল মার্চ সঙ্গীত। মাঝে মাঝেই সেটা থামিয়ে দিয়ে টেলিপ্রিন্টারে সদ্য-আগত খবরগুলো সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। ধীরে ধীরে বোঝা গেলো আসলে কী ঘটেছে ... ছাদখোলা গাড়িতে ক'রে তাঁর ডালাস সিটিতে গমণ...স্কুল বুক ডিপজিটরির জানলায় একজন রাইফেলধারী। কিন্তু গ্রেপ্তারের কোন সংবাদ নেই।

মিলার নিজে একজন সাংবাদিক। তাই তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো এই মুহূর্তে খবরের কাগজ অফিসে কী রকম বিশৃঙ্খলা হতে পারে। চারদিকে নিশ্চয়ই দারুণ ব্যস্ততা এখন। বিশেষ প্রভাতী সংস্করণ বের করতে হবে, স্থানীয় প্রতিক্রিয়া জানতে হবে। তার ওপর আছে টেলিফোন, লাইনগুলো লাইন জ্যাম হয়ে গেছে, সবাই জানতে চায় আরো, আরো অনেক খবর।

মনে হলো দৈনিক সংবাদপত্রের অফিসের কাজটা থাকলে ভালোই হোতো। কিন্তু তিন বছর আগে সে পাট চুকে গেছে। তখন থেকেই সে ফ্রল্যান্স সাংবাদিক। জার্মানির অভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ক'রে ফিচার লেখে, বিশেষ ক'রে ক্রাইম, পুলিশ এবং আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ে। তার মা তার এই পেশাটাকে মোটেই সুনজরে দেখেন না, যতো সব বদলোকের সঙ্গে মেলামেশা। পিটার যতোই তাঁকে বোঝাক যে, আজ সে দেশের মধ্যে বেশ নামকরা সত্যসন্ধানী-রিপোর্টার, কিন্তু তার মা কিছুতেই মানতে রাজি নয় সেটা। রিপোর্টারের পেশা নাকি তাঁর ছেলের যোগ্যই নয়।

রেডিওর সংবাদ শুনতে শুনতে তার মনের কোণে নানান ভাবনা খেলে গেলো। এ ঘটনার নতুন কোন 'অ্যাঙ্গেল' পাওয়া যায় কিনা, জার্মানির ভেতরেই, যেটা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নতুন কিছু লেখা যায়, মূল বিষয়টির পাশে চিত্তাকর্ষক সংবাদ হয়ে উঠবে সেটা?

বন সরকারের প্রতিক্রিয়া তো বন থেকে নিজস্ব প্রতিনিধিরাই পাঠাবেন, কেনেডির গত জুন মাসে বার্লিন সফরের টুকরো টুকরো বিবরণ বার্লিন থেকে তারা উল্লেখ ক'রে জানাবে। ভালো কোন সচিত্র ফিচারের কথাও মনে পড়ছে না যা আবার নতুন ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে জার্মান পত্রিকাগুলোর কাছে বিক্রি করা যায়। এসব পত্রিকাই তো তার বড় ক্রেতা।

জাগুয়ার গাড়ির নরম গদিতে পিঠ এলিয়ে দিয়ে মিলার আয়েশ ক'রে একটা রথ-ডন্ডল সিগারেট ধরালো। কলো তামাকের বিশ্রী কটু গন্ধে গাড়ি ভরে গেলো। এই সিগারেট খাওয়ার জন্যেও তাকে মায়ের কম বকাঝকা খেতে হয়নি!

www.boiRboi.blogspot.com

রেডিও শুনতে শুনতে একসময়ে সিগারেট শেষ হলে জানালার কাঁচ খুলে শেষ অংশটুকু বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। স্টার্ট দিতেই এক্স-কে ১৫০ এস মডেল জাগুয়ারের ৩.৮ লিটার ইঞ্জিনটা শব্দ ক'রে উঠলো। যেনো খাঁচায় বন্দি জাগুয়ারের অক্ষম আক্রোশ। হেডলাইট দুটো জ্বালিয়ে, চট ক'রে পেছনে দেখে নিয়ে, অডর্ফ ওয়ের ক্রমবর্ধমান যানবাহনের ভীড়ে গিয়ে মিশলো মিলার।

স্ট্রেসম্যান স্ট্রাসের মোড়ে ট্র্যাফিক লাইটের লাল আলো জ্বলে উঠলে জাগুয়ারটা থেমে পড়লো। এমন সময় হঠাৎ সাইরেন বাজাতে বাজাতে পেছন থেকে এসে একটা অ্যাম্বুলেন্স লাল আলোর সামনে দিয়ে ডান দিকে ঘুরে ডেইমলার স্ট্রাসে ছুটে গেলো। মিলারের যেনো হঠাৎ কি মনে হলো, সে তার জাগুয়ারটাও চালিয়ে নিয়ে গেলো অ্যাম্বুলেন্সের পেছ পেছন বিশ মিটার ব্যবধান রেখে।

তখনই মনে হয়েছিলো, এটা পাগলামি, সোজা বাড়ি ফিরে গেলেই হোতো। কিন্তু বলা তো যায় না। অ্যাম্বুলেন্স মানেই বিপদ, আর বিপদের পেছনে হয়তো থাকবে কোন সংবাদ। অকুস্থলে আগে গিয়ে পৌছাতে পারলে আর পায় কে! স্টাফ-রিপোর্টাররা তো যখন আসে তখন সব শেষই হয়ে যায়। হয়তো রাস্তায় বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বা জাহাজঘাটে আগুন, কিংবা হয়তো কোন বাড়িঘর পুড়ছে যার ভেতরে রয়ে গেছে কোন শিশু। গাড়ির গ্লোব-কম্পার্টমেন্টে সব সময়েই তার ছোট্ট ইয়াশিকা ক্যামেরাটাও রাখা থাকে ফ্ল্যাশসহ। চোখের সামনে কখন কী ঘটে যায়, কে বলতে পারে।

সরু আর আঁকাবাঁকা বাজে রাস্তা দিয়ে আলটন রেলওয়ে স্টেশনের বায়ে নদীর দিকে অ্যাম্বুলেন্সটা এগোলো। উঁচু ছাদওলা মার্সিডিজ গাড়ি। বোঝা যাচ্ছে পুরো হাম্বুর্গ শহরের রাস্তাঘাট সেটার ড্রাইভারের নখদর্পণে। পাকা হাতও বটে লোকটার, কারণ জাগুয়ারের মতো শক্তিমান এবং সুদৃঢ় সাসপেনশনের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও মিলার বেশ টের পাচ্ছিলো যে বৃষ্টিভেজা নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে যেতে যেতে তার গাড়ির পেছনের চাকা দুটো প্রায়ই পিছলে যাচ্ছে।

মেস্কের অপোটোর্টসের গুদামের পাশ দিয়ে আরো কয়েকটা রাস্তা পেরিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটা এসে দাঁড়ালো। নোংরা এলাকা। গুড়ো গুড়ো তুলার মতো তুষার পড়ছে। রাস্তায় যেটুকু আলো আছে তাও এখন ঝাপসা। দু পাশে ছোট ছোট জীর্ণ বাড়িঘর। যেখানটায় এসে অ্যাম্বুলেন্সটা দাঁড়ালো, সেখানে ইতিমধ্যেই পুলিশের একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। তার ছাদের নীল আলোটা চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ভুতুড়ে ছায়া ফেলছে দরজার পাশে জ'মে থাকা ভীড়টার ওপর।

লম্বা-চওড়া এক দীর্ঘদেহী পুলিশ, গায়ে রেইনকোট, ভীড়টাকে ধমক দিয়ে সরে যেতে বললো, যাতে অ্যাম্বুলেন্স বাড়িটার দরজার একেবারে সামনে দাঁড়াতে পারে। মার্সিডিজটা তখন দরজার ফোকরের সঙ্গে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ড্রাইভার ও আরেকজন সহকারী গাড়ি থামতেই লাফ দিয়ে নেমে অ্যাম্বুলেন্সের

www.boiRboi.blogspot.com

পেছন দিক দিয়ে উঠে একটা খালি স্ট্রেচার বের ক'রে নিয়ে এলো। সার্জেন্টের সঙ্গে দু'একটা কথা বলেই তারা দ্রুত ওপরতলায় চলে গেলো।

প্রায় বিশ গজ দূরে, উল্টো দিকে তার জাগুয়ারটা থামিয়ে মিলার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বোঝাবার চেষ্টা করলো। কোন বাড়িঘর প'ড়ে যায়নি, আগুনও লাগেনি, কোন শিশুও বিপদে পড়েনি। হয়তো নিতান্তই কোন হার্ট অ্যাটাক। গাড়ি থেকে নেমে ঢিলেঢালা ভাবে হাঁটতে হাঁটতে মিলার ভিড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সার্জেন্টের কড়া হুকুমে বাড়িটার আঙিনা থেকে প্রায় অর্ধবৃত্ত হয়ে কিছুটা দুরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষগুলো। দরজা থেকে অ্যাম্বুলেন্সের পেছন দিকে যাবার পথটা ফাঁকা।

মিলার জিজ্ঞেস করলো, "ওপরে গেলে কোন সমস্যা আছে?"

"একশোবার আছে। আপনাকে তো কেউ ডাকেনি মিস্টার," লোকটা রুক্ষভাবে বললো।

"আমি প্রেসের লোক," হাম্বুর্গ সিটির প্রেসকার্ডটা উঁচিয়ে ধরে মিলার বললো।

"আর আমি পুলিশ," হাম্বুর্গটা পাল্টা জবাব দিলো, "কেউ ওপরে যাবে না। একে তো সরু সিড়ি তারপর আবার নড়বড় করছে। অ্যাম্বুলেন্সের লোকগুলো এক্ষুণি নিচে নেমে আসবে।"

যেমন বিশাল দেহ সার্জেন্টের তেমনি মেজাজ। তাকে পাশকাটিয়ে যাবে এমন সাধ্য কার!

"হয়েছেটা কি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"উহু, কোন কিছু বলতে পারবো না। থানায় গিয়ে খোঁজ নেবেন।"

সাদা পোশাক পরা একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজায় এসে দাঁড়ালো। ফোক্সওয়াগনের পুলিশ-গাড়িটার ঘুরতে থাকা আলোর রেখা এসে তার মুখে পড়তেই মিলার চিনতে পারলো। একসময় হাম্বুর্গ সেন্ট্রাল হাইস্কুলে তারই সহপাঠী ছিলো সে। এখন হাম্বুর্গ পুলিশে আছে, জুনিয়র ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর, কর্মস্থল আলটা সেন্ট্রাল থানা।

"এই যে, কার্ল!"

নাম ধরে তাকে ডাকছে ব'লে ইন্সপেক্টর মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। পুলিশের সাইরেনের ঘুরতে থাকা আলোটা মুখের ওপর পড়তেই দেখতে পেলো মিলার দাঁড়িয়ে রয়েছে হাত উঁচু ক'রে। বন্ধুকে দেখেই হাসির রেখা ফুটে উঠলো মুখে, কিছুটা আনন্দে আবার কিছুটা বিরক্তিতে। সার্জেন্টের দিকে মাথা ঝাকিয়ে বললো, "ঠিক আছে সার্জেন্ট, সে কোন সসমস্যা না, নিতান্তই গোবেচারা।"

সার্জেন্ট দরজা থেকে হাতটা নামিয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে হুট ক'রে মিলার ভেতরে ঢুকে পড়লো। কার্ল ব্রান্ডটের সাথে শক্ত ক'রে হাত মেলালো।

"তুমি এখানে কি করছো?"

www.boiRboi.blogspot.com

"এই তো, অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে পেছনে চলে এলাম আর কি।"

"তুমি শালার শকুন! আজকাল করছোটা কি?"

"ওই সেই একই কাজ, খুঁটি ছাড়া সাংবাদিক।"

"হুঁ...দেখেই বুঝেছি বেশ আছো। ছবির ম্যাগাজিনগুলোতে তো প্রায়ই তোমার নাম দেখি।"

"জীবিকা, বুঝলে।" বলেই মিলার প্রসঙ্গ পাল্টায়। "কেনেডির খবর শুনেছো?"

"হ্যা, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ডালাস শহর তোলপাড় ক'রে ফেলেছে এতোক্ষণে। ভাগ্যিস আমার এলাকায় হয়নি।"

বাড়িটার সামনের ঘরের দিকে মিলার ঘাড় ঢুকিয়ে দেখলো। একটা বাল্ব থেকে নিস্প্রভ আলো এসে দেয়ালের কুঁক্‌ড়ে যাওয়া ওয়াল-পেপারে হলুদ আভা ছড়িয়েছে।

"আত্মহত্যার কেস, গ্যাসে। দরজার নিচ দিয়ে গন্ধ আসাতে প্রতিবেশীরা আমাদের খবর দিয়েছে। ভাগ্য ভালো, কেউ দেশলাই জ্বালায়নি, পুরো জায়গাটা একেবারে গ্যাসে ভ'রে ছিলো।"

"ফিল্মস্টার না তো?" মিলার জানতে চাইলো।

"হ্যা, এই সব জায়গায় তো তারাই থাকে! আরে, সামান্য একজন বুড়ো লোক। এতো দিন মরেই ছিলো। আজ নতুন ক'রে সত্যি সত্যিই মরলো। রোজ রাতেই এরকম দু'একটা ঘটনা ঘটে।"

"তা, বুড়োটা মরে যেখানেই যাক না, এখানকার চেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকবে না, কি বলো?"

ইন্সপেক্টর হাসলো শুধু। সিঁড়িতে খটমট শব্দ হতেই মুখ ঘুরিয়ে দেখলো স্ট্রেচার নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের লোক দুটো নামছে। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে তারা চিৎকার ক'রে বলছে, "স'রে দাঁড়ান... স'রে দাঁড়ান ... ওরা নামছে।"

সার্জেন্ট সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টাকে ঠেলে আরো একটু দুরে সরিয়ে দিলো। অ্যাম্বুলেন্সের লোক দুটো রাস্তায় এসে মার্সিডিজের পেছন দিকে চললো তারা। ব্রান্ডট ওদের পেছন পেছন এগোতে থাকলে মিলারও তাকে অনুসরণ করলো। মরা মানুষটাকে দেখার কোন আগ্রহই তার নেই, শুধু ব্রান্ডটকে নীরবে অনুসরণ ক'রে গেলো। অ্যাম্বুলেন্সের প্রথম লোকটা মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে দিলে মিলারকে ঘুরে বললো, "নিয়মরক্ষা, বুঝলে। রিপোর্টে তো লিখতে হবে যে শবদেহ নিয়ে আমি অ্যাম্বুলেন্সে গিয়েছিলাম, তারপর মর্গে।"

মর্সিডিজের ভেতরে আলোটা উজ্জ্বল। আত্মঘাতী লোকটার মুখের ওপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সেকেন্ড দুয়েকের জন্যে। দেখেই মনে হলো এমন কুৎসিত মুখ এর আগে কখনো দেখেনি। গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় অবশ্য চামড়া কুঁচকে গেছে, ঠোঁটে

নীলচে রঙ লেগেছে, তবুও লোকটা যখন বেঁচে ছিলো তখনো নিশ্চয়ই সুদর্শন ছিলো না। মাথায় শুধু কয়েকটা লম্বা চুল, বাঁধানো দাঁতের পাটি দুটো না থাকায় দু গাল গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যেনো হরর ফিল্মের কোন প্রেত। ঠোঁট দুটো লম্বালম্বি সেলাই দেয়া। সবচেয়ে বীভৎস ব্যাপার হলো লোকটার মুখের দু'পাশে রগের কাছ থেকে মুখ পর্যন্ত গভীর ক'রে টানা দুটো লম্বা ক্ষতচিহ্ন।

www.boiRboi.blogspot.com

চট ক'রে একবার মৃতদেহের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ব্রান্ডট আবার কম্বল টেনে দিলো লাশটার মুখে। অ্যাম্বুলেন্সের লোকটার দিকে চেয়ে মাথা নাড়তেই, সে স্ট্রেচারটাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা লক্ ক'রে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসতেই অ্যাম্বুলেন্সটা চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়টাও ফাঁকা হয়ে এলো। যারা তখনও দাঁড়িয়েছিলো তাদের দিকে চেয়ে সার্জেন্ট হাত নেড়ে হুঙ্কার ছাড়লো, "যান এখন। সব শেষ। বাড়িঘর নেই আপনাদের?"

ব্রান্ডটের দিকে তাকিয়ে মিলার ভুরু তুললো। "অপূর্ব।"

"আরে ফালতু সব। যাক, তোমার কোন লাভ হলো না, এই যা।"

"না, সেটা কোন ব্যাপার না। তুমিই-ই তো বললে রোজ রাতেই এমন ঘটনা ঘটে, তো?"

"আজ রাতে তো কেউ এদের খবর লক্ষ্যই করবে না, কেনেডি মরেছে না?" ইন্সপেক্টর ব্রান্ডট ঠাট্টাচ্ছলে হাসলো।

"তোমরা, সাংবাদিকরা একেবারেই পাষাণ!"

"আচ্ছা, তুমিই বলো, কেনেডির মৃত্যু সংবাদ লোকে পড়বে, না এই মরার খবরটা পড়বে? পয়সা দিয়ে তো তারা কাগজ কেনে, নাকি।"

"হ্যা, তা সত্য। আচ্ছা, আমি এখন থানায় গেলাম। পরে দেখা হবে, পিটার।"

দু'জনে হাত মিলিয়ে যে যার গন্তব্যে চলে গেলো। মিলার আলটনা স্টেশনে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে বড় রাস্তা ধরে জাগুয়ার চালিয়ে বিশ মিনিটের মধ্যে এসে পৌছালো হাসা স্কোয়ার-এ। এখানেই রয়েছে তার গাড়ি রাখার গ্যারেজ, মাটির নিচে। আরো দুশো গজ দুরে একটা ভবনে তার ভাড়া করা ফ্ল্যাটটা।

পুরো শীতকালটায় আন্ডারগ্রাউন্ডের গ্যারেজে গাড়ি রাখতে হলে অনেক টাকা লাগে। তবু পিটার এই বেশি ভাড়ার ফ্ল্যাটটা ছাড়ে না, মনে হবে ফুটানি দেখাচ্ছে। ঘরটা তার ভীষণ পছন্দ, উপর থেকে স্টাইভ্যাসেন্টের জনবহুল বুলেভার্ডটা কী সুন্দর দেখায়। পোশাক-আশাক বা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ নেই, কিছু একটা হলেই হলো। যদিও তার উনত্রিশ বছর বয়স, প্রায় ছ'ফুট লম্বা দেহ, এলোমেলো বাদামী চুল আর ঘন নীল চোখ, মেয়েরা তাকে দেখলেই পটে যায়। কাজেই পোশাক-আশাকে কী আর এসে যায়! তার এক বন্ধু তো একবার হিংসার চোটে বলেই ফেলেছিলো, "তুমি শালা মঠে গিয়েও পাখি মারতে পারো!" শুনে সে

www.boiRboi.blogspot.com

হেসেছিলো, তবে ভালোও লেগেছিলো। কথাটা সত্য।

জীবনে তার তিনটি উন্মাদনা আছে: স্পোর্টসকার, রিপোর্টারের পেশা আর সিগ্রিড। অবশ্য কখনো কখনো তার মনে হয়েছে যে, জীবনে যদি স্পোর্টসকার আর সিগ্রিডের মধ্যে কোনো একটাকে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তবে সিগ্রিডকে নিশ্চয়ই নতুন প্রেমিক খুঁজে নিতে হবে। কথাটা মনে হলে সে লজ্জাও পায়, তারপরও কথাটা একদম সত্যি।

গাড়িটা রেখে গ্যারেজের আলোতে জাগুয়ারটার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখলো। কতবার দেখেছে, তবু আশ মেটে না। কতদিন রাস্তাতে দাঁড়ানো অবস্থাতেও গাড়িটাকে বার বার দেখেছে। হয়তো কোন পথিক সেই সময় মিলারের পাশে এসে বলেছেও, "কী সুন্দর গাড়ি, তাই না?" বুঝতেও পারেনি গাড়ির মালিক তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রিল্যান্স রিপোর্টারদের পক্ষে অবশ্য এরকম একটা গাড়ির মালিক হওয়া অসাধারণ ব্যাপার। বিশেষত সেই মডেলের জাগুয়ার, ইংল্যান্ড থেকে যা আমদানি করা হয়েছে আর যার খুচরা যন্ত্রপাতি হাম্বুর্গের মতো শহরেও পাওয়া দুষ্কর।

মিলার নাপিতের দোকানে চুল কাঁটাবার জন্যে বসেছিলো। বেশ ভীড়, অপেক্ষা করতে হচ্ছিলো তাকে। সময় কাটানোর জন্যেই হাতে তুলে নিয়েছিলো পপস্টারদের নিয়ে নানান রকম গুজবে ঠাঁসা একটা পত্রিকা। এইসব পত্রিকার পাতা সে সাধারণত কখনো ছুঁয়েও দেখে না। তবে নাপিতের দোকান ব'লে কথা! মাঝ পাতায় দু'পৃষ্ঠা জুড়ে ছিলো চারজন বাবরি-চুলের ইংরেজ যুবকের কাহিনী, যারা তরতর ক'রে ধূমকেতুর মতো খ্যাতির শিখরে ওঠে আন্তর্জাতিক তারকা বনে গেছে। ছবিটার একেবারে ডান দিকের মুখটা, যার নাক বেশ বড়, তার কাছে বিশেষ অর্থবহ না হলেও অন্য তিনটা মুখ কিন্তু তার স্মৃতির বন্ধ দুয়ারে কড়া নাড়লো। যে দুটো গানের রেকর্ড বিটল নামক ব্যান্ডের চার জনকে খ্যাতির শিখরে পৌছে দিয়েছে, সেই গান দুটো...'প্লিজ প্লিজ মি' এবং 'লাভ মি ডু'...তার মনে অনুরণন না তুললেও মুখ তিনটি তাকে ভাবিয়ে তুললো। দুটো দিন ধরে মনে যেনো আসে-আসে অথচ আসে না। তারপর মনে পড়লো। দু'বছর আগে, ৬১ সালে, রিপারবানের ছোট্ট ক্যাবারে, এই তিন যুবক গান গাইতো। আরো একটা দিন লাগলো তার রেঁস্তোরাটার নাম মনে করতে। কারণ ওখানে তার যাতায়াত ছিলো না। কেবল ম্যাস্কট পাউলির দলের খবর জোগাড় করতে কোন এক আন্ডারগ্রাউন্ড সদস্যের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ওখানে সে একবার গিয়েছিলো। মনে পড়ে গেলো নামটা—'স্টার ক্লাব'। তড়িঘড়ি সে ওখানে চলে গেলো। ৬১ সালের রেকর্ড ঘেঁটে ওদের নাম খুঁজে পেলো। তখন ওরা ছিলো পাঁচ জন, যে তিন জনের ছবি সে দেখেছে তারা এবং অন্য দু'জন—পিট বেস্ট ও স্টুয়ার্ট সাটক্লিফ। তাড়াতাড়ি চললো সেই ফটোগ্রাফারের দোকানে, যে ইম্পেসারিও বার্ট কেম্পফার্টের হয়ে ওদের বিজ্ঞাপনের

ছবিগুলো তুলতো। প্রত্যেকটা ছবির স্বত্ব কিনে নিলো সে। লিখলো অপূর্ব ফিচার-কাহিনী 'হাম্বুর্গ কেমন ক'রে বিটল্‌সদের আবিষ্কার করেছিলো।' জার্মানীর প্রায় প্রত্যেকটা পপ-মিউজিক আর ছবির ম্যাগাজিন তার কাহিনী কিনে নিলো, বিদেশেও প্রচার হলো প্রচুর। সেই টাকায় এক ব্রিটিশ আর্মি অফিসারের কাছ থেকে কিনলো জাগুয়ারটাকে। তারপর নিতান্ত কৃতজ্ঞতাবশেই যেনো কিছু বিটল্‌স-রেকর্ডও কিনেছিলো সে, কিন্তু সেগুলো কেবল সিগি শোনে।

www.boiRboi.blogspot.com

গাড়িটা রেখে যখন নিজের ফ্ল্যাটে চলে এলো তখন মধ্যরাত। মায়ের ওখানে সন্ধ্যাবেলায় প্রচুর খেয়েছিলো, তবু খিদে পেয়ে গেছে। ডিম দিয়ে স্ক্র্যাম্বলড্-এগ্‌স্ বানিয়ে নিলো এক প্লেট। নীরবে সেটা সাবার ক'রে রেডিওটা খুললো। কেনেডি, কেনেডি, কেনেডি, ... এখন শুধু জার্মান দৃষ্টিকোণ থেকে কেনেডি-হত্যার পর্যালোচনা চলছে, কারণ ডালাস থেকে নতুন কোন সংবাদ আসছে না, সেখানে পুলিশ এখনও আততায়ীকে খুঁজছে। পশ্চিম বার্লিনের গভর্নিং মেয়র, উইলি ব্রান্ডট, আবেগড়জড়িত কণ্ঠে কেনেডির ভূয়সী প্রশংসা করলেন...আরো বহু শ্রদ্ধাঞ্জলি আওড়ানো হলো যার মধ্যে ছিলো চ্যান্সেলর লুডভিগ এরহার্ডের শোকবার্তা, প্রাক্তন চ্যান্সেলর কনরাড অ্যাডেনয়ের'র বাণী, যিনি গত অক্টোবরের ১৫ তারিখ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

রেডিও বন্ধ ক'রে শুতে গেলো পিটার মিলার। সিগি বাড়ি থাকলে বেশ হোতো। মন খারপ হলেই বিছানায় তার পাশে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ে সে আর শরীরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে সময় লাগে না। তারপরেই আসে সহবাসের তৃপ্তি, বিষণ্ণতা দূর হয়ে মন স্বচ্ছ হয়ে যায়, প্রশান্ত স্বপ্নহীন নিদ্রায় রাত কখন কেটে যায় টেরই পায় না মিলার। অবশ্য ঠিক সেই মুহূর্তে মিলারের এরকম ঘুম সিগি মোটেও বরদাস্ত করতে পারে না। সহবাসের পরেই কথা বলতে সে ভালোবাসে—কবে আমরা বিয়ে করবো, ছেলেমেয়ে হবে...ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যে ক্যাবারেতে সে কাজ করে সেটা ভোর চারটার আগে বন্ধ হয় না। শুক্রবার রাতে তো আরো দেরি হয়। সপ্তাহান্তের ছুটির আগের সন্ধ্যায় রিপারবানে মফস্বলের লোক আর ট্যুরিস্টদের গিজগিজে ভিড় হয়। রেস্তোরার দামের চেয়েও দশগুণ দামে তারা শ্যাম্পেন কিনে দিতে রাজি যে কোন মেয়ের জন্যে যাদের স্বল্পবসন আর স্তনযুগল সুডৌল। আর সিগির বসন তো সংক্ষিপ্ততম আর তার স্তনযুগলও বেশ নাদুসনুদুস।

নীরবে আরো একটা সিগারেট টেনে শুয়ে পড়লো মিলার। ঘুমিয়ে পড়লো প্রায় রাত পৌনে দুটায়। স্বপ্নে দেখলো আলটনা বস্তিতে গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মরে যাওয়া একটা বুড়ো লোকের বীভৎস মুখ।

পিটার মিলার মাঝরাতে যখন হাম্বুর্গে ব'সে ডিম খাচ্ছিলো, তখন কায়রো শহর থেকে একটু দূরে পিরামিডগুলোর কাছে একটা বাড়ির সুসজ্জিত লাউঞ্জে ব'সে

www.boiRboi.blogspot.com

পাঁচজন লোক বেশ আয়েশ ক'রে মদের গেলাসে চুমুক দিচ্ছিলো। বাড়িটা একটা রাইডিং স্কুল সংলগ্ন। সময় তখন রাত একটা। পাঁচ জন লোক ডিনার সেরে মউজ ক'রে আসর জমিয়েছিলো। তাদের খুব ফুর্তি আজ। ঘণ্টাচারেক হলো সুখবরটা এসেছে ডালাস থেকে – আহা, আর পায় কে!

এদের মধ্যে তিন জন জার্মান আর বাকি দু'জন মিশরীয়। রাইডিং স্কুলের মালিকের বাড়ি এটা, কায়রো'র নামিদামি মানুষগুলোর প্রিয় আড্ডাখানা। আশেপাশে প্রায় সাত হাজার জার্মান থাকে – কলোনিতে। তারাও এখন শুতে গেছে, এই বাড়ির মেমসাহেবরাও। বাড়ির কর্তা তো অতিথি-সেবক, অতএব তিনি রয়ে গেছেন এই পাঁচ জনের একজন হয়ে।

বন্ধ জানলার পাশে গদি-আঁটা ইজি-চেয়ারে পিঠ এলিয়ে ব'সে আছে হ্যান্স অ্যাপ্‌লার। আগেকার দিনে ডাঃ জোসেফ গোয়েবল্‌সের নাৎসি তথ্যমন্ত্রণালয়ের ইহুদি-বিশেষজ্ঞ। প্রায় যুদ্ধ হওয়ার সময় থেকেই মিশরে বসবাস, জার্মানী থেকে লুকিয়ে এখানে একে তুলে নিয়ে এসেছিলো ওডেসা। অ্যাপ্‌লার আর এখন অ্যাপ্‌লার নেই, মিশরীয় নাম নিয়ে হয়ে গেছে সালা জাফর। ইহুদি-বিশেষজ্ঞ হিসেবে মিশরীয় প্রশিক্ষা-দপ্তরে কাজ করে। তার হাতে এখন হুইস্কির গেলাস। বাম পাশে যে ব'সে আছে সে-ও একজন গোয়েবলসের প্রাক্তন সহকারী, নাম লুডভিগ হাইডেন। প্রশিক্ষা-দপ্তরে সে-ও কাজ করে। ইতিমধ্যেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'রে মক্কা থেকে একবার ঘুরে আসার পর এখন নাম হয়ে গেছে আল হাজ। নতুন ধর্মের ওপর শ্রদ্ধাভরে হাতে মদের গেলাস না নিয়ে নিয়েছে শুধু কমলার রস। দু'জনেই গোঁড়া নাৎসি।

মিশরীয় দু'জনের একজন হলো কর্নেল সামসেদিন বাদরেন; মার্শাল আবদেল হাকিম আমিরের ব্যক্তিগত সহকারী। মার্শাল আমির পরে মিশরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন, কিন্তু ১৯৬৭ সালের ছ'দিনের যুদ্ধের পর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল বাদরেনের ভাগ্যেও জুটেছিলো অসীম লাঞ্ছনা। কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা।

আজকের রাতের দ্বিতীয় মিশরীয়টি হলো ইজিপসিয়ান সিক্রেট ইনটেলিজেন্স বিভাগ, মউখবরাতের প্রধান, কর্নেল আলি সামির।

ডিনারে ষষ্ঠ অতিথিও একজন ছিলেন। আসলে তিনিই ছিলেন সেই সন্ধ্যার মুখ্য অতিথি। কিন্তু কায়রো সময় অনুসারে রাত সাড়ে ন'টায় কেনেডির মৃত্যু সংবাদ যেই এলো অমনি তিনি রওনা হয়ে গেলেন কায়রোর দিকে। ভদ্রলোক মিশরের জাতীয় পরিষদের স্পিকার, আনোয়ার আল সাদাত, প্রেসিডেন্ট নাসের'র পরে তিনিই প্রেসিডেন্ট হোন।

হ্যান্স অ্যাপ্‌লার গেলাস উঁচিয়ে তুলে ধরলো, "তাহলে...ইহুদিপ্রেমিক কেনেডি মরলো। বন্ধুগণ, আমি টোস্ট করছি।"

"কিন্তু আমাদের গেলাস যে খালি," কর্নেল সামির আপত্তি জানালো।

"আরে, দাঁড়ান," তাড়াতাড়ি গৃহকর্তা পাশের টেবিল থেকে স্কচের বোতল নিয়ে এসে সবার গেলাসে ঢেলে দিলেন।

কেনেডিকে ইহুদিপ্রেমিক আখ্যা দেয়ায় এদের পাঁচ জনের কারো ভুরুই উঁচু হলো না। ১৪ই মার্চ ১৯৬০ তারিখে ইউনাইটেড স্টেট্‌সের প্রেসিডেন্ট ডয়াইট আইজেনহাওয়ার, ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়ন এবং জার্মানীর চ্যান্সেলর কনরাড অ্যাডেনয়ের, নিউইয়র্ক শহরের ওয়ালডর্ফ-অ্যাস্টেরিয়ার হোটেলে গোপনে মিলিত হয়েছিলেন। দশ বছর আগে এরকম একটা মিটিং কল্পনাও করা যেতো না। কিন্তু ১৯৬০ সালে অকল্পনীয় না হলেও ওই মিটিংয়ে যা ঘটলো সেটা তখনো অকল্পনীয়। সেই কারণেই ওই মিটিংয়ের ফলাফল জানতে দশ বছর সময় লেগে গেলো। এমন কি ১৯৬৩-র শেষভাগে ওডেসা এবং কর্নেল সামিরের মউখবরাত যখন ব্যাপারটা প্রেসিডেন্ট নাসেরের গোচরে এনেছিলো, তখনো তিনি এই খবরটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

নেতা দু'জন সেদিন একটা চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, যার ফলে পশ্চিম জার্মানী ইস্রায়েলকে বিনা শর্তে বছরে পাঁচ কোটি ডলার ঋণ দেবে। তবে বেন-গুরিয়ন কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলেন যে টাকা থাকা এক কথা আর অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা বা সেগুলো সরবরাহের কোন নির্ভরশীল সূত্র পাওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা। ছ'মাস পরে ওয়ালডর্ফ-চুক্তি অনুসরণ ক'রে আরেকটা চুক্তি হলো, জার্মানী এবং ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফ্রাঞ্জ জোসেফ স্ট্রাউস ও শিমন পেরেজের মধ্যে। সেই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীর দেয়া ঋণের টাকায় জার্মানী থেকেই অস্ত্রশস্ত্র কিনতে পারবে ইস্রায়েল।

অ্যাডেনয়ের জানতেন যে এই দ্বিতীয় চুক্তি নিয়ে ভীষণ বাদ-প্রতিবাদের ঝড় উঠতে পারে, তাই তিনি কিছুদিন নীরব থাকলেন। ৬১-র নভেম্বরে নিউইয়র্কে প্রেসিডেন্ট জন ফিটজেরালড কেনেডির সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হলো, তখন কেনেডি এই ব্যাপারে তাঁকে চাপ দিয়ে ছিলেন। আমেরিকা থেকে সরাসরি কোন অস্ত্রশস্ত্র ইস্রায়েলে যাক কেনেডি সেটা চান না, অথচ তিনি চান ইস্রায়েল যেনো অস্ত্র পায়, অন্য যেখান থেকেই হোক। ইস্রায়েলের প্রয়োজন—ফাইটার বিমান, ট্রান্সপোর্ট প্লেন, হাউইৎজার ১০৫ মিলিমিটার গোলা, সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাংক, সশস্ত্রবাহিনী পরিবহণের জন্যে সুরক্ষিত গাড়ি, কিন্তু সবার ওপরে ট্যাংক।

সবগুলোই ছিলো জার্মানীর কাছে, হয় ন্যাটো-চুক্তি অনুসারে আমেরিকা থেকে কেনা, নয়তো মার্কিন লাইসেন্সে জার্মানীতেই তৈরি।

কেনেডির চাপে স্ট্রাউস-পেরেস চুক্তি কার্যকর ত্বরান্বিত হলো।

৬৩-র জুনের শেষের দিকে জার্মান ট্যাংকগুলো হাইফাতে আসতে শুরু করলো। ১৫ই অক্টোবর দৃঢ়চেতা চ্যান্সেলর, 'বনের ধূর্ত শিয়াল' কনরাড অ্যাডেনয়ের পদত্যাগ ক'রে অবসর নিয়ে নিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন লুডভিগ

www.boiRboi.blogspot.com

গেরহার্ড, অর্থনৈতিক যাদুকাঠির তিনিই জনক, অতএব জনমত তাঁরই স্বপক্ষে, কিন্তু বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে খুবই দুর্বল তিনি, খুবই অস্থিরচিত্ত তাঁর।

অ্যাডেনয়েরের সময়েও পশ্চিম জার্মান মন্ত্রিসভার কোন এক আভ্যন্তরীণ উপদল থেকে সরব প্রতিবাদ উঠেছিলো, বলা হচ্ছিলো ইস্রায়েলি অস্ত্র-চুক্তিটি স্থগিত রাখা হোক, জার্মানী থেকে তাদের যেন কোনরকম অস্ত্র সরবরাহ না করা হয়। বৃদ্ধ চ্যান্সেলর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত রূঢ় বাক্যে বিপক্ষ দলকে স্তব্ধ ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর এমনই প্রতাপ ছিলো যে তাঁর সময়ে তারা আর কখনো এ নিয়ে কিছু বলেনি।

গেরহার্ড কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইতমিধ্যেই লোকে তাঁকে 'রাবারের সিংহ' খেতাব দিয়েছে। তিনি গদিতে বসতে না বসতেই আবার নীরব কণ্ঠগুলো সোচ্চার হলো। বলা হলো আরব বিশ্বের সঙ্গে সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার খাতিরে ইস্রায়েলি অস্ত্র-চুক্তি স্থগিত রাখা একান্ত কর্তব্য। এরহার্ড দোটানায় পড়লেন। চুক্তিটির স্বপক্ষে সব কিছু ছাপিয়ে ছিলো শুধুমাত্র কেনেডির দৃঢ় মনোভাব—ইস্রায়েল যেনো জার্মানীর মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র পায়।

আর এখন—সেই কেনেডি গুলিতে নিহত। নভেম্বরের ২৩ তারিখের মাঝরাতে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন: নতুন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন কি জার্মানী থেকে এই ব্যাপারে মার্কিনী চাপ তুলে নেবেন? বনের দুর্বলচিত্ত চ্যান্সেলর যদি এই চুক্তি পালন না করেন তবে কি তিনি নীরব থাকবেন? কায়রোর বড় আশা ছিলো যে তিনি নীরব থাকবেন, কিন্তু বস্তুত পরে দেখা গিয়েছিলো যে তিনি তা থাকেননি।

কায়রোর উপকণ্ঠে সে রাতের সেই আনন্দোৎসবে অতিথিদের গেলাস ভরে দিয়ে গৃহকর্তা নিজেরটাতেও কিছু ঢেলে নিলেন। তাঁর নাম উলফগ্যাং লুট্জ, জন্ম ১৯২১ সালে ম্যানহাইমে, জার্মান বাহিনীর প্রাক্তন মেজর তিনি, প্রচণ্ড ইহুদী-বিদ্বেষী, ১৯৬১-তে কায়রোতে এসে নিজেই রাইডিং অ্যাকাডেমি খুলেছেন। কায়ারোর প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক মহলের সঙ্গে আছে তাঁর গভীর আঁতাত, নীল নদের তীরে প্রবাসী এই জার্মান মহলে, বিশেষ ক'রে নাৎসি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর দারুণ ঘনিষ্ঠতা।

হাসি-হাসি মুখে ঘরের সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন তিনি। কেউ কিন্তু বুঝতে পারেনি তাঁর হাসিটা মিথ্যে। অথচ সত্যিই তাই। আসলে তিনি নিজেও ইহুদী, জন্ম যদিও ম্যানহাইমে তবু বারো বছর বয়সে, সেই ১৯৩৩ সালে, প্যালেস্টাইনে চলে এসেছিলেন। যদিও তাঁর নাম ছিলো দায়েভ; ইস্রায়েলি বাহিনীতে তিনি রাভ-সেরেন (মেজর) ছিলেন। সেই সময় মিশরে তিনিই ছিলেন ইস্রায়েলি ইনটেলিজেন্সের মুখ্য কর্তা। পরে ১৯৬৫-র ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে বাথরুমে একটা রেডিও-ট্রান্সমিটার পাওয়া গেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচার চলার পর ২৬শে জুন ১৯৬৫-তে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৬৭-র যুদ্ধের পর যখন হাজার হাজার মিশরীয় যুদ্ধবন্দী বিনিময় হলো তখন তিনি ছাড়া পেয়ে সস্ত্রীক ১৯৬৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরলেন।

কিন্তু যে রাতে কেনেডি নিহত হয়েছিলেন সে রাতে এ সবই ছিলো ভবিষ্যত কালের গর্ভে। সেই মুহূর্তে তিনি শুধু চারটা হাসি-হাসি মুখের দিকে চেয়ে গেলাস উঁচিয়ে ধরেছিলেন। মনে মনে তিনি তখন ছটফট করছিলেন। ডিনার টেবিলে এখানাকার একজন এমন একটা কথা উচ্চারণ করেছে যেটা খুবই জরুরি...কখন এরা যাবে, বাথরুমে গিয়ে ট্রান্সমিটার খুলে সংবাদ পাঠাতে হবে...সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে!

তবুও হাসি-হাসি মুখে টোস্ট করলেন তিনি, "ইহুদিপ্রেমীরা নিপাত যাক! সিরেগ হাইল!"

পরদিন সকালে ন'টার একটু আগে পিটার মিলারের ঘুম ভেঙে গেলো। বিশাল বিছানাটা নরম আর তুলতুলে; পাশ ফিরতেই সিগির ঘুমন্ত শরীরের উত্তাপ এসে লাগে দেহে। আরো কাছে ঘেঁষে এলো যতোক্ষণ না সিগির নিতম্ব তার তলপেটের সথে চেপে রইলো। মূহুর্তেই যৌন কামনায় শরীর জেগে উঠলো।

সিগি তখনো গাঢ় ঘুমে অচেতন। মাত্র চার ঘণ্টা হলো সে ঘুমিয়েছে। বিরক্তিতে বিড়বিড় ক'রে উঠে হুট ক'রে অন্য পাশে ফিরে প্রায় বিছানার শেষ মাথায় চ'লে গেলো। ঘুমের মধ্যেই অস্ফুট কণ্ঠে বললো, "আহ্, সরো তো!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলো মিলার । হাতটা উঁচু ক'রে তুলে চোখ কুচকে সেই আলো-আঁধারিতে ঘড়ি দেখার চেষ্টা করলো। তারপর বিছানা থেকে নেমে তোয়ালের বাথরোবটা গায়ে জড়িয়ে পা টিপে টিপে চ'লে আসলো বসার ঘরে। জানলার পর্দা টেনে ফাঁক ক'রে দিতেই নভেম্বরের ইস্পাত-ধুসর আগ্রাসী আলো এসে ঘণ্ডে ভণ্ডে ফেললো। মুহূর্তের জন্যে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। পিট পিট ক'রে চোখ দুটোকে আলোর সাথে মানিয়ে নিয়ে নিচের স্টইভ্যামের দিকে তাকায়। শনিবারের সকাল, ভেজা মসৃন কালো রাস্তায় গাড়ির প্রবাহ অনেক কম। হাই তুলে আবার চলে এলো রান্নাঘরে কফি বানিয়ে নিতে। দিনের অগুনতি কফির মিছিল শুরু হয়ে গেলো। মা এবং সিগি দু'জনেই তাকে এতো কফি আর সিগারেট খাওয়ার জন্যে বকাঝকা করে, এই দুটো খেয়েই যেনো সে জীবনধারণ করে।

রান্নাঘরে ব'সে দিনের প্রথম সিগারেট আর প্রথম কাপ কফি খেতে খেতে পিটার মনে মনে খতিয়ে দেখলো বিশেষ কোন কাজ আছে কিনা আজ... না, কিছুই নেই। প্রতিটা খবরের কাগজ আর প্রতিটা পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে শুধু প্রেসিডেন্ট কেনেডি হত্যা খবর। কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ ধ'রে এই-ই চলবে। তাছাড়া কোন সংবাদ-কাহিনীও নেই হাতে যে, তদন্ত করবে। তার ওপর আবার শনি-রোববারে অফিসে কারো দেখাও পাওয়া যায় না। বাড়িতে গেলে আবার তারা বিরক্ত হয়। সম্প্রতি তার একটা ধারাবাহিক লেখা শেষ হয়েছে, পাঠক বেশ পছন্দ

www.boiRboi.blogspot.com

করেছে সেটা। রিপারবান নিয়ে লিখেছিলো, হাম্বুর্গের আধ মাইল জুড়ে যে পাপের রাজ্য আছে...নাইট ক্লাব, বেশ্যাবাড়ি আর নানা অপকর্ম... যেনো সোনার খনি, লিখেছিলো কেমন ক'রে ক্রমাগতই প্যারিস, অস্ট্রিয়া ও ইতালী থেকে মাফিয়ারা সেখানে এসে জুটছে। লেখাটার পারিশ্রমিক এখনো পয়নি। ভাবলো পত্রিকা অফিসে গিয়ে আজ সেটার জন্যে তাড়া দিলে কেমন হয়। পরক্ষণেই মনে হলো, থাক, সেটা তো তারা দেবেই, শুধু শুধু তাড়া দেয়ার কি দরকার। এই মুহূর্তে টাকাপয়সার তেমন অভাবও তো নেই। তিনিদিন আগেই ব্যাংক থেকে হিসাবপত্রের কাগজ এসেছে, ব্যালেন্স আছে পাঁচ হাজার মার্ক, কিছুদিন ভালোই চ'লে যাবে।

কাপ ধুতে গিয়ে সিগির পরিষ্কার করা ঝক্‌ঝকে সসপ্যানে নিজের মুখের প্রতিফলন দেখে নিজেকেই ভেঙচি দিয়ে বললো, "শালা, তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে, বুঝেছো, এতো অলস হলে চলে?"

দশ বছর আগে মিলিটারি সার্ভিসের শেষে সিভিলিয়ান ক্যারিয়ার-অফিসার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, "জীবনে আপনি কি হতে চান?"

"কোন অভাব থাকবে না আর কোন কিছু না ক'রে শুধু ঘুরে বেড়াবো।"

আজ এই উনত্রিশ বছর বয়সে ঠিক সে রকমটি না হলেও (হয়তো সেরকম কোনদিন হবেও না) উচ্চাশা হিসাবে তার সেই কামনায় এখও মরচে ধরেনি।

ট্রানজিস্টার নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো সে। দরজাটা সাবধানে বন্ধ ক'রে দিলো যাতে সিগির ঘুম না ভাঙে। শেভ ক'রে গোসল করতে করতে রেডিওর খবর শুনলো। বিশেষ খবর বলতে প্রেসিডেন্ট কেনেডি হত্যার জন্যে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছে, এই। কেনেডি হত্যা ছাড়া অন্য কোন খবরই ছিলো না রেডিওতে। গোসল সেরে রান্নাঘরে গিয়ে আবার কফি বানালো, এবার দু'কাপ। কাপ দুটো শোবার ঘরে বিচানার পাশে ছোট্ট টেবিলে রেখে দিলো। তারপর বার্থরোবটা খুলে ফেলে সিগির বালিশের পাশে গিয়ে বসলো। ওর ফুরফুরে সোনালী চুল বালিশে ছড়িয়ে আছে।

মেয়েটার বয়স এখন বছর বাইশ। স্কুলে ছিলো তুখোড় জিমন্যাস্ট। সিগি বলে যে, সে অলিম্পিকে অনায়াসেই যেতে পারতো, যদি হতচ্ছাড়া বুক দুটো অমন পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে না উঠতো। এমন বেড়ে উঠলো যে, কোন ব্রা'ই ওদের আর দাবিয়ে রাখতে পারলো না। অতএব অলিম্পিকের আশায় ছাই, স্কুল শেষ হতেই স্কুলে শরীরচর্চা শিক্ষকের কাজ নিয়ে নিলো। স্ট্রিপটিজ ড্যান্সার হলো তারও এক বছর পরে, নেহাতই আর্থিক কারণে। শিক্ষকতার বেতনের চেয়ে অন্তত পাঁচগুণ বেশি আয় হয় এখানে।

নাইটক্লাবে চোখের পলক না নামিয়ে পোশাক খুলতে পারে সে, এতোটুকুও আপত্তি নেই। কিন্তু দেহ নিয়ে যদি কেউ রসালো মন্তব্য করে আর সেই মন্ত ব্যকারীকে যদি সে চোখের সামনে দেখতে পায় তাহলে ভীষণ লজ্জা পায়।

পিটার মিলার এটা শুনে হেসে মরে। "না না," সিরিয়াস হয়ে সিগি বলে,

"ব্যাপারটা কি জানো? স্টেজের ওপরে যখন আমি থাকি, আলোর ওপাশে কাউকে দেখতেই পাই না, তাই লজ্জাও পাই না। যদি ওদের দেখতে পেতাম, স্টেজ থেকে নিশ্চয়ই দৌড়ে পালাতাম।"

তবে শোয়ের শেষে কাপড়চোপড় পরে, অডিটোরিয়ামে গিয়ে কারো পাশে বসতে আপত্তি নেই তার। খদ্দেররা যদি একটু পানাহারের জন্যে আহ্বান জানায়, ঠিক আছে। ওখানে ড্রিংক মানে শুধুই শ্যাম্পেন, হয় পুরো বোতল নইলে অন্তত আধ বোতল। অন্য কিছু নিষিদ্ধ। প্রতিটি বোতলের ওপর পনেরো পার্সেন্ট হলো তার কমিশন। যারাই তাকে শ্যাম্পেনের নেমন্তন্ন জানাতো, তারা সবাই ব্যতিক্রম বাদে ঘন্টাখানেক সময় তার পাশে ব'সে তার বুকের দুই পাহাড়ের ভেতরের অতল খাদটাকে দেখে শিহরিত হওয়ার বাসনাতেই ডাকতো। কিন্তু অভীষ্ট সিদ্ধি হতো না তাদের। সিগির অবশ্য খুব দয়া হয়। এইসব লোভী চিতাবাঘগুলোকে দেখে সত্যিই তার দুঃখ হয়। অন্য মেয়েগুলোর মতো হাসির পেছনে ঘৃণার ছুরি লুকিয়ে রাখে না সে।

একবার সে মিলারকে বলেছিলো: "আহারে, বেচারারা! বাড়িতে যদি ওদের কোন ভালো সঙ্গিনী থাকতো!"

"কি বলছো, বে-চা-রা...ওরা বেচারা!" মিলার গর্জে ওঠেছিলো, "একেকটা আস্ত শুয়োর। পকেট ভরতি টাকা আছে ওদের, মজা লোটে সারাক্ষণ!"

"বাহ্, কেউ যদি থাকতো, যারা প্রাণ দিয়ে ওদের ভালোবাসতো, তাহলে কি আর এমন হোতো?" পাল্টা প্রশ্ন করে ওঠে সিগি। ওর এই মেয়েলী যুক্তি প্রায় অপ্রতিরোধ্য।

মিলার ওকে প্রথম দেখেছিলো ম্যাডাম ককেটের বারে। রিপারবানে 'ক্যাফে কিস'র ঠিক নিচেই সেই বারটা। সেটার মালিকও তার পুরনো বন্ধু, খবর-টবর যোগাড় করতে মাঝেমধ্যে যায় তার কাছে। সিগি দীর্ঘাঙ্গী, প্রায় পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা, দেহও সেই রকম। গানের তালে তালে মুখে কামার্ত অভিব্যক্তিগুলো ফোঁটাতে ফোঁটাতে পোশাক খুলছিলো একে একে। মিলার এসব বহু দেখেছে, অপলক দৃষ্টিতে শুধু গেলাসে চুমুকই মারছিলো সে।

কিন্তু মেয়েটার বুকের বাঁধন যখন খুলে গেলো তখন মিলারকেও গেলাস রেখে দু সেকেন্ড ড্যাব ড্যাব ক'রে তাকিয়ে থাকতে হলো। তার সঙ্গী, বারের মালিকটি, তার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বলেছিলো, "হু...দারুণ শরীর, তাই না?"

মিলারের মনে হয়েছিলো প্লেবয় পত্রিকায় মাসে মাসে যেসব দৃষ্টিনন্দন নগ্নিকাদের ছবি বেরোয়, সেগুলোও যেনো এই মেয়ের তুলনায় ফালতু। এর পেশীগুলো এমনই সুগঠিত যে বিনা অবলম্বনে স্তনযুগল সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পর, হাততালি যখন থেমে গেলো, তখন পেশাগত

www.boiRboi.blogspot.com

নর্তকীর ঢঙ ছুঁড়ে ফেলে মেয়েটি দর্শকদের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে সানন্দে হাসলো। আর মিলার মরলো সেই হাসিতেই, নাচ দেখে নয়, তার দেহ দেখেও নয়। সে জিজ্ঞেস করলো তার সঙ্গে পান করতে কি মেয়েটির কোন আপত্তি আছে নাকি। তখন তাকে ডেকে পাঠানো হলো।

বারের মালিকের সঙ্গে মিলার ব'সে আছে দেখে মেয়েটি আর শ্যাম্পেনের অর্ডার দিলো না, শুধু জিন-ফিজ চেয়ে পাঠালো । আশ্চর্য হয়ে মিলার দেখলো সঙ্গী হিসেবে মেয়েটি চমৎকার। তাই শো-এর শেষে তার সঙ্গে তাকে তার বাড়িতে যাবার প্রস্তাব করলো। অনেক ভেবেচিন্তে মেয়েটি রাজি হলো। পাকা ওস্তাদের মতো তাস খেললো মিলার, সে-রাতে মেয়েটির কিছুই করলো না। তখন বসন্তকাল শুরু হয়েছে মাত্র। ক্যাবারে যখন বন্ধ হলো তখন মেয়েটি বিশ্রী একটা ডুফেল কোর্ট পরে তার কাছে এলো। মিলার বোঝে এটা সে ইচ্ছাকৃত পরেছে।

সেদিন দু'জনে শুধু কফি খেলো আর নানান কথাবার্তা বললো। মনের সব উদ্বেগ কেটে গেছে, কাজেই কথার ফোয়ারা ছুটলো। মিলার শুনলো তার নাকি ভালো লাগে পপ মিউজিক, আর্ট, আলস্টারের পাড় ধ'রে ঘুরে-বেড়ানো, সংসার করা আর ছোট ছেলেমেয়ে। তার পর থেকে নিয়ম ক'রে সপ্তাহের ছুটির দিনটাতে সে মিলারের সঙ্গে ঘুরতে বের হোতো, ডিনার খেতো অথবা কোন শো দেখতো তারা, কিন্তু এক সাথে বিছানায় ঘুমাতো না।

তিন মাস পরে, মিলার তাকে বিছানায় নিলো। বললো, ইচ্ছে করলে এখানে তার বাড়িতে এসে থাকতে পারে সিগি। জীবনের গুরুগম্ভীর দিকটাতে সব সময়েই সিগির দৃষ্টি। মনে মনে নিশ্চিত পিটার মিলারকেই বিয়ে করবে। তবে তার মনে প্রশ্ন দেখা দিলো, বিয়ের আগেই পাকাপাকিভাবে তার বিছানায় ওকে পেলে সুবিধা হবে, না, অসুবিধা হবে। সে বুঝতে পারলো যে সে যদি না আসে তবে প্রয়োজন হলে মিলার তার বিছানা খালি রাখবে না, অন্য কাউকে অনায়াসে নিয়ে আসতে পারবে। কাজেই মনস্থির ক'রে ফেললো সিগি। এই বাড়িতেই চলে আসবে সে, এমন মন দিয়ে সংসার করবে, মিলারকে এতো আরামে রাখবে, যে সে ওকে বিয়ে না ক'রে পারবেই না। নভেম্বরের শেষে তাদের দ্বৈতজীবনের বয়স ছ'মাস হবে।

মিলারের মতো লোক, যে ঘরসংসার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতো না, সে-ও স্বীকার করতে বাধ্য হলো সিগি চমৎকার সংসার করে। শুধু তাই নয়, ভোগতৃষ্ণাও তার প্রচুর আর সঙ্গমে তো দারুণ। সরাসরি কখনো বিয়ের কথা না বললেও, সিগি প্রায়শই ইঙ্গিত করে। কিন্তু মিলার না বোঝার ভান করে। তবু ওরা দুজনেই সুখী, বিশেষ ক'রে পিটার মিলার। বিয়ের বন্ধন নেই অথচ বিয়ের সব সুবিধাই পাচ্ছে।

আধ কাপ কফি শেষ ক'রে মিলার বিছানায় সিগির পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে পেছন থেকে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। আলতো ক'রে তার উরুতে আদর করলো। সে জানে, এতে সিগির ঘুম ভাঙবেই। একটু পরেই, উল্লসিত সিগি

www.pathagar.blogspot.com

নড়েচড়ে চিৎ হয়ে শুলো। মিলার আরো নিবিড় হয়ে আদর সোহাগ করলো। আনন্দধ্বনি উঠতে থাকে সিগির ঘুম জড়ানো কণ্ঠ থেকে। তারপর একসময়ে ওরা দু'জনেই উত্তেজনার শিখরে পৌঁছে গেলো। দারুণ এক সঙ্গমের মধ্য দিয়ে দু'জনেই পুলক লাভ করলো, শরীরের প্রেমে যেটা অনিবার্য আর কাঙ্খিত। এই চরম পুলকের ব্যাপারটা ক'জনই বা জানে। এই পাশ্চাত্যেও সেটা, বিশেষ ক'রে মেয়েরা কেবলমাত্র উপভোগ করতে শুরু করেছে। মাস্টার অ্যান্ড জনসন-এর যৌথভাবে লিখিত গবেষণাধর্মী বই-পুস্তক নারীদেরকে শিখিয়েছে কীভাবে পুরুষের কাছ থেকে পুলক আদায় করে নিতে হয়। অবশ্য সিগিকে সেটা আদায় করার দরকার পড়ে না। মিলার এই আধুনিক কৌশলটা বেশ ভালো ক'রেই রপ্ত করেছে।

"ঘুম ভাঙানোর খুব ভালো উপায় বের করেছো দেখছি," পরিতৃপ্ত কণ্ঠে কপট অভিমানের সুরে সিগি বললো।

"তো, এর চেয়ে খারাপ উপায়ও অবশ্য আছে," মিলার রহস্য ক'রে বললো।

"ক'টা বাজে এখন?"

"বারোটা প্রায়।" ইচ্ছে করেই বাড়িয়ে বললো মিলার। তানা হলে সে যদি শোনে এখন মাত্র সাড়ে দশটা, পাঁচ ঘন্টাও ঘুমোতে পায়নি, তাহলে হয়তো রাগে কিছু একটা ছুঁড়েই মারবে। "ইচ্ছে করলে আবার ঘুমোতে পারো। ওঠার দরকার কি?"

"উম-ম্-ম্। তুমি খুব ভালো।" পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো সিগি।

দুটো কাপেরই বাকি কফিটুকু নিঃশেষ ক'রে মিলার বাথরুমের দিকে যেতেই এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলো। বসার ঘরে এসে ফোন ধরলো সে।

"পিটার?"

"হ্য। কে বলছেন?"

"কার্ল?"

মিলার তখনও ঘোরের মধ্যে আছে, কণ্ঠ শুনে চিনতে পারলো না। "কার্ল?"

ওপাশের লোকটা ভীষণ রেগে গেলো। "কার্ল ব্রান্ডট। ব্যাপার কি, ঘুমাচ্ছো নাকি?"

এতোক্ষণে মিলার সম্বিত ফিরে পেলো। "ও, হ্যা, আরে কার্ল, তুমি! কী ব্যাপার? এক্ষুণি ঘুম থেকে উঠেছি।"

"দেখো, ওই যে ইহুদিটা মরলো, তার সম্পর্কে তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

মিলার ঠিক বুঝতে পারলো না। "ইহুদিটা মরলো? ... কে?"

"আরে, কাল রাতে গ্যাসে মারা গেলো না? এটুকুও মনে করতে পারছো না!"

"হ্যা, হ্যা, কাল রাতের কথা আমার মনে আছে। তবে লোকটা যে ইহুদি তা জানতাম না। তো কী ব্যাপার?"

www.boiRboi.blogspot.com

"তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই," পুলিশ ইন্সপেক্টরটি বললো, "তবে ফোনে নয়। কোথাও দেখা করতে পারো?"

সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জাগ্রত হলো। নিশ্চয়ই কিছু আছে, মিলার ভাবে, নইলে ফোনে বলবে না কেন। ব্রান্ডটের মতো চালাক-চতুর পুলিশ তো আর গাঁজাখুরি গল্প নিয়ে মাতামাতি করবে না!

"নিশ্চয়ই। লাঞ্চে ফ্রি আছো?"

"থাকতে পারি।"

"বেশ, যদি ভেবো থাকো এটা গুরুত্বকপূর্ণ কিছু, তবে আমিই না হয় তোমাকে লাঞ্চ খাওয়ালাম আজ। দুপুর একটার সময় বুঝলে... গুজ মার্কেটের ঠিক পাশেই, ওই যে ছোট্ট রেঁস্তোরাঁটা আছে না, ওখানে..." ফোন রেখে দিলো মিলার। বুঝতে পারলো না কিছুই। আলটনার বস্তিতে একটা বুড়ো লোক আত্মহত্যা করেছে, তা ইহুদিই হোক আর হোক তাতে কী এমন রহস্য থাকতে পারে!

লাঞ্চের আইটেমগুলো একে একে খেয়ে গেলো কিন্তু প্রসঙ্গের অবতারণাই করছে না ব্রান্ডট। পরে যখন কফি এলো, শুধু বললো, "কালকের রাতের লোকটা।"

"হ্যা, কি হয়েছে?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"শুনেছো নিশ্চয়ই, যুদ্ধের সময়ে বা তার আগে নাৎসিরা ইহুদিদের ওপর কিসব করতো?"

"হ্যা শুনিছি তো! স্কুলে তো এগুলো রীতিমতো আমাদের গলার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই না?"

মিলার কিন্তু অস্বস্তিবোধ করছে। যখন নয়-দশ বছর বয়সে স্কুলে পড়তো তখন বারবার ক'রে ব'লে দেয়া হয়েছে যে সে এবং জার্মানীর সবাই বিরাট বিরাট যুদ্ধ-অপাধের জন্য দায়ি। কিছু না বুঝলেও তখন সে কথাগুলো মেনে নিতো।

পরে অবশ্য বোঝা যায়নি যে যুদ্ধের ঠিক ওই সময়টিকে শিক্ষক ওকথা বলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করারও কেউ নেই; মুখ খুলতে চান না কেউই, না শিক্ষকেরা, না পিতা-মাতারা। সাবালক হয়ে ওঠে কিছুটা ইতিহাস প'ড়ে তবে সে জেনে নিয়েছিলো। যেটুকু পড়েছিলো তাতেই ঘেন্না ধ'রে গিয়েছিলো। তবে মনে হয়েছিলো যে ওগুলোর সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই। কত আগের কথা; একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগ, ভিন্ন সময়, পরিধি। ওই সব যখন হয়েছে তখন সে তো সেখানে ছিলো না, মা-ও নয়,। অন্তরে ভেতর থেকে কে যেনো তাকে ডেকে বলতো – পিটার মিলার, ওগুলোর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই সে কোন নামও জিজ্ঞাসা করেনি, কোন তারিখও না, কোন বিবরণও নয়। তাই এখন খুবই অস্বস্তি লাগলো, ব্রান্ডট কেন এই ঘৃণিত বিষয়টা উত্থাপন করছে।

কফিতে চামচ নেড়েই চলেছে ব্রান্ডট, অপ্রস্তুত সে, যেনো বুঝে উঠতেই পারছে না কীভাবে শুরু করবে।

www.boiRboi.blogspot.com

অবশেষে বললো, "কাল রাতের ওই বুড়ো লোকটা। জার্মান ইহুদি ছিলো জানো, কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে দিন কাটিয়েছিলো।"

গত সন্ধ্যার সেই স্ট্রেচার, মরা মানুষটার মাথা, সব যেনো মিলারের মনে ভেসে উঠলো। আচ্ছা, ওরা কি এইভাবেই শেষ হয়ে যায়, এটাও নিয়তি! কিন্তু তা কি ক'রে হবে? অন্তত আঠারো বছর আগে মিত্রপক্ষ এসে তাকে মুক্তি দিয়েছিলো, তারপর বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলো। তবু মুখটা বারবার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। এর আগে সে এমন কাউকে দেখেনি যে ক্যাম্পে ছিলো, অন্তত জ্ঞাতসারে তো নয়ই; তেমনি এসএস দলের জল্লাদের কাউকে সে দেখেনি। দেখলে অন্তত বুঝতে পারতো, মানুষটা নিশ্চয়ই ভিন্ন চেহারার হবে।

দু'বছর জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত আইখম্যান-বিচারের কথা মনে পড়ে গেলো তার। সেই সময় কাগজগুলোতে ফলাও ক'রে শুধু সেই খবর বের হোতো, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। কাঁচের বুথের ভেতর সেই মুখটার কথা মনে করতে চেষ্টা করলো সে। তখন কিন্তু মনে হয়েছিলো মুখটা কি সাধারণ, কি অসম্ভব রকমেরই সাধারণ! বিচারকাহিনী প'ড়ে সে প্রথম জানতে পেরেছিলো এসএস'রা কিভাবে তাদের কাজ করতো, কেমন ক'রে তারা পালিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সে সব তো ভিন্ন দেশের ঘটনা – পোল্যান্ড, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া – কত দুরের, কত দিন আগের। মনের মধ্যে কোনরকম ব্যক্তিসম্পর্ক খুঁজে পায়নি তখন।

মনটাকে বর্তমান পরিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ব্রান্ডটের কথায় অস্বস্তির যে বোধটুকু জেগেছিলো তা আবার নতুন ক'রে শুরু হলো।

"হ্য... তা হয়েছে কি?" গোয়েন্দা বন্ধুটিকে বললো।

ব্রান্ডট নীরবে তার অ্যাটাচি কেস খুলে বাদামি কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলো তার দিকে।

"বুড়ো লোকটা একটা ডায়রি রেখে গেছে। আসলে সে অতো বুড়োও নয়, ছাপ্পান্ন বছর বয়স। সে নাকি সেই সময়ে নোট লিখে লিখে জুতো তলায় লুকিয়ে রাখতো, যুদ্ধের পর প্রতিলিপি করেছিলো ওগুলোর। সেগুলোই হলো এই ডায়রি।"

প্যাকেটটার দিকে তাকালো মিলার, দৃষ্টিতে বিশেষ আগ্রহ নেই।

"কোথায় পেলে এটা?"

"লাশের পাশে পড়েছিলো। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাতে বইটা পড়লাম।"

অদ্ভুত চোখে বন্ধুর দিকে তাকায় মিলার। "খারাপ?"

"ভয়ংকর! এতো ভয়ংকর...আমার কোন ধারণাই ছিলো না...ওরা এমন সব কাণ্ড করেছিলো!"

"আমার কাছে এনেছো কেন?"

ব্রান্ডট অপ্রতিভ; শুধু কাঁধ ঝাঁকালো। "ভাবলাম তুমি হয়তো এটা দিয়ে কোন কাহিনী লিখতে পারবে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"এটার মালিক কে এখন?"

"আইনত টউবেরের উত্তরাধিকারীরা। তবে তাদের আমরা কোনদিন খুঁজে পাবো না। অতএব, পুলিশ বিভাগকেই হয়তো এখন এর মালিক বলা যেতে পারে। কিন্তু তারা তো শুধু ফাইলে রেখে দেবে। চাইলে তুমি নিয়ে নিতে পারো। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবে না যে আমার কাছ থেকে পেয়েছো, তাহলে ডিপার্টমেন্টে গোলমাল হবে। আমি তা চাই না।

বিল মিটিয়ে ওরা বাইরে চলে এলো।

"বেশ, পড়বো আমি। কিন্তু এসব নিয়ে উঠে পড়ে নাও লেগে যেতে পারি, ব'লে দিচ্ছি। বড়জোর কোন পত্রিকার জন্যে দু'একটা প্রবন্ধ লিখতে পারি।"

স্মিত মুখে তার দিকে চেয়ে রইলো ব্রান্ডট। "তুমি একটা মানুষখেকো খচ্চর, শালা!"

"উহু," মিলার বললো, "আমি আসলে অন্যদের মতোই, কেবল বর্তমানের শরীক। কিন্তু তোমার কী ব্যাপার? আমি তো ভেবেছিলাম দশ বছর ধ'রে পুলিশ ফৌজে আছো, নিশ্চয়ই এতো দিনে হোমরাচোমরা হয়ে উঠেছো, লোহার মতো শক্ত বুক। খুব বিচলিত হয়ে পড়েছো, না?"

ব্রান্ডট গম্ভীর হয়ে গেলো। মিলারের হাতের প্যাকেটটার দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো সে।

"হ্য, সত্যিই হয়েছি। কখনো ভাবতেও পারিনি এতো জঘন্য ব্যাপার। আর শোনো, সবটাই কিন্তু অতীত ইতিহাস নয়, কাহিনীটার পরিসমাপ্তি ঘটেছে মাত্র গত রাত্রে; এইখানে এই হাম্বুর্গ শহরেই। আচ্ছা, এবার তাহলে চলি, পিটার।"

গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর এই বলে চলে গেলো। সে ধারণাও করতে পারলো না তার তার তথ্য আসলে কতোখানি ভুল।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ২

বাদামি কাগজের মোড়া প্যাকেটটা নিয়ে পিটার মিলার তিনটার একটু পরে ফিরে এলো। বসার ঘরের টেবিলে প্যাকেটটা রেখে চলে গেলো এক মগ কফি বানাতে।

কফি নিয়ে প্রিয় আর্মচেয়ারটায় এসে বসলো সে। হাতের ধরা ধূমায়িমত কফি, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। প্যাকেট খুলতেই শক্ত মলাট দেওয়া ডায়রিটা বের হলো। দৃঢ় বাঁধাই নয়, গোল গোল ক্লিপ লাগানো, লুজ-লিফ ধরনের। যে কোন পৃষ্ঠা বের ক'রে নেয়া যেতে পারে যে কোন সময়, আবার নতুন কোন পৃষ্ঠাও যেকোন স্থানে লাগিয়ে রাখা যেতে পারে।

প্রায় দেড়শো টাইপ করা পৃষ্ঠা। পুরনো নড়বড়ে মেশিনে টাইপ হয়েছে, কেননা কোন কোন অক্ষর জীর্ণ, আবার কোন কোন অক্ষর লাইনের ওপরে বা নিচে মুদ্রিত। অধিকাংশ পৃষ্ঠাই কয়েক বছর আগেকার, অথবা কয়েক বছর ধ'রে হয়তো টাইপ করা হয়েছে, কারণ সাদা কাগজে বয়সের হলদে ছোপ পড়েছে। কিন্তু সামনে পেছনে কয়েকটা নতুন পৃষ্ঠাও আছে, হয়তো কয়েকদিন আগে লাগানো। পাণ্ডুলিপির শুরুতে কয়েকটা নতুন সেরকম পৃষ্ঠায় ভূমিকা এবং শেষেও নতুন কয়েক পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট। দুটোতেই একই তারিখ, ২১শে নভেম্বর, অর্থাৎ দু'দিন আগে। মিলার বুঝতে পারলো লোকটা আত্মহত্যা করবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ওগুলো লিখেছে।

প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই মিলার অবাক। সুন্দর সাবলীল জার্মান ভাষা। পড়েই মনে হয় লেখকের বিদ্যাবুদ্ধি ও রুচি যথেষ্ট উঁচুমানের।

ডায়রির সামনে শক্ত বাঁধাইয়ের ওপর চারকোনা একটা সাদা কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো, তার ওপর একটা বড় সেলোফেন পেপার দিয়ে পেচানো। কাগজটাতে বড় বড় অক্ষরে কালো কালি দিয়ে লেখা: সলোমন টউবেরের দিনপঞ্জী।

মিলার চেয়ারে আরাম ক'রে ব'সে পড়তে শুরু করলো।

www.boiRboi.blogspot.com

সলোমন টউবের : আমার দিনপঞ্জী
ভূমিকা

আমার নাম সলোমন টউবের। আমি একজন ইহুদি এবং মরণোন্মুখ। আমি আমার নিজের জীবনের অবসান ঘটানোর সংকল্প নিয়েছি, কারণ এর আর কোন মূল্য নেই, আর আমার কিছু করবারও নেই। নিজের জীবন দিয়ে আমি যে সমস্ত কাজ করতে চেয়েছিলাম, সব বৃথা হয়েছে। আমি অন্যায় পাপ এবং অর্ধম যা দেখেছি সেগুলো শুধু যে টিকেই আছে তা নয়, তাদের ক্রমোন্নতিও ঘটেছে, অথচ সৎ আর মঙ্গল ধুলোয় লুটিয়ে বিদ্রুপের কশাঘাতে তিরোহিত হয়েছে। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই নির্যাতনে নির্যাতনে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য ক'রে অবশেষে প্রাণ হারিয়েছে, আমার চারদিকে এখন শুধু দেখি সেই উৎপীড়কদের। দিনের বেলায় তাদের মুখ আমি দেখি রাস্তায় আর রাত্রে আমি দেখি আমার স্ত্রী এসথারের মুখ, যে বহুকাল হলো সে মারা গেছে। এতোদিন ধ'রে আমি বেঁচেছিলাম শুধু একটিমাত্র সাধ পুরণের জন্য, কিন্তু এখন আমার সে সাধ কোনদিনই পূর্ণ হবে না মনে হচ্ছে।

জার্মান জাতির বিরুদ্ধে আমার কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই, কারণ তারা জাত হিসেবে ভালো। গোটা একটা জাত কখনো খারাপ হতে পারে না, হয় কিছু ব্যক্তিবিশেষ। ইংরেজ দার্শনিক বার্ক ঠিকই বলেছিলেন: 'সম্পূর্ণ একটি জাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ কী ক'রে আনতে হয় আমি তা জানি না। অন্যায় যৌথ হয় না: বাইবেলেই তো বর্ণিত আছে সোদোম আর গোমরাহ্‌বাসীদের পাপের জন্য প্রভু তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ধ্বংস করতে চাইলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিলো একজন সৎ ব্যক্তি এবং যেহেতু সে ছিলো সৎ, শাস্তি তাকে পেতে হলো না। অতএব মোক্ষলাভের ন্যায়-অন্যায়ও ব্যক্তিগত।

রিগা এবং স্টুটহফের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে যখন আমি বেরিয়ে এলাম, ম্যাগডেবুর্গের মৃত্যু মিছিল সত্ত্বেও যখন আমি বেঁচে রইলাম, ১৯৪৫-এর এপ্রিল ব্রিটিশ সৈন্যরা যখন আমাকে সেখানে মুক্তি দিয়ে দিলো, আমার শরীরটাই মুক্তি পেলেও আত্মা যখন রইলো শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে, তখন জগৎকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম। মানুষজন, গাছপালা, পাহাড়পর্বত, সবার ওপরেই আমার ঘৃণা, কারণ তাদের সবার সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফলেই আমাকে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঘৃণা হলো আমার জার্মানদের ওপর। বারবার নিজেকে আমি প্রশ্ন করলাম, যেমন গত চার বছর ধ'রে আমি বহুবার করেছি, কেন ঈশ্বর এদের সমূলে বিনাশ করছেন না – প্রত্যেকটি শহর নগর, ঘরবাড়ি এবং জীবনের এতিটি চিহ্নকে? কিন্তু যখন এরকম কিছুই ঘটলো না তখন ঈশ্বরের ওপরেও আমার অনাস্থা জন্মালো;

ক্ষুব্ধ অভিযোগে মুখর হলাম যে, তিনিও আমাকে এবং আমাদের জাতিকে ত্যাগ করেছেন। অথচ তিনিই আমাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মিয়েছিলেন যে আমরাই তাঁর পরম প্রিয়! অবিশ্বাসও জন্মালো তখন, বলতে শুরু করলাম ঈশ্বর নেই।

কিন্তু সময়ের অভিঘাতে আমি আবার ভালোবাসতে শিখলাম: ভালোবাসলাম প্রকৃতিকে, পাহাড়পর্বত, গাছপালা আর মাথার ওপরের নীলাকাশ, শহরের ভেতর দিয়ে বহমান নদী, পথের কুকুর, বিড়াল, ইট বাঁধানো রাস্তার পাশে অযত্নে জন্মানো ঘাস কিংবা ফুল, আমার কুৎসিত চেহারা দেখে যে সব ছেলেমেয়ে ভয়ে পালিয়ে যায় তাদেরও। তাদের তো কোন দোষ নেই। ফরাসিতে একটা প্রবাদ আছে: 'সবকিছু বুঝতে হলে সবকিছু ক্ষমা ক'রে দিতে হয়।' মানুষ যখন বুঝতে পারে তাদের দোষত্রুটি, লোভ-লালসা, ক্ষমতালুব্ধতা, অজ্ঞতা, দাপটের কাছে নতিস্বীকারের প্রবণতা, তখনই মানুষ ক্ষমা ক'রে দিতে পারে তাদের, কৃতকর্ম সত্ত্বেও। কিন্তু ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

তবে, কিছু লোক আছে যাদের অন্যায়ের সীমা নেই, অতএব তাদের বোঝাও সম্ভব নয়। তারা সেইজন্যেই ক্ষমাও পেতে পারে না। আর এখানেই রয়েছে আমাদের সত্যিকারের অকৃতকার্যতা। কারণ সেইসব লোক এখনো আমাদের মধ্যে বাস করছে, হোটেল রেঁস্তোরায় খাবার খাচ্ছে, হাসছে, হাত মেলাচ্ছে, সৎ নাগরিকদের 'কমরেড' ব'লেও সম্ভাষণ করছে। সমগ্র জাতির ললাটে তারা শাশ্বতকালের জন্যে তাদেরই ব্যক্তিগত অন্যায় ও অধর্মের ফলে কলঙ্কের কালি লেপন ক'রে দিয়েছে অথচ তারাই আজ সদর্পে সম্মানিত নাগরিক হিসাবে বেঁচে আছে – অপমানিত, লাঞ্ছিত, সমাজ-পরিত্যক্ত হিসাবে নয়। এইটাই হচ্ছে আমাদের অকৃতকার্যতা। আর এই অকৃতকার্যতা তোমার, আমার সবারই। আমাদের ত্রুটি রয়েছে, ভয়ঙ্কর ত্রুটি।

পরিশেষে, কালক্রমে আবার ঈশ্বরের ওপর আমার ভক্তি জন্মালো। আবার তাঁর ক্ষমা চেয়ে নিলাম, তাঁর প্রদত্ত বিধি লঙ্ঘন ক'রে যে সমস্ত অপরাধ করেছি তার জন্যে। সেরকম অপরাধও অসংখ্য। শ্রবণ করো হে ইস্রায়েল...আমাদের প্রভু আমাদের ঈশ্বর...ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়... শেমা ইস্রায়েল...আদৌ নাই এলোহেনু...আদৌ নাই এহাদ...

ডায়রির প্রথম বিশ পৃষ্ঠায় টউ বর্ণনা ক'রে গেছে তার জন্মবৃত্তান্ত, হাম্বুর্গে তার শৈশবকাল, শ্রমিক শ্রেণী-উদ্ভূত তার যুদ্ধনায়ক পিতা এবং ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসার অল্প কিছুদিন পরেই তার মাতাপিতার বিয়োগ। তিরিশ দশকের শেষভাগে তার বিয়ে হয় এসথার নামে এক মেয়ের সঙ্গে যার পেশা ছিলো স্থপতির কাজ। ১৯৪১-এর গোড়ায় তাকে পাকড়াও করবার চেষ্টা হয়েছিলো কিন্তু মালিকের হস্তক্ষেপে সে বিপদ সে কাটিয়ে উঠেছিলো। অবশেষে, মক্কেলের সঙ্গে তার দেখা

www.boiRboi.blogspot.com

করতে যেতে হবে, এইরকম একটা অজুহাতে দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্র্যান্সিট ক্যাম্পে কিছুদিন কাটানোর পর তাকে অন্যান্য ইহুদিদের সঙ্গে পূর্বাঞ্চল-অভিমুখী একটা গবাদি-পশুর ট্রেনে ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মনে করতে পারি না কত দিন পর ট্রেনটা একটা রেলওয়ে স্টেশনে এসে থেমেছিলো। যতোদূর মনে পড়ে, বার্লিনে যেদিন আমরা ট্রাকে উঠলাম, তার ছ'দিন সাত রাত পরে। ট্রেনটা হঠাৎই থেমে গিয়েছিলো। সাদা আলোর চিলতে দেখে বুঝেছিলাম বাইরে এখন দিন। ক্লান্তি, অবসাদ আর দুর্গন্ধে আমার মাথা ঘুরছিলো।

বাইরে হৈচৈ শোনা যাচ্ছিলো, লোহার শেকল খুলে দেবার আওয়াজও। দরজাগুলো সশব্দে হঠাৎ খুলে গেলো। ভাগ্যিস নিজের চেহারা নিজে দেখতে পাইনি! আমি সাদা সার্ট ও ট্রাউজার্স পরেছিলাম (টাই এবং জ্যাকেট অনেকদিন হলো মেঝেতে ফেলে দিয়েছি) অন্যদের চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম আমার অবস্থা এখন কেমন!

উজ্জ্বল রোদ এসে গাড়িতে ঢুকতেই অনেকে আঙুল দিয়ে দু'চোখ টিপে ব্যথায় ককিয়ে উঠলো। দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে আমি আগেই চোখ বন্ধ ক'রে রেখেছিলাম যাতে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ ঝলসে না যায়। মানুষের ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতিতে গাড়িবোঝাই লোকজন ভারসাম্য রাখতে না পেরে প্ল্যাটফর্মের ওপর ছিট্‌কে পড়লো। বিশ্রী দুর্গন্ধের ভাপ উঠলো পুরো জায়গাটাতে। দরজাটা গাড়ির মাঝখানে থাকায় আর আমি পেছন দিকে একটা পাশে দাঁড়িয়েছিলাম ব'লে কোনমতে চোখ অর্ধেক খুলে সোজা হয়ে প্ল্যাটফর্মে নামতে পেরেছিলাম।

যে এসএস রক্ষীগুলো দরজা খুলেছিলো তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায় কত বর্বর ওরা, গজগজ ক'রে কি সব বলছিলো কিন্তু ভাষাটা বুঝতে পারলাম না। ঘৃণায় বিরক্তিতে ওরা একটু সরে দাঁড়ালো। বক্স-কারের মধ্যে একত্রিশজন মানুষ হয় মুখ থুবড়ে নয়তো গুঁটিসুটি মেরে পড়ে গেলো। তারা আর কোনদিন উঠবে না। বাকি রইলাম আমরা। অভুক্ত, প্রায় অন্ধ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছেড়াফাড়া পোশাকে দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে কোনমতে দাঁড়িয়ে রইলাম প্ল্যাটফর্মের ওপর। তৃষ্ণায় আমাদের জিভ গলায় গিয়ে আঁটকে আছে, মুখ কালো হয়ে ফুলে উঠেছে, ঠোঁটগুলো ফেঁটে চৌচির।

প্ল্যাটফর্মে বার্লিন থেকে আগত আরও চল্লিশটা ট্রেনের বগি আর ভিয়েনা থেকে আঠারোটা তাদের যাত্রীদের যেনো উগলে দিচ্ছিলো। এদের বেশির ভাগই নারী এবং শিশু। অধিকাংশ নারী এবং প্রায় সবকটি শিশুই নিরাবরণ, সর্বাঙ্গে বমন-বিষ্ঠা। তাদের অবস্থাও আমাদের মতোই সাংঘাতিক। কয়েকটি মহিলাকে দেখলাম মৃত শিশু কোলে নিয়ে আলোর মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে নামছে।

রক্ষীদের পেছনে দাঁড়িয়েছিলো একদল ভীত অসহায় মানুষের দল। তাদের

পরনের কামিজ ও প্যান্ট জীর্ণ আর নোংরা। প্রত্যেকের বুকে ও পিঠে কালো কাপড়ের পট্টিতে লেখা: 'ই'। এরা একটা বিশেষ কমান্ডো, ঘাঁটি থেকে এসেছে, ট্রেনগুলো থেকে লাশ নামিয়ে শহরের বাইরে সেগুলোকে কবর দেবে। ওদের আবার পাহারা দিচ্ছে ছয় জন লোক, তাদেরও বুকে পিঠে 'ই', তবে তাদের বাহুতে আছে আর্মব্যান্ড আর হাতে গাঁইতির হাতল। এরা ইহুদি কাপো, যা করতে বলা হয় তা যদি এরা করে তো অন্যান্য বন্দীদের চেয়ে এরা ভালো খাবারটাবার পায়।

স্টেশন-দালানের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলো কয়েকজন জার্মান এসএস অফিসার। আমার চোখ আলোতে অভ্যস্ত হওয়ার পর আমি তাদের দেখতে পেলাম। তাদের একজন দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে, একটা বড় প্যাকিং বাক্সের ওপর। ট্রেন থেকে যে কয়েক হাজার কংকালসার মানুষ নামলো তাদের দিকে চেয়ে তার মুখে পরিতৃপ্তির সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠলো। সবুজ ইউনিফর্ম, তাতে কালো পটভূমিতে রূপালী এসএস প্রতীক যেনো বিশেষ ক'রে তার জন্যেই তৈরি। ডান দিকের কলারের ওপর ওয়াফেন এসএস-এর যুগ্ম বিদ্যুৎ রেখা। বাম দিকে তার র‍্যাংক চিহ্ন... ক্যাপ্টেন।

লোকটা লম্বা একহারা চেহারার; চুলের রঙ হালকা বাদামী, নীল চোখ দুটো যেনো বৃষ্টিধোয়া। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম লোকটা ভয়ংকরর ধর্ষকামী। ইতিমধ্যেই রিগার কশাই নামে সে খ্যাত হয়ে গিয়েছিলো, সেই নাম পরে মিত্রশক্তিও ব্যবহার করেছিলো। সেই প্রথমবার আমি দেখলাম এসএস ক্যাপ্টেন এডুয়ার্ড রশম্যানকে।

১৯৪১-এর ২২শে জুন, ভোর পাঁচটায় হিটলারের ১৩০টি ডিভিশন তিনটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে রাশিয়া আক্রমণের জন্য সীমান্ত পেরিয়ে এগিয়ে গেলো। প্রতিটি বাহিনীর পেছনে পেছনে ঝাঁকে ঝাঁকে চললো এসএস বাহিনী হিটলার হিমলার এবং হেইড্রিখের নির্দেশ ছিলো সেনাবাহিনী যে সব এলাকা দখল করতে করতে এগিয়ে যাবে, সেই সব এলাকা থেকে কম্যুনিস্ট কমিশারদের আর গ্রামীণ ইহুদি পরিবারদের নির্মূল ক'রে দিতে হবে, শহরের ইহুদিদের প্রতিটি বড় শহরে বন্দীশিবির স্থাপন ক'রে সেই খোঁয়াড়ে আঁটকে রাখতে হবে পরবর্তী বিশেষ ব্যবস্থা'র জন্যে।

সৈন্যবাহিনী লাটভিয়ার রাজধানী রিগা অধিকার করলো ১লা জুলাই ১৯৪১ সালে। ওই মাসের মাঝামাঝি এসএস কমান্ডোদের প্রথম দলটা এসে সেখানে পৌছালো। ১লা আগস্ট এসএস থেকে রিগাতেই তাদের স্থানীয় এসডি এবং এসপি বিভাগ খোলা হলো, এখান থেকেই পরিচালনা করা হবে সেই নির্মূল-পরিকল্পনা যা দিয়ে গোটা অস্টল্যান্ড (অধিকৃত তিনটি বাল্টিক রাজ্যের নতুন নাম) ইহুদিবিহীন করা হবে।

তারপর বার্লিনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার ইহুদিদের

www.boiRboi.blogspot.com

নিধনের জন্যে রিগাকে ট্র্যানজিট ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করা হবে। ১৯৩৮ সালে ৩,২০,০০০ ছিলো জার্মান ইহুদি আর ১,৮০,০০০অস্ট্রিয়ান ইহুদি...মোট পাঁচ লাখ। ১৯৪১-এর জুলাই পর্যন্ত হাজার হাজার ইহুদির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, বিশেষ ক'রে সাশেনহাউসেন, মাউথাউসেন, র‍্যাভেন্সব্রুখ, ডাচাউ, বুখেনওয়াল্ড, বলসেন এবং বোহেমিয়ার থেরেমেয়েনস্টাডে। কিন্তু ওগুলো ক্রমশ ভরে উঠছিলো, তাই পূর্বাঞ্চলের অখ্যাত স্থানগুলো অবশিষ্ট ইহুদিদের সমূলে বিনাশের জন্য উপযুক্ত জায়গা ব'লে মনে হলো। অবশ্য ততোদিনে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। ছয়টি নির্মূল কেন্দ্র নতুন ক'রে বানাতে হলো আর যেগুলো আছে সেগুলোও বাড়াতে হলো। এগুলো হলো অউশউইৎস, ত্রেব্লিঙ্কা, বেলজেক, সবিবর, চেল্মানো ও ময়দানেক। কিন্তু যতোদিন না সেগুলো তৈরি হচ্ছে ততোদিন এমন একটা জায়গা তো দরকার যেখানে যতোটা সম্ভব ইহুদিদের বিনাশ করা আর বাকি লোকগুলোকে 'মজুত' ক'রে রাখা যায়। রিগাকে পছন্দ করা হলো সেই অভাব পূরণের জন্যে।

১লা আগস্ট ১৯৪১ থেকে ১৪ই অক্টোবর ১৯৪৪ পর্যন্ত ২,০০,০০০ জার্মান ও অস্ট্রিয়ান ইহুদিকে রিগায় পাঠানো হয়েছিলো, যার মধ্যে ৮০,০০০ ওখানেই মৃত্যু বরণ করলো আর বাকি ১,২০,০০০ জনকে পোল্যান্ডের সেই ছয়টা নির্মূলকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিলো। এর মধ্যে মোট ৪০০ জন বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছিলো, যার মধ্যে আবার অর্ধেকেরও বেশি স্ফুটহফ এবং ম্যাগডেবুর্গের মৃত্যু-মিছিলে মৃত্যুবরণ করেছিলো। রাইখ জার্মানী থেকে রিগায় পাঠানো ইহুদিদের মধ্যে টউবেরদের দলই প্রথম। তারা সেখানে পৌছেছিলো ১৮ই আগস্ট ১৯৪১ সালে, বেলা ৩টা ৪৫মিনিটে।

রিগার বন্দীশিবিরটা ছিলো সেই শহরের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আগে রিগার ইহুদিদের বাস ছিলো এই অঞ্চলে, কিন্তু আমি যখন পৌছেছি তখন তারা কয়েকজন মাত্র ছিলো সেখানে। তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের ভেতর রশম্যান এবং তার সহকারী ক্রাউস ওপর মহলের নির্দেশে তাদের সম্পূর্ণ নির্মূল ক'রে দিয়েছিলো।

শিবিরটা ছিলো শহরের উত্তর-প্রান্তে, যার পরেই উত্তর দিকে অবারিত মাঠ। দক্ষিণ দিকটায় ছিলো পাকা দেয়াল, অন্য তিন দিকে কয়েক সারি কাঁটাতারের বেড়া। একটিমাত্র প্রবেশপথ, উত্তর দিক দিয়ে তার ভেতর দিয়েই যাতায়াত কার হোতো। দু'পাশে ওয়াচ-টাওয়ার, পাহারা দিতো লাটভিয়ান এসএস বাহিনী। প্রবেশপথ থেকে শিবিরের মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণ দিকের দেয়াল পর্যন্ত, নাম 'মেজ কালনু ইয়েলা' বা ছোট পাহাড়ের রাস্তা। দক্ষিণ থেকে উত্তর গেটের দিকে মুখ করলে ডান পাশে পড়তো 'ব্লোখ প্লাৎস' বা টিন স্কয়ার: এইখানেই কাকে মারা হবে না হবে তার নির্বাচন করা হতো, হাজিরা নেয়া,

বন্দীদের দিয়ে কাজ করানো, চাবুক মারা, আর ফাঁসিও দেয়া হোতো এখানে। চত্বরের ঠিক মাঝখানে ছিলো বিশাল ফাঁসিমঞ্চটা, আটটা লোহার আঙটা থেকে সবসময়ই ঝুলে থাকতো আটটা ফাঁস। প্রতি রাতে অন্তত ছ'জন অভাগার শরীর এখান থেকে ঝুলে পড়তো।

www.boiRboi.blogspot.com

পুরো শিবিরটার আয়তন ছিলো প্রায় দুই বর্গমাইল। এককালে এটা ছিলো একটা উপশহরের মতো যেখানে বারো থেকে পনেরো হাজার লোক বাস করতো। আমাদের আসার আগে রিগার ইহুদিরা, অন্তত যে দু'হাজার তখনো ছিলো, তারা ইট তুলে তাদের জায়গার অংশ আলাদা ক'রে নিয়েছিলো। ফলে যে পাঁচ হাজার নর-নারী, শিশু আসলো তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত স্থান ছিলো। কিন্তু আমরা আসবার পর থেকে দিনের পর দিন নতুন দল আসতে থাকলো: শিবিরে আমাদের এলাকাতেই লোকের সংখ্যা হয়ে গেলো ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার। তখন শুরু হলো বিয়োগের খেলা: নতুন যতোজন আসে ঠিক ততোজন পুরনো বাসিন্দাকে শেষ ক'রে ফেলা হয়, যাতে জায়গার অভাব না হয়। নইলে অত্যধিক ভিড়ে আমরা যারা খাটতে পারি তাদের স্বস্থ্য ভেঙ্গে যাক, রশম্যান সেটা কিছুতেই হতে দেবে না।

প্রথমদিন সন্ধ্যায়, আমরা গুছিয়ে বসলাম, প্রত্যেকের ভাগ্যে জুটলো একটা ক'রে ঘর। সত্যিকারের বিছানা, পর্দা আর কোট টেনে গায়ে দিয়ে কম্বলের অভাব মেটালাম। কল থেকে প্রাণভরে পানি খেয়ে নিয়ে আমার পাশের ঘরের পড়শী তো ভাবলো যে হয়তো এমন কিছু খারাপ হবে না ব্যাপারটা। কিন্তু তখনো আমরা রশম্যানের দেখা পাইনি।

গ্রীষ্ম থেকে শরৎ তারপর শীত। শিবিরের অবস্থা ক্রমেই অবনতি হলো। রোজ সকালে প্রত্যেককেই লাটভিয়ান পাহারাদারদের রাইফেলের গুঁতা আর ডাণ্ডার বাড়ি খেতে খেতে টিন স্কয়ারে সারি বেঁধে দাঁড়াতে হোতো। অধিবাসীদের বেরিশভাগই পুরুষ: কারণ পুরুষদের অনুপাতে নারী এবং শিশুদের এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক বেশি সংখ্যায় শেষ ক'রে দেয়া হয়। সারি বেধে দাঁড়ানোর পর হাজিরা ডাকা হয়। নাম ধরে কাউকে ডাকে না: গুণে গুণে আমাদের কাজের হিসাবে কয়েক ভাগে ভাগ ক'রে ফেলে। শিবিরের প্রায় সবাইকেই স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে, সারি বেঁধে দলে দলে পাঠিয়ে দেয়া হয় বাধ্যতামূলক কাজে, কাছাকাছি যে সমস্ত কারখানা গ'ড়ে উঠছে সেগুলোতে, বারো ঘণ্টাক'রে একনাগাড়ে বেগার খাটতে।

আমি আগেই বলেছি যে, আমি কাঠেরমিস্ত্রি ছিলাম। কথাটা কিন্তু সত্যি নয়। তবে স্থপতি হিসাবে আমি কাঠমিস্ত্রিদের কাজ অনেক দেখেছি, কাজেই চালিয়েও নিতে পারি। ভেবেছিলাম কাঠমিস্ত্রিদের চাহিদা নিশ্চয়ই থাকবে, অতএব ততো দিন আমাকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলা হবে না। আমার অনুমান ঠিকই হয়েছিলো। কাছাকাছি

www.boiRboi.blogspot.com

একটা কাঠের কলে আমাকে কাজে পাঠানো হলো। সেখানে স্থানীয় পাইনগাছগুলোকে কেটে কেটে সেনাবাহিনীর জন্যে ঘর বানানো হচ্ছিলো।

ভীষণ পরিশ্রমের কাজ, ভালো স্বাস্থ্যবানেরাও হয়তো সহ্য করতে পারতো না। পুরো গ্রীষ্মকাল এবং শীতকালটাও আমাদের বাইরে অসহ্য ঠাণ্ডা আর লাটভিয়ার স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় কাজ করতে হোতো।

খাওয়ার বরাদ্দ ছিলো আধ লিটার তথাকথিত সুপ, যেটা আসলে ময়লা পানি, কখনো কখনও অবশ্য এক-আধটা আলুর টুকরোও ভাসতো। সকালে কাজে যাওয়ার আগে আমাদের সেটা দেয়া হোতো। তারপর রাতে শিবিরে ফিরে এলে আবার আধ লিটার ওই জিনিস, সঙ্গে কালো রুটির এক টুকরো আর পচা সিদ্ধ আলুর টুকরো।

শিবিরে খাদ্যবস্তু আনলে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি, সন্ধ্যার হাজিরা ডাকার সময় টিন স্কয়ারে সারি বেঁধে লোকগুলোর চোখের সামনে। তবু সেই ঝুঁকিটুকু না নিলে এমনিতেও না খেয়ে মারা যেতে হবে।

সন্ধ্যাবেলায় দলগুলো যখন ধুঁক্‌তে ধুক্‌তে অবসন্ন পায়ে ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকতো তখন রশম্যান আর তার কিছু সাঙ্গোপাঙ্গো প্রবেশমুখে দাড়িয়ে এলোপাথাড়ি চেক করতো। হঠাৎ কোন একজন পুরুষ বা নারী বা শিশুকে ডেকে হুকুম করতো ফটকের একপাশে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে। যদি এক টুকরো রুটি বা একটা আলু পাওয়া যেতো তাদের শরীরের কোথাও তো তাদের সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে সবাইকে মার্চ করিয়ে টিন স্কয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে দিতো হাজিরার জন্যে।

সবাই সারি বেঁধে দাঁড়ালে রশম্যান দৃপ্তভঙ্গিতে এগিয়ে আসতো। পেছনে পেছনে এস এস রক্ষীদের পাহারায় ওই হতভাগা মানুষগুলো, হয়তো বা তারা দশ-বারো জন। তাদের মধ্যে যারা পুরুষ তারা গিয়ে উঠতো ফাঁসিমঞ্চে, কাঠের চারকোনা চেয়ারে ব'সে গলায় ফাঁসির দড়ি পরে অপেক্ষা করতো কখন তার হাজিরা শেষ হবে। তারপর রশম্যান এগিয়ে যেতো সেই ফাঁস গলায় লাগিয়ে থাকা সারিবদ্ধ লোকগুলোর দিকে। উঁচু চেয়ারে ব'সে থাকা লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ চেয়ারে লাথি মেরে সেটা সরিয়ে দিতো। লোকটা হ্যাঁচকা টানে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়তো। সামনাসামনি মুখের দিকে চেয়ে কাজটা করতে ভালোবাসতো রশম্যান, যাতে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটা তার মুখ দেখতে পায়। কখনো কখনো চেয়ারে লাথি মারার জন্যে পা পিছিয়ে নিয়েই ঠিক মোক্ষম সময়ে থেমে যেতো: লোকটা তখন চেয়ারে বসে বসেই কাঁপতো, ভাবতো যে ফাঁসে আটকে সে বোধহয় ঝুলছে, আর তখন দারুণ উল্লসিত হয়ে হাসতো রশম্যান। খুব ভালো লাগতো সেই সব অনুনয়-বিনয় শুনতে। তখন সে ভান করতো যে সে কানে কম শোনে। কানের ওপর হাত রেখে বলতো, "একটু জোরে বলো তো, কী বললে?"

www.boiRboi.blogspot.com

তারপর সেই চেয়ারটা লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গোদের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলতো, "কানটা মনে হয় গেছে আমার, যন্ত্র লাগাতে হবে..."

কয়েক মাসের মধ্যে এডুয়ার্ড রশম্যান, আমাদের অর্থাৎ বন্দীদের চোখে হয়ে উঠলো সাক্ষাৎ শয়তান। যতরকম বীভৎসতা সে কল্পনা করতে পারে, সব আমাদের ওপর প্রয়োগ করতো।

ক্যাম্পের ভেতরে খাবার নিয়ে আসতে গিয়ে যদি কোন বন্দিনী ধরা পড়তো তবে তার চোখের সামনে প্রথমে পুরুষ অপরাধীগুলোকে ধ'রে ধ'রে ফাঁসিতে লটকাতো। তাকে সেই দৃশ্য দেখতেই হোতো, বিশেষ ক'রে যদি সেই পুরুষগুলোর মধ্যে থাকতো তার নিজের ভাই কিংবা স্বামী। তারপর রশম্যান তাকে আমাদের সবার সামনে হাঁটু গেড়ে বসাতো, ক্যাম্পের নাপিত ডেকে তার মাথা মুড়িয়ে দিতো।

হাজিরা ডাকা শেষ হয়ে গেলে তাকে কাঁটাতারের ওপাশে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হোতো। তাকে দিয়েই তার জন্যে অগভীর কবর খোঁড়ানো হোতো, গর্তের পাশে আবার তাকে হাঁটু গেঁড়ে বসতে বাধ্য করিয়ে রশম্যান বা তার অন্য কোন সহকারী লুথার পিস্তল দিয়ে একেবারে কাছ থেকে তার খুলির নিচে তাক্ ক'রে গুলি করতো। বধ্যভূমিতে আমাদের কাউকে আসতে দেয়া হোতো না, তবু লাটভিয়ান রক্ষীদের মুখে মুখে ক্যাম্পে শোনা যেতো যে রশম্যান কখনো কোন স্ত্রীলোকের কানের পাশ দিয়ে বাইরে গুলি করতো, আতংকে সে তখন কবরের ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়তো, তারপরে আবার উঠে এসে আগের মতোই বসে পড়তো। আবার কখনো বা রশম্যান শূন্য চেম্বারে ট্রিগার টিপতো, তখন শুধু ক্লিক্ ক'রে একটা শব্দ হোতো, মেয়েটি সেই মুহূর্তে এমন আকুতি শুরু ক'রে দিতো যেনো মৃত্যু এসে তাকে আঘাত করছে। লাটভিয়ানরা দানব, তারপরও রশম্যান তাদেরকেও অবাক ক'রে দিতে পেরেছিলো।

রিগাতে একটি মেয়ে বন্দীদের সাহায্য করতো, যার জন্যে অবশ্য তাকে অনেক ঝুঁকি নিতে হোতো। মেয়েটির নাম ছিলো অলি অ্যাডলার, মিউনিখে বোধহয় তার বাড়ি। ভেতরে খাবার নিয়ে আসবার জন্যে তার বোন গের্ডাকে গোরস্থানে গুলি ক'রে মারা হয়েছিলো। অলি খুব রূপসী ছিলো, কাজেই রশম্যানের চোখে পড়লো। তাকে তার রক্ষিতা বানিয়ে ফেললো – সরকারী কাগজে অবশ্য লেখা হলো বাড়ির চাকরানী। এসএস স্টোর থেকে চুরি ক'রে শিবিরে যখন আসার অনুমতি পেতো, ওষুধপত্র নিয়ে আসতো। অপরাধটার শাস্তি ছিলো অবশ্য মৃত্যু। মেয়েটিকে আমি শেষবারের মতো দেখি যখন আমরা রিগা ডক থেকে জাহাজে উঠেছিলাম।

শীতের শেষে আমি মনে মনে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না। এককালে আমার স্বাস্থ্য ছিলো ভালো: কিন্তু ক্ষুধায়, ঠাণ্ডায়,

www.boiRboi.blogspot.com

স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায়, অমানুষিক খাটুনিতে, অত্যাচারে আমার সেই পেটানো শরীর হয়ে দাঁড়ালো শুধু চামড়ায় মোড়া কতগুলো হাড়। আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে দেখতাম একটা চামড়া কুঁচকানো, খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা বুড়োমানুষের মুখ, যার চোখ দুটো লাল আর গাল দুটো ভাঙা। অথচ আমার বয়স তখন মাত্র পয়ত্রিশ কিন্তু চেহারা দেখে মনে হোতো যেনো তার দ্বিগুণ। সবার অবস্থা একই রকম ছিলো।

হাজার হাজার মানুষকে আমি জঙ্গলে নিয়ে যেতে দেখেছি পাইকারি হারে মারতে, ঠাণ্ডায় অনাহারে আর প্রচণ্ড খাটুনিতে শয়ে শয়ে লোককে আমি মরে যেতে দেখেছি: কত লোককে দেখলাম ফাঁসিতে ঝুলিয়ে গুলি ক'রে, পিটিয়ে বা ডাণ্ডা মেরে খুন ক'রে ফেললো। পাঁচ মাস ধ'রে যে আমি বেঁচেছিলাম সেটা মনে হোতো যেনো আমার আয়ুর বাইরের ফালতু কোন হিসাব। ট্রেনের কামরায় আমি যে জীবনমরণ পণ দেখিয়েছিলাম তার কোন অবশিষ্ট ছিলো না, ছিলো শুধু যান্ত্রিক চলাফেরা, আবেগ-অনুভূতিশূন্য। তবু জানতাম এই যান্ত্রিক চলাফেরারও অবসান ঘটবে খুব জলদি, আর কতদিনই বা আছে! কিন্তু মার্চে একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে আমি আবার নতুন ক'রে ইচ্ছাশক্তি ফিরে পেলাম।

তাখিরটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। ৩রা মার্চ ১৯৪২...যেদিন দ্বিতীয়বার ডুনামুন্ড কনভয় গেলো। মাসখানেক আগে আমরা দেখেছিলাম, সেই প্রথমবার, একটা অদ্ভুত ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে। লম্বা একতলা বাসের মতো দেখতে, ইস্পাত-ধুসর রঙ অথচ একটা জানালাও নেই। শিবিরের গেটের ঠিক বাইরেই ভ্যানটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো। সকালের হাজিরা নেয়ার সময় রশম্যান জানালো যে, একটা বিশেষ ঘোষণা দেবার আছে। রিগা শহর থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে ডুনা নদীর তীরে ডুনামুন্ডে একটা নতুন কারখানা নির্মান করা হচ্ছে, মৎস্য সংরক্ষণ করবার জন্য। সেখানে হাল্‌কা কাজ, ভালো খাওয়া-দাওয়া, থাকবার জায়গাও সুন্দর, কিন্তু যেহেতু কম কাজ সেজন্যেই শুধু বুড়ো-বুড়ী, শিশু বা অসুস্থ আর দুর্বল লোকদেরই ওখানে যাওয়ার সুবিধা দেয়া হবে।

স্বভাবতই যেতে চাইলো অনেকে। রশম্যান আমাদের লাইনের পাশ দিয়ে হাটতে হাটতে লোক নির্বাচন করলো। অন্যান্য বার অসুস্থ বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা লাইনের পেছনে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো : তাদের যখন টেনে হিঁচড়ে বের ক'রে বধ্যভূমির পাহাড়ে যাবার জন্যে সারি ক'রে দাঁড় করাতো তখন আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো। কিন্তু সেবার হলো ঠিক উল্টোটা। নিজেরাই এগিয়ে এলো তারা। শেষে একশোজন নির্বাচিত হলো। তারা সবাই যখন সেই ভ্যানে উঠে পড়লো তখন গাড়ির দরজাগুলো বন্ধ ক'রে দেয়া হলো। বাইরে থেকে যারা দেখছিলো তারা দেখলো যে দরজাগুলো কেমন যেনো শক্ত হয়ে বন্ধ হয়ে গেলো। ভ্যান থেকে কোনো ধোঁয়া নেই। পরে শোনা গিয়েছিলো যে ডুনামুন্ডে শুঁটকি

মাছের কারখানা ব'লে কিছু ছিলো না, সব বাজে কথা, ভ্যানটা আসলে গ্যাস দিয়ে মানুষ মারার চেম্বার। শিবিরে সেই থেকে 'ডুনামুন্ড কনভয়' কথাটার মানে হয়ে দাঁড়ালো গ্যাস দিয়ে মারা।

৩রা মার্চে শিবিরে শোনা গেলো যে আবার ডুনামুন্ড কনভয় যাবে। ঠিক তাই হলো, হাজিরা নেয়ার সময়ে রশম্যান আবার সেই আগের মতোই ঘোষণা দিলো। কিন্তু এবারে কারো কোন আগ্রহ নেই, কেউ এগিয়ে এলো না। রশম্যান হসিমুখে নেমে এলো, শেষ থেকে শুরু করলো, কারণ অথর্ব, পঙ্গু আর দুর্বলেরা পেছন দিকে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করতো। এগুতে এগুতে সে হাতের চাবুক দিয়ে একেকজনের বুকে টোকা দিলো আর তাকে টেনে লাইনের বাইরে দাঁড় করিয়ে নেয়া হলো। এইভাবে ডুনামুন্ডের যাত্রী বাছাই চললো।

একজন বৃদ্ধা ব্যাপারটা ঠিক মতো আঁচ ক'রে সেদিন লাইনের সামনের দিকে দাঁড়িয়েছিলো। বয়স তার প্রায় পঁয়ষট্টি। কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে সেদিন সে পরে এসেছিলো উঁচু হিলের জুতা, কালো রেশমী মোজা, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত খাটো স্কার্ট আর বাহারি টুপি। গাল দুটো রুজ ঘষে-ঘষে লাল ক'রে, মুখে পাউডার মেখে, ঠোঁটে ঘন লিপস্টিক দিয়ে। অবশ্য বয়স ঢাকা পড়েনি তাতে, তবু বৃদ্ধা ভেবেছিলো যে এইরকম সাজপোশাকে হয়তো সে চট্ ক'রে নজরে পড়বে না।

পাশ দিয়ে যেতে রশম্যান হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো। একবার দেখে নিয়ে আবার ভালো ক'রে তাকালো। মুখে উল্লাসের হাসি ফুটে উঠলো তার।

"অ্যা, কি দেখছি এখানে?" স্ত্রীলোকটির দিকে চাবুক উচিয়ে জোরে জোরে বলে উঠলো যাতে তার সঙ্গীসাথীরা শুনতে পায়। তারা তখন চত্বরের মাঝখানে যাদের বাছাই করা হয়ে গিয়েছে সেই শ'খানেক লোকের পাহারা দিচ্ছিলো।

রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো রশম্যান, এসএস বন্ধুরা তাই শুনে খিলখিল ক'রে হাসলো। "সতেরো না বিশ?"

বৃদ্ধার দুর্বল হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগলো। ফিসফিস ক'রে বললো, "জি, স্যার।"

"বাহ্, চমৎকার!" চেঁচিয়ে উঠলো রশম্যান। "সুন্দরী নারী আমার খুব পছন্দ। এসো এসো, মাঝখানে দাঁড়াও, তবে না আমরা সবাই তোমার রূপ-যৌবনের তারিফ করতে পারবো।"

বলেই তাকে হাত ধ'রে টানতে টানতে টিন স্কয়ারের মাঝখানে নিয়ে খোলা চত্বরে দাঁড় করিয়ে দিলো। বললো, "তাহলে রূপসী, তুমি যখন এতো সুন্দর আর এতো অল্পবয়সী, একটু নাচ দেখাও আমাদের, কেমন?"

ঠাণ্ডা হিম বাতাসে আর আতংকে বৃদ্ধা সেখানে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। নিচু স্বরে কি একটা বললো, আমরা শুনতে পেলাম না।

www.boiRboi.blogspot.com

"কি বললে?" চিৎকার ক'রে উঠলো রশম্যান, "নাচতে পারো না? আহা, তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের তো নাচতে পারা উচিত...কি হলো?"

তার জার্মান এসএস সাঙ্গোপাঙ্গোরা তখন হাসতে হাসতে খুন। লাটভিয়ানরা কিছু বুঝতে না পারলেও হাসতে শুরু ক'রে দিয়েছে। বৃদ্ধা মাথা ঝাঁকালে রশম্যানের মুখ থেকে হাসি উবে গেলো।

খেঁকিয়ে উঠলো সে, "নাচো।"

পা কোনরকম একটু নড়াচাড়া করলো বৃদ্ধা, কিন্তু তারপর থেমে গেলো। রশম্যান হাতে তুলে নিলো তার লুথার পিস্তল, তাক্ ক'রে গুলি ছুড়লো বৃদ্ধার পায়ের থেকে ঠিক এক ইঞ্চি দূরে। ভয়ে এক ফুট লাফিয়ে উঠলো বেচারী।

"নাচ্...নাচ্...নাচ্...ইহুদি কুত্তী মাগী...নাচ্।" 'নাচ্' বললো আর প্রত্যেকবার তার পায়ের নিচে একটা ক'রে গুলি ছুড়লো।

তিনাট পুরো ম্যাগাজিন খরচ ক'রে রশম্যান বৃদ্ধাকে সত্যিই নাচালো। প্রত্যেকবার গুলি যতো কাছে এগিয়ে আসে, আতংকে ততোই ঊর্ধ্বে লাফ দেয় বৃদ্ধা। প্রতিটি লাফের সঙ্গে সঙ্গে স্কার্টটা প্রায় তার কোমর পর্যন্ত উঠে যায়। শেষে বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে প'ড়ে গেলো বেচারী : ওঠবার আর ক্ষমতা নেই, এখন বেঁচে থাকুক বা মরে যাক কিছুই এসে যায় না। রশম্যান তাঁর শেষ তিনটা গুলি ওর মুখের ঠিক সামনে বালির মধ্যে ছুঁড়লো। বালি উড়ে চোখে ঝাপটা লাগলো বৃদ্ধার। প্রতিটি গুলি ছুঁড়বার ফাঁকে ফাঁকে বুক-ফাটানো আর্তনাদ এসে চত্বরে খোলা ময়দানে বাতাসের সঙ্গে মিশে গেলো।

সব গুলি শেষ হয়ে গেলে রশম্যান আবার চিৎকার ক'রে বললো, 'নাচ্'। বৃদ্ধার তলপেটে প্রচণ্ড জোরে বুট দিয়ে লাথি মারলো। সবই ঘটলো আমদের চোখের সামনে, সবাই নির্বাক নিশ্চুপ। হঠাৎ আমার কানে এলো পাশের লোকটা প্রার্থনা করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। লোকটা ইহুদি যাজক (হাসিদ) : ছোটখাটো চেহারা, দাড়ি আছে, শেমা আবৃত্তি করতে থাকলো সে একের পর এক, কয়েকবার করলো। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ক্রমশ চড়তে থাকলো। রশম্যানের মেজাজ যেমন বিগড়ে আছে তাতে আমিও নীরবে প্রার্থনা করতে থাকলাম হাসিদ যেনো চুপ মেরে যায়। কিন্তু তা হলো না।

"শ্রবণ করো, হে ইস্রায়েল..."

"আদোনাই এলোহেনু...আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর..."

"চুপ করবে কিনা... আমরা সবাই তো মরবো।"

"ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়... আদোনাই এহা-আ-আ-দ্।"

শেষের উচ্চারণটা টেনে টেনে ধর্মীয় সংস্কারগত প্রথায় করলো, যেমনটি করেছিলো রাব্বি আকিভা যখন টিনিয়ুস রুফাসের আদেশে তাঁকে সিজারিয়ার

অ্যাম্ফিথিয়েটারে প্রাণ দিতে হয়েছিলো। ঠিক সেই মুহূর্তে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির ওপর চেঁচামেচি থামিয়ে দিলো রশম্যান, জন্তুরা যেমন বাতাসে নাক টেনে ঘ্রাণ নেয়, তেমনিভাবে মাথা তুলে ঘন শ্বাস টেনে সোজা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। হাসিদের চেয়ে আমি অনেক লম্বা। তাই আমার দিকেই তাকালো।

"কে কথা বলছে?" গর্জে উঠলো সে। সোজা আমার কাছে চলে এলো। "তুমি... লাইন থেকে বেরিয়ে এসো।"

কোন সন্দেহ নেই আমার দিকেই চাবুক উঁচিয়ে আছে। ভাবলাম, তাহলে এই শেষ। হোক্, ক্ষতি কি? হবেই যখন, আজ না হয় কাল। আমি লাইন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

কিছু বললো না সে, কোন কথা নয়, তবে তার মুখের পেশীগুলো নড়েচড়ে উঠছিলো। তারপর, দেখলাম পেশীগুলো স্থির হলো, আর তার সারা মুখে ছড়িয়ে গেলো সেই শান্ত শ্বাপদ হাসি যা দেখলে শিবিরের সবার রক্ত হিম হয়ে যেতো, এমন কি লাটভিয়ান রক্ষীগুলোরও। এতো দ্রুত তার হাত চললো যে চোখেও পড়লো না। আমি শুধু টের পেলাম মুখের বাম পাশে একটা প্রচণ্ড চাপ আর তারই সঙ্গে বিকট শব্দ আমার কানের পর্দার কাছে, যেনো একটা বোমা ফাটলো সেখানে। তারপরেই যেনো একটা নেহাৎই নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতি, যেনো আমার নিজের ইন্দ্রিয়জাতই নয়, অথচ রগ থেকে মুখ পর্যন্ত আমার নিজেরই চামড়া পুরনো কাপড় টেনে ছিঁড়বার মতো সশব্দে ফেটে গেলো। রক্ত ঝরবার আগেই রশম্যানের হাত উঠলো, এবারে ভিন্ন পাশে। তার চাবুক আর একবার বোমা ফাটালো আবার অন্য কানে, আবার সেই চামড়া ছিঁড়ে যাবার আওয়াজ। চাবুকটা দু ফুট, হ্যান্ডেলের দিকে লাগানো আছে লোহার নল আর বাকি এক ফুট অংশ কোঁচকানো চামড়ার। মানুষের চামড়ায় সজোরে ঘা মেরে একই সঙ্গে টেনে দিলে কাগজের মতো দু'ফালি হয়ে যায় চামড়া। আমি তা হতে দেখেছি।

সেকেন্ডের মধ্যেই উষ্ণ রক্ত নিচে বয়ে যাচ্ছে টের পেলাম। গালের দু'পাশ বেয়ে দুটো প্রস্রবণ আমার জ্যাকেটের সামনেটা ভিজিয়ে দিলো। রশম্যান আমার কাছ থেকে সরে গেলো, তারপর দু'পা পিছিয়ে বৃদ্ধার দিকে সংকেত করলো; সে তখন চত্বরের মাঝখানে বালির ভেতরেই প'ড়ে আছে, শুধু ফোঁপানির আওয়াজ আসছে কানে।

"বুড়িটাকে তুলে ভ্যানে নিয়ে যাও," চেঁচিয়ে উঠলো সে।

কাজেই অন্য একশো হতভাগা পৌঁছানোর আগেই বুড়িকে কাঁধে তুলে ছোট পাহাড়ের রাস্তা পেরিয়ে ভ্যানের কাছে চলে এলাম। ভ্যানের পেছনদিকে ওকে বসিয়ে চলে আসছি, বুড়ি আমার কব্জি চেপে ধরলো। সাঁড়াশীর মতো দৃঢ় শক্ত চাপ, ধারণাই করতে পরিনি যে ওর দেহে তখনো অমন শক্তি অবশিষ্ট আছে। মরণগাড়ির

www.boiRboi.blogspot.com

মেঝেতে ব'সে আমাকে টেনে নামালো তার দিকে। একটা কেমব্রিকের রুমাল দিয়ে, তার অতীত সুদিনের প্রতীক বোধহয় সেটা – আমার ঝরে পড়া রক্ত মুছে দিলো।

বুড়ি তার মুখটা আমার দিকে ফেরালো। সেই মুখে মাসকারা, রুজ, চোখের জল আর বালি মিশে একাকার, কিন্তু কালো চোখ দুটো তারার মতো ঝক্‌ঝকে।

ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, 'ইহুদি বাবা আমার, শোনো, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রতিজ্ঞা করো আমার কাছে যে, তুমি বেঁচে থাকবে। আমাকে ছুঁয়ে শপথ করো যে এখান থেকে তুমি বেঁচে ফিরে যাবে। তোমাকে বাঁচতেই হবে, যাতে তুমি বাইরের জগতকে বলতে পারো যে আমাদের জাতির ওপর এখানে কী ঘটেছে। প্রতিজ্ঞা করো আমার কাছে, সেফের তোরা'র নামে প্রতিজ্ঞা করো।"

সেই তখন আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি বেঁচেই থাকবো, যেমন করেই হোক, যতো মূল্যেই হোক। আমাকে ছেড়ে দিলো বুড়ি। আমি কাঁপা কাঁপা পায়ে আবার সেই রাস্তা ধরে শিবিরের ভেতরে চলে এলাম, মাঝপথেই সংজ্ঞা হারালাম।

কাজে ফিরেই আমি দুটো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমটা হচ্ছে গোপনে একটা দিনপঞ্জি রাখবো: পায়ের তলায় এবং পায়ের ওপরে রাতের বেলায় কালো কালি দিয়ে পিন ফুটিয়ে ফুটিয়ে তারিখ-টারিখ আর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো উল্কি ক'রে রাখবো, যাতে একদিন না একদিন আমি রিগার সব ঘটনার প্রামাণিক অনুলিখন লিখতে পারি এবং যারা এর জন্যে দায়ি তাদের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্য দিতে পারি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি হচ্ছে আমি কাপো হবো, ইহুদি পুলিশদের একজন।

এই সিদ্ধান্তটা নেয়াই হয়ে দাঁড়ালো সব থেকে কষ্টকর, কারণ আমার জাতের অন্যান্য মানুষগুলোকে দলবদ্ধভাবে কাজে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার কাজ করতে হয় কাপোদের, কখনো বধ্যভূমিতেও নিয়ে যেতে হয়। এদের হাতে থাকে আবার গাঁইতির হাতল আর জার্মান এসএস অফিসারদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিচে কাপোরা তাদের সমধর্মী ইহুদিদের ওপর অস্ত্রটার যথেষ্ট সদ্ব্যবহারই ক'রে থাকে যাতে মানুষগুলো আরো বেশি করে কাজ করে। তা সত্ত্বেও, ১৯৪২-এর ১লা এপ্রিল তারিখে আমি কাপোদের প্রধানের কাছে গিয়ে নাম লেখাই। ফলে অন্যান্য ইহুদিদের কাছ থেকে আমি স্বভাবতই পৃথক হয়ে গেলাম। তবে ওই জঘন্য দলটায় স্থান পেতে একটুও অসুবিধা হলো না। কারণ কাপোদের বরং লোকের অভাবই রয়েছে। অপেক্ষাকৃত ভালো খাবার, ভালো থাকার জায়গা, বেগার খাটুনি থেকে রেহাই, এইসব সুখ-সুবিধা সত্ত্বেও কাপো হতে চাইতো খুব কম ইহুদিই।

যারা কায়িক শ্রমের অনুপযুক্ত তাদের কিভাবে হত্যা করা হোতো সেইসব বিবরণ এখানে দেয়া আমার বিশেষ কর্তব্য, কারণ রিগাতে এডুয়ার্ড রশম্যানের আদেশে প্রায় সত্তর থেকে আশি হাজার ইহুদির এইভাবেই জীবননাশ হয়। বন্দীদের নতুন দল, হাজার পাঁচেকের দলই আসতো সাধারণত, যখন ক্যাটল্ ট্রেনে ক'রে

স্টেশনে এসে পৌছাতো, তখন দেখা যেতো যে অন্তত হাজারখানেক লোক ট্রেনের বন্ধ বাক্সগুলোতে ম'রে পড়ে রয়েছে। ট্রেনে সেই পঞ্চাশটা বাক্সে মৃতের মোট সংখ্যা হাজারে পৌছায়নি এমন ঘটনা কমই ঘটেছে।

নবাগতদের টিন স্কয়ারে সারি বেঁধে দাঁড় করানো হোতো। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোকের বাছাই কিন্তু শুধু ওদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না, পুরনো লোকদের মধ্যে থেকেও সেই নির্বাচন হোতো। প্রতি সকালে বিকেলে মাথা গোনার উদ্দেশ্যই তো তাই। নবাগতদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ বা অসুস্থ, অধিকাংশ স্ত্রীলোক এবং শিশুদের মধ্যে প্রায় সবাই শ্রমের অনুপযুক্ত ব'লে বিবেচিত করা হোতো। তাদের লাইন থেকে সরিয়ে আলাদা দাঁড় করিয়ে দেয়া হোতো। বাদবাকি লোকদের আবার গোনা হোতো। যদি সেই সংখ্যা দাঁড়াতো ২০০০, তবে পুরনো বন্দীদের মধ্যে থেকে ২০০০ জনকে বেছে নেয়া হেতো, যাতে ৫০০০ নবাগতের স্থলে মোট ৫০০০ যায় বধ্যভূমিতে। এইভাবেই আমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হোতো, অত্যধিক ভিড় যাতে না হয়। কেউ হয়তো ছয় মাস ধ'রে বেগার খেটেও বেঁচে রইলো – তার চেয়ে বেশি কেউ টিকতো না – কিন্তু যখন তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়তো, রশম্যানের চাবুক তার বুকে টোকা মারতো একদিন, চলে যেতো সে মৃতের সংখ্যা বাড়াতে।

গোড়ার দিকে এইসব হতভাগ্যদের মার্চ করিয়ে শহরের বাইরে একটা বনে নিয়ে যাওয়া হোতো। লাটভিয়ানরা জায়গাটাকে বলতো বিকারনিকার জঙ্গল, কিন্তু জার্মানরা এর নতুন নামকরণ করেছিলো 'হখওয়াল্ড' বা ঊর্ধ্ব অরণ্য। এখানে ঘন পাইনের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিলো। রিগার ইহুদিদের মেরে ফেলবার আগে তাদের দিয়ে খুঁড়িয়ে নেয়া হয়েছিলো এইসব গর্ত, তারপর এডুয়ার্ড রশম্যানের হুকুমে এবং তার চোখের সামনে গর্তের কিনারায় দণ্ডায়মান সেই ইহুদিগুলোকে মেশিনগানের গুলিতে পাইকারীভাবে মারা হোতো, গর্তের মধ্যেই গিয়ে পড়তো তাদের দেহগুলো। রিগার বাকি ইহুদিদের দিয়ে লাশগুলোর ওপর একপরত মাটি দিয়ে নেয়া হোতো। এবারে সেখানে গিয়ে পড়তো তাদেরই দেহগুলো। এইভাবে কয়েক স্তর লাশ প'ড়ে প'ড়ে এক-একটা গর্ত ভরে উঠতো, আমরা শিবির থেকে শুনতে পেতাম মেশিনগানের ফট্‌ফট্ আওয়াজ। কাজ শেষ হয়ে গেলে দেখতে পেতাম পাহাড় থেকে খোলা গাড়িতে চেপে রশম্যান এসে শিবিরের গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকছে।

১৯৪২-এর জুলাইতে ভিয়েনা থেকে অস্ট্রিয়ান ইহুদিদের একটা নতুন বেশ বড় দল এলো। বোঝা গেলো তারা প্রত্যেকেই, বিনা ব্যতিক্রমে বিশেষ ব্যবস্থার জন্যে চিহ্নিত: কারণ দলটা শিবিরেই এলো না। আমরা তাদের চোখেও দেখলাম না,

www.boiRboi.blogspot.com

স্টেশন থেকে সোজা তাদের মার্চ ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো ঊর্ধ্ব অরণ্যে, সেখানেই মেশিনগান তাদের খতম করে ফেললো। সন্ধ্যাবেলায় পাহাড় থেকে চারটা লরিতে ক'রে তাদের পোশাক-আশাকগুলো টিন স্কয়ারে নিয়ে আস হলো বাছাই করবার জন্যে। বিশাল স্তুপ জড়ো হয়ে উঠলো, দালানের সমান উঁচু। আলাদা আলাদা ক'রে রাখা হলো প্রত্যেকটা জিনিস – জুতো, জামা, মোজা, আন্ডারওয়্যার, প্যান্ট, স্কার্ট, ড্রেস, জ্যাকেট, দাড়ি কামানের ব্রাশ, চশমা, বাঁধানো দাঁতের পাটি, বিয়ের আংটি, টুপি ইত্যাদি।

অবশ্য সেটাই ছিলো ওখানাকর নিয়ম। বধ্যভূমিতে মারবার আগে, কবরের পাশে, ওদের আগে ন্যাংটো ক'রে ফেলা হোতো: মালগুলো নিয়ে আসতো পরে। সেগুলো পরে বাছাই হয়ে রাইখে চলে যেতো। সোনা-রূপা বা গয়নাগাঁটির দায়িত্ব নিতো রশম্যান নিজে।

আগস্টে একটা দল বোহেমিয়ার থেরেসিয়েনস্টাড ক্যাম্প থেকে সেখানে কয়েক হাজার জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান ইহুদিদের ধরে রাখা হয়েছিলো, পুর্বাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে পরে হত্যা করে। আমি টিন স্কয়ারের এক পাশে দাড়িয়েছিলাম, রশম্যান পরম উৎসাহে লোক বাছাই করছিলো। ওদের সবাইকে মাথা মুড়িয়ে আগের ক্যাম্পেই ন্যাড়া ক'রে দেওয়া হয়েছিলো, তাই বোঝা মুশকিল ছিলো কে পুরুষ আর কে নারী। অবশ্য মেয়েরা বেশির ভাগ খাটো জামা পরেছিলো, তাই কিছুটা আন্দাজ করা যাচ্ছিলো। স্কয়ারের ওপাশে একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়েছিলো যার আকৃতি দেখে আমার চেনা চেনা মনে হলো যদিও ভীষণ কৃশ চেহারা তার, রোগা লিকলিকে, অনবরত কাশছিলো।

মেয়েটির সামনে এসে রশম্যান তার বুকে চাবুক দিয়ে একটা টোকা মেরে চলে গেলো। লাটভিয়ান রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির হাত ধরে টেনে তাকে লাইন থেকে বের ক'রে স্কয়ারের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলো যেখানে অন্যান্য নির্বাচিতেরাও সারি বেঁধে অপেক্ষা করছিলো। সেদিন ওই দলের বহু লোকই ছিলো শারীরিক পরিশ্রমের অনুপযোগী, তাই নির্বাচিতের লাইনটাও ছিলো বেশ লম্বা। তার মানে, আমাদের পুরনো বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে সেদিন অল্প লোককেই যেতে হবে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি তাতে নিস্পৃহ ছিলাম, কারণ আমি তখন কাপো, অতএব আমি নিরাপদ। কাপোর সদস্য হিসাবে আমার বাহুতে আর্মব্যান্ড, হাতে ডাণ্ডা, সামান্য বেশি খাবার খেয়ে শরীরে কিছু শক্তিও বেড়েছে। রশম্যান যদিও আমার মুখের ক্ষতচিহ্ন দেখেছিলো তবু তার সেসব কথা মনে নেই। কত লোকেরই তো চাবকে মুখের ছাল তুলে নিয়েছে সে, কাজেই মনে থাকার কথাও নয়।

সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় নির্বাচিতদের অধিকাংশরেই সারি ক'রে শিবিরের ফটক পার করিয়ে দিলো কাপোর দল। সেখানে থেকে লাটভিয়ান সৈন্যরা চার মাইল পথ

মার্চ করিয়ে নিয়ে গেলো ঊর্ধ্ব অরণ্যে, যেখানে মেশিনগানের গুলিতে তারা ছিন্নভিন্ন দেহে বীভৎস মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

ফটকের সামনে সেদিনও গ্যাসের গাড়িটা দাঁড়িয়েছিলো। নির্বাচিতদের মধ্যে থেকে যারা সবচাইতে দুর্বল বা অক্ষম, সেইরকম একশো জনকে ভিড় থেকে সরিয়ে একপাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। আমি অন্য লোকগুলোকে ফটক পার ক'রে দিতে যাচ্ছিলাম যখন এসএস লেফটন্যান্ট ক্রাউস আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললো: "এই শালা, এদের ডুনামুন্ড কনভয়ে তুলে দে।"

অন্যেরা চলে গেলে আমরা পাঁচ জন কাপো শেষ একশো হতভাগাকে ফটকের দিকে নিয়ে চললাম, যেখানে গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিলো। এদের বেশির ভাগই হয় খোঁড়াচ্ছিলো নয়তো হামাগুড়ি দিয়ে চলছিলো কিংবা ভীষণভাবে কাশছিলো তারা। রোগা মেয়েটিও ছিলো এই দলে, যক্ষ্মার তাড়নায় তার বুকের খাঁচা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। কোথায় যাচ্ছে জানতো সে, ওরা সবাই জানতো, তবু বিনা বাক্যে হোঁচট খেতে খেতে চললো সবার সঙ্গে, ভ্যানে ওঠবার পাদানি ছিলো অনেক উঁচুতে, উঠতে পারলো না মেয়েটি, খুবই দুর্বল। মুখ ঘুরিয়ে তাকালো আমার দিকে, সাহায্যের আশায়। আমিও তাকালাম; মুহূর্তে দু'জনে দু'জনের দিকে শুধু নীরব বিস্ময়ে চেয়েই রইলাম।

পেছন পদধ্বনি শুনতে পেলাম। পাশে দাঁড়ানো কাপো দু'জন অ্যাটেনশনে টানটান হয়ে দাঁড়িয়েই এক হাতে মাথার টুপি খুলে নামিয়ে নিলো। না দেখেও বুঝতে পারলাম কোন এসএস অফিসার এসেছে, কাজেই আমিও তাই করলাম। মেয়েটি আমার দিকে শুধু নিষ্পলক চেয়ে রইলো। পেছন থেকে অফিসারটি সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ক্যাপ্টেন রশম্যান। অন্য কাপো দু'জনকে ইঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে ব'লে আমার দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন। সেই ভেজা নীল চোখ। বুঝলাম, বেশ বুঝতে পারলাম যে, এই চাহনির একটাই অর্থ: টুপি নামিয়ে নিতে দেরি হয়েছে ব'লে আজ সন্ধ্যায় আমাকে চাবুক খেতে হবে।

নরম গলায় বললো, "তোমার নাম কি?"

"টউবের, হের ক্যাপ্টেন।" তখনো অ্যাটেনশনে সটান টান দাঁড়িয়ে আছি।

"আচ্ছা...টউবের, তোমাকে আজ একটু ঢিলেতালে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে যে। সন্ধ্যাবেলায় একটু চাঙ্গা ক'রে দেবো?"

কিছু বললাম না, বলার কোন মানেও হয় না। দণ্ড তো দেওয়াই হয়ে গেলো। রশম্যানের দৃষ্টি কিন্তু গিয়ে পড়লো মেয়েটির ওপর, সামান্য কুঁচকেও উঠলো বোধ হয়, সন্দেহ করেছে কিছু। ধীরে ধীরে তার মুখ সেই শ্বাপদ-হাসিতে ভ'রে উঠলো।

জিজ্ঞেস করলো, "এই মেয়েটাকে চেনো?"

www.boiRboi.blogspot.com

"জি, হের ক্যাপ্টেন।"

"কে?"

জবাব দিতে পারলাম না। মুখ যেনো কেউ সেলাই ক'রে দিয়েছে।

"তোমার বউ?"

নিঃশব্দের মাথা নিচু করে রাখলাম। রশম্যানের হাসি দীর্ঘতর হলো।

"আরে টউবের, তোমার ভদ্রতা-সৌজন্যতা কোথায় গেলো? যাও, তাকে ভ্যানে উঠিয়ে দিতে সাহায্য করো।"

আমি কিন্তু নড়তে পারলাম না, পা যেনো আঠা দিয়ে লেগে আছে। রশম্যান তার মুখ নিয়ে এলো আমার কানের কাছে, ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, "দশ সেকেন্ড সময় দিলাম টউবের, তাকে ভ্যানে না তুললে তুমি নিজেও যাবে ওর সঙ্গে।"

ধীরে ধীরে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। এসথার ভ্যানে চ'ড়ে বসলো। অন্য কাপো দু'জন দরজা বন্ধ করবার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওপরে উঠে আমার দিকে চাইলো এসথার, দু চোখ দিয়ে শুধু দু বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার গালে। আমাকে কিছু বলেনি সে, আমিও বলিনি। দরজাটা তারপর বন্ধ হয়ে গেলে ভ্যান চ'লে গেলো। শেষ আমি দেখেছিলাম তার চোখ দুটো ছিলো আমার দিকেই নিবদ্ধ।

বিশ বছর ধরে আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি যে সেই দৃষ্টির অর্থ কি? প্রেম না ঘৃণা, বিদ্বেষ না মায়া, বিভ্রান্তি না উপলব্ধি? সে কথা আমি আর কখনই জানতে পারবো না।

ভ্যান চলে যাবার পর রশম্যান আবার আমার দিকে ফিরলো। তখনো তার মুখে হাসি। বললো, "তুমি বেঁচে থাকতে পারো টউবের, যতো দিন তোমাকে শেষ ক'রে ফেলার খেয়াল আমাদের না হয়। কিন্তু এখন থেকে তুমি মৃত।"

ঠিক কথা বলেছিলো সে, নির্ভুল সত্য। সেইদিন আমার অন্তরে আমার আত্মার মৃত্যু ঘটলো। তারিখটা ছিলো ২৯শে আগস্ট, ১৯৪২।

পিটার মিলার বহু রাত পর্যন্ত পড়তে থাকলো। একঘেয়ে লাগছে তার, অথচ সম্মোহিত যেনো। কয়েকবার চেয়ারে পিঠ এলিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেললো, মানসিক স্থিরতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে। তারপর আবার পড়তে থাকলো।

একবার, প্রায় মধ্যরাতে, খাতা বন্ধ ক'রে কিছু কফি বানিয়ে আনলো সে। পর্দা টেনে দেবার আগে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে নিচে রাস্তার দিকে তাকালো। ঝক্‌ঝকে নিওন আলোয় ক্যাফে-চেরির বিজ্ঞাপন উজ্জ্বল ক'রে দিয়েছে স্টাইভ্যামের এই দিকটা। দেখলো বাড়তি উপার্জনের লোভে একটা পার্ট-টাইম মেয়ে একজন ব্যবসায়ীর বাহু জড়িয়ে ধরে হাটছে। একটু দূরে, একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো তারা, যেখানে ব্যবসায়ীর ব্যাগ থেকে একশো মার্ক খ'সে যাবে আধঘণ্টার সঙ্গমের জন্যে।

মিলার পর্দা টেনে দিলো। কফি শেষ ক'রে আবার শুরু করলো সলোমন টউবেরের ডায়রি পড়তে।

১৯৪৩-এর শরতে বার্লিন থেকে নির্দেশ এলো ঊর্ধ্ব-অরণ্যে যে হাজার-লক্ষ মৃতদেহ আছে, সেগুলোকে যেনো আরো পাকাপাকিভাবে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা হয়, হয় আগুন দিয়ে না হয় চুন লেপে। কাজটা বলা সহজ কিন্তু নির্দেশ পালন করবার জন্যে খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করতেই সে ব্যস্ত হয়ে গেলো, আমাদের কাছে আসার আর সময় পেলো না।

দিনের পর দিন নতুন-গড়া মজুরদের দলগুলোকে দেখা গেলো পাহাড়ে উঠে জঙ্গলে যাচ্ছে গাঁইতি-কোদাল-শাবল নিয়ে। তারপর দিনের পর দিন জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে উঠলো ঘন কালো ধুঁয়ো। ওই কাজে জঙ্গলের পাইন গাছগুলোকে কেটে কেটে জ্বালানো হলো। কিন্তু পচা-গলা মৃতদেহ সহজে জ্বলে না। তাই কাজটা চললো অত্যন্ত ধীরগতিতে। শেষে আগুন ফেলে চুন ধরলো। মৃতদেহের প্রত্যেকটা স্তরের ওপর একেক পরত চুন ঢাললো আর ১৯৪৪-এর বসন্তে মাটি যখন আবার নরম হলো, গর্তগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হলো।

মজুরদের দলগুলো কিন্তু শিবিরের লোক দিয়ে গড়া হয়নি। তারা এসেছিলো এই এলাকার জঘন্যতম ক্যাম্প সালাস-পিল্‌স থেকে। সেখানে তাদেরকে মানুষের সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে রাখা হতো। পরে এদের নির্মূল করা হয় একেবারেই কিছু না খেতে দিয়ে। অনশনে মরলো সবাই, মরিয়া হয়ে একে অন্যের মাংস খুবলে খুবলে খেলেও বাঁচেনি কেউ।

১৯৪৪-এর বসন্তে যখন কাজটা প্রায় শেষ হয়ে গেলো তখন এই শিবিরটা ধ্বংস ক'রে ফেলা হলো। এর প্রায় ৩০,০০০ অধিবাসীকে মার্চ করিয়ে নিয়ে গিয়ে ঊর্ধ্ব-অরণ্যে শেষবারের মতো নরবলির যজ্ঞ করা হলো। আমরা, প্রায় ৫০০০ জন, কাইজারওয়াল্ডের ক্যাম্পে বদলি হলাম। তারপরেই শিবিরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। ছাইগুলোকেও বুলডোজার দিয়ে মাটিতে মিশেয়ে ফেলা হলো। সেখানে যা ছিলো তার কোন চিহ্নই রইলো না, শুধু একরের পর একর জুড়ে ছাইচাপা মাটি (এই উপায়ে মৃত দেহগুলো জ্বলে গেলেও হাড় নষ্ট হয়নি। রাশিয়ানরা পরে এখানে ৮০,০০০ নরকঙ্কাল পায়)।

এরপর টউবেরের ডায়রির আরো বিশ পৃষ্ঠা ধ'রে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে কী ক'রে কাইজারওয়াল্ড কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে রোগ, অনাহার, অত্যধিক শ্রম আর ক্যাম্পরক্ষীদের পাশবিকতা থেকে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চলেছিলো দিনের পর দিন। এই সময়ে এসএস ক্যাপ্টেন এডুয়ার্ড রশম্যানের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। নিশ্চয় সে তখনো রিগাতেই ছিলো। টউবের আরো বর্ণনা দিয়েছে যে ১৯৪৪-এর অক্টোবরের প্রারম্ভে প্রতিহিংসাপরায়ণ রাশিয়নরা যদি চলে আসে সেই আশংকায়

www.boiRboi.blogspot.com

ভীত-শংকিত এসএস-রা রিগা থেকে সমুদ্রপথে পালিয়ে যাবার ফন্দি করেছিলো, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে শেষ ক'জন জীবিত বন্দীদের, তারাই হলো পশ্চিমে রাইখে ফিরে যাবার ছাড়পত্র।

১১ই অক্টোবর দুপুরবেলায় আমরা, সংখ্যায় তখন প্রায় ৪০০০, রিগা শহরে এসে পৌছলাম। সারি বেঁধে সোজা জাহাজঘাটে এলাম আমরা। কিছুই বুঝলাম না, অভিভূত হয়ে রইলাম, কারণ মন তো অসাড় হয়েছিলো ক্ষুধায় আর ঠাণ্ডায়, কাজেই চট ক'রে কিছু আর আমাদের মাথায় ঢুকতো না যে ওগুলো রাশিয়ান মর্টারের শব্দ, রিগা শহরের খুব কাছেই ফাটছে।

জাহাজঘাটে এসএস অফিসার এবং সৈন্যে ঠাসা। এতোজন এসএস'কে আমি কোনদিন একসঙ্গে দেখিনি। আমাদের চেয়েও বোধহয় ওদের সংখ্যাই বেশি। একটা গুদাম ঘরের দেয়ালের সঙ্গে আমাদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। ভাবলাম এই বুঝি শেষ, এবারে মেশিনগান চালিয়ে দেবে। কিন্তু তা হলো না।

এসএস-রা বোধহয় আমাদের কাজে লাগাতে চেয়েছিলো যে লাখ-লাখ ইহুদি রিগার ভেতর দিয়ে চলে গেছে তাদেরই অবশিষ্ট অংশ আমরা। আমরাই এখন ওদের নিরাপত্তার টিকেট, রাইখে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ছুতোয় রাশিয়ান আক্রমণের মোকাবিলা ওদের আর করতে হবে না, দেশে ফেরবার ছুতো আছে। ছয় নম্বর কোয়েতে দাঁড়িয়েছিলো আমাদের নৌযান, একটা মালবাহী জাহাজ ছিলো সেটা। রাশিয়ান ব্যূহ থেকে পালিয়ে আসা এটাই শেষ জাহাজ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম একটু দূরের অন্য দুটো গুদাম থেকে স্ট্রেচারে ক'রে শয়ে শয়ে আহত জার্মান সৈন্যকে জাহাজে নিয়ে তুলছে।

ক্যাপ্টেন রশম্যান যখন এসে পৌছালো তখন প্রায় অন্ধকার। জাহাজটায় কি তোলা হচ্ছে তা দেখার জন্যে থমকে দাঁড়ালো সে। যেই চোখে পড়লো আহত জার্মান সৈন্য উঠছে, অমনি স্ট্রেচারবাহক মেডিক্যাল কর্মীদের দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে বললো, "থামাও ওগুলো।"

কোয়ের এপাশে এসে সোজা একজন আর্দারলির মুখে মারলো বিরাট এক থাপ্পড়। তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আমাদের বন্দীদের দিকে চেয়ে গর্জে উঠলো, "হারামজাদারা, জাহাজে ওঠ্। ওগুলোকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আয়। এই জাহাজটা আমাদের।"

তার কথা শেষ হতে না হতেই এসএস সৈন্যরা আমাদের কোমরে বন্দুকের গুঁতো মারতে মারতে এগিয়ে নিয়ে চললো পাটাতনের দিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে অন্যান্য এসএস ফৌজিরা যারা এতোক্ষণ ধ'রে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজে আহত সৈন্য তোলা দেখছিলো, তারাও এগিয়ে এলো। বন্দীদের পেছনে পেছনে তারাও এসে চড়লো জাহাজে। ডেকের ওপর পৌছে স্ট্রেচার তুলে নামাতে যাচ্ছি আরেকটা

চিৎকারে থমকে দাঁড়ালাম।

আমার খুব কাছে এসে, তক্তার ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একজন আর্মি ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে পড়লো। স্ট্রেচারগুলো নামানো হচ্ছে দেখে গর্জন ক'রে উঠলো সে, "কে তোমাদের বলেছে এদের নামাতে?"

রশম্যান তার পেছন থেকে এগিয়ে এসে বললো, "আমি বলেছি। এই জাহাজটা আমাদের।"

ক্যাপ্টেন হুট ক'রে ঘুরে দাঁড়ালো। পকেট হাতড়ে একটা কাগজ বের ক'রে বললো, "এই জাহাজটা পাঠানো হয়েছে আহত বন্দীদের নিয়ে যাবার জন্যে, আর শুধু তারাই যাবে এই জাহাজে।"

বলেই আবার চেঁচিয়ে আর্মি আর্দারলিদের হুকুম দিলো আহতদের তুলবার জন্যে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো সে, ভেবেছিলাম রাগে। কিন্তু দেখলাম রাগে নয়, ভয়ে। রাশিয়ানদের সঙ্গে মুখোমুখি হবার ভয়। তারা তো আর আমাদের মতো নিরস্ত্র নয়।

আর্দারলিদের দিকে তাকিয়ে বিকট শব্দে চিৎকার ক'রে উঠলো, "ওদের নামিয়ে রাখো, তুলবে না বলছি। রাইখের নামে আমি এই জাহাজ আনিয়েছি।" কেউ শুনলো না তার কথা, ওয়েরম্যাখট (জার্মান সশস্ত্রবাহিনী) ক্যাপ্টেনের হুকুমই তারা পালন করতে থাকলো। আমার কাছ থেকে মাত্র দুই মিটার দূরে দাঁড়িয়েছিলো সেই ক্যাপ্টেন, তার মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ক্লান্তি আর অবসাদে ফ্যাকাশে মুখ, দু চেখের নিচে গভীর কালি। নাকের দু'পাশ বেয়ে ভাঁজ নেমেছে, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। আবার লোডিং শুরু হতেই রশম্যানের পাশ দিয়ে যাতায়াত করলো কয়েকবার, কাজকর্মের তত্ত্বাবধানের জন্য। কোয়ের ওপর তুষারে রাখা আছে সারি-সারি স্ট্রেচার, তার মধ্যে থেকেই একটা গলা শুনতে পেলাম, হাঙ্গুর্গি-টানে বলছে, "বেশ করেছেন ক্যাপ্টেন, ভালো মতোই বুঝিয়ে দিয়েছেন শুয়োরটাকে।"

ক্যাপ্টেন এবার রশম্যানের পাশাপাশি আসতেই রশম্যান খপ ক'রে তাকে ধরে সামনের দিকে মুখটাকে ঘুরিয়ে দিলো। দস্তানা-পরা হাত দিয়ে আর্মি অফিসারের মুখে মারলো এক চড়। আমি রশম্যানকে চড় মারতে দেখেছি বোধহয় হাজার বার, কিন্তু এরকম পরিণাম আর কখনো দেখিনি। ক্যাপ্টেন চড় খেয়ে মাথাটা ঝেড়ে নিলো, তারপর মুঠি পাকিয়ে বিশাল এক ঘুষি মারলো রশম্যানের চোয়ালে। কয়েক ফুট দূরে তুষারের ওপরে চিৎ হয়ে গিয়ে পড়লো সে। মুখ বেয়ে রক্তের ক্ষীণ ধারা নামলো। ক্যাপ্টেন কালবিলম্ব না ক'রে আর্দারলিগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো।

আমি দেখলাম রশম্যান তার এসএস অফিসারের লুগার পিস্তলটাকে খাপ খুলে বের ক'রে নিয়ে তাক্ করলো। গুলি করলো ক্যাপ্টেনের একেবারে দু'কাঁধের মাঝখানে। পিস্তলের শব্দ হতেই নিমিষে সব স্তব্ধ হয়ে গেলো। আর্মির ক্যাপ্টেন টাল

www.boiRboi.blogspot.com

সামলাবার জন্যে ঘুরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে রশম্যান আবার গুলি ছুঁড়লো, এবারে বুলেট গিয়ে লাগলো ক্যাপ্টেনের গলায়। পেছন দিকে ঘুরে গেলো তার দেহ, কোয়ের মাটিতে আছড়ে পড়বার আগেই মৃত্যু ঘটে গিয়েছিলো তার। গলায় কি একটা পরেছিলো, বুলেট লেগে সেটা খুলে গিয়ে কিছুটা তফাতে পড়লো। আমাকে বরা হয়েছিলো দেহটা নিয়ে ঘাটে ফেলে দিতে। ফেলতে গিয়ে দেখলাম যে সেটা রিবনে বাঁধা একটা মেডেল। ক্যাপ্টেনটির নাম আমি জানতে পারিনি, কিন্তু মেডেলটি হচ্ছে, "নাইট'স ক্রশ",ওকপাতার গুচ্ছসুদ্ধ।

মিলার ডায়রির এই পৃষ্ঠাটা পড়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলো। বারবার পড়লো। মনে প্রথমে জন্মালো অবিশ্বাস, সন্দেহ, তারপর আবার বিশ্বাস এবং শেষে ভয়ঙ্কর ক্রোধ। বোধহয় বার দশেক ধরে পড়লো এই পৃষ্ঠা, যাতে সব সন্দেহের নিরসন হয়, কোন দ্বিধা না থাকে। তারপর আবার ডায়ারির পাতা উল্টে পড়তে শুরু করলো।

আমাদের তখন আবার বলা হলো যে ওয়েরম্যাখট-আহতদের জাহাজ থেকে নামিয়ে কোয়ের ধারে এই পড়ন্ত তুষারের ভেতরে যেন ফেলে রাখি।

সবাইকে নামিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে হুকুমমাফিক আমরা গিয়ে জাহাজে উঠলাম। আমাদের পুরো দলটাকে দু ভাগে ভাগ করে জাহাজের খোলে ঢোকানো হলো, সামনে অর্ধেক আর পেছনে বাকি অর্ধেক। এমন ঠাসাঠাসি যে নড়াচড়ারও স্থান নেই। হ্যাচ নামিয়ে দিয়ে এস.এস.-রা জাহাজের ওপরে রইলো। মাঝরাতের একটু আগে রওনা দিলাম, যাতে ভোরের আগেই ল্যাটভিয়া উপাসগরের অনেকটা গভীরে জাহাজ চলে যেতে পারে, তবেই তো পাহারাদার রাশিয়ান স্টর্মোভিকদের চোখ এড়ানো যাবে।

তিন দিন লাগলো ড্যানজিগে পৌছতে, জার্মান হাইনের অনেকটা ভেতরে সেটা। কিন্তু এই তিন দিন আমাদের নরকযাত্রা ভোগ করতে হলো। ডেকের নিচে অন্ধকার বদ্ধ স্থান, জাহাজের সাংঘাতিক দুলুনি, তার ওপর না খাবার পানি, না কোন খাদ্য। একেবারে উপবাসে রাখলো আমাদেরকে। পেটে কোন খাবার নেই অথচ সবার সমুদ্রপীড়া। বমি করতে করতে পেটের নাড়ীভুঁরি যেনো বেরিয়ে এলো, অসহ্য অবসাদে মারা গেলো কত লোক। ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, ঠাণ্ডায়, বদ্ধ-বাতাসে দম আটকেও অনেক লোক মারা গেলো। আবার কিছু লোক মারা গেলো শুধু জীবিত থাকবার ইচ্ছাটুকু হারিয়ে ফেলেছে ব'লে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। আমাদের ৪০০০-এর এক-চতুর্থাংশই জীবন দিয়ে দিলো সেই জাহাজে। জাহাজ নোঙর ক'রে যখন হ্যাচ খুলে দেওয়া হলো, তখন হিমশীতল হাওয়া এসে আমাদের কামরার ভেতরে হু হু ক'রে ঢুকে পূতিগন্ধময় রুদ্ধবাতাসকে তাড়িয়ে দিলো।

ড্যানজিগের কোয়েতে আমাদের নামানো হলো। মৃতদেহগুলোকে জাহাজ থেকে নিয়ে এসে সারি ক'রে রাখা হলো। আমরাও তাদের পাশে দাঁড়ালাম, যাতে মাথা গুণতি ঠিক হয়। রিগা থেকে যতো জন জাহাজে চড়েছিলাম তার হিসাব ওদের মেলাতে হবে। এসএস-রা সংখ্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোযোগী।

পরে জানতে পেরেছিলাম রাশিয়ানরা ১৪ই অক্টোবর তারিখে রিগা দখল ক'রে নিয়েছিলো, অর্থাৎ আমরা যখন মাঝ দরিয়ায়।

www.boiRboi.blogspot.com

টউবেরের যন্ত্রণাকাতর উপাখ্যান শেষ হয়ে এলো। ড্যানজিগ থেকে অবশিষ্ট বন্দীদের নৌকায় তুলে নিয়ে গেলো স্টুটহফের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সেখানেই, ১৯৪৫-এর প্রথম কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত, টউবের দিনের বেলায় কাজ করতো বুরগ্যাবেনের সাবমেরিন কারখানায় আর রাতে গিয়ে ক্যাম্পে থাকতো। স্টুটহফে পুষ্টির অভাবে মরলো আরো কয়েক হাজার। সে ওদের সবাইকেই মরতে দেখলো কিন্তু নিজে কোনমতে বেঁচে রইলো।

১৯৫৫-এর জানুয়ারিতে যখন অগ্রগামী রুশ সৈন্যেরা ড্যানজিগ অবরোধ ক'রে ফেললো, তখন এসএস ফৌজ স্টুটহফ ক্যাম্পের বাকি জীবিত বন্দীদের পশ্চিমের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো। শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় তুষার ঢাকা পথ প্রান্তরে ওপর দিয়ে বার্লিন অভিমুখে চললো এই পদাতিক অভিযান – মৃত্যু মিছিল নামে যা কুখ্যাত। জার্মানির পূর্ব-প্রদেশ দিয়ে পশ্চিম দিকে ছায়া শরীরগুলোকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চললো এসএস-এর দল, কারণ সেগুলোই তাদের নিরাপত্তার একমাত্র টিকেট। সেই ভয়ংকর পদযাত্রায়, তুষার এবং হিমবতাসে মাছির মতো দলে দলে বন্দী মারা গেলো।

তবু টউবের বেঁচে রইলো। বার্লিনের পশ্চিমে এসে পৌছালো, ম্যাগডেবুর্গে। এইখানে এসএস-রা ওদের ছেড়ে দিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে যে যার পথ ধরে ছুটলো। টউবেরের দলকে তারা রেখে গিয়েছিলো ম্যাগডেবুর্গ জেলখানায়, হোমগার্ডের কিছু বুড়োলোক ছিলো সেই জেলের হেফাজতে। কায়েদীদের দেবার মতো কোন খাবার নেই অথচ মিত্রশক্তি এগিয়ে আসছে, ওরা বুঝতে পারছিলো না কী করবে, খুবই অসহায় তারা আর উদভ্রান্ত। বন্দীদের মধ্যে যাদের শরীরে তখনো কিছু শক্তি-সামর্থ্য আছে, তাদের অনুমতি দিয়ে দিলো যেনো আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে যা পাওে যোগার ক'রে খেয়ে নেয়।

এডুয়ার্ড রশম্যানকে আমি শেষবারের মতো দেখেছিলাম যখন ড্যানজিগ বন্দরে জেটির পাশে আমাদের গোনা হচ্ছিলো। শীতের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে দেহে যথেষ্ট গরম পোশাক জড়িয়ে একটা মোটরকারে গিয়ে উঠছিলো সে। তখন ভেবেছিলাম রশম্যানকে বোধ হয় আর আমি কখনো দেখবো না, কিন্তু তাকে আমি

www.boiRboi.blogspot.com

আর একবার দেখেছিলাম। সেদিনটা ছিলো ৩রা এপ্রিল, ১৯৪৫।

সেদিন আমি শহরের পূর্ব দিকে গার্ডেলেগেন নামে একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। আমি এবং শহরে তিন জন সঙ্গী সেই গ্রাম থেকে ঝোলাভর্তি আলু যোগাড় ক'রে সেই চোরাই মাল নিয়ে ভীরু পায়ে হাটছি, দেখলাম পেছন থেকে একটা গাড়ি পশ্চিম দিকে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তায় একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো, তাই সেটাকে পাশ কাটাতে গাড়িটা একটু থামলো। অলস নিরুৎসাহভরে একবার তাকিয়েই দেখলাম গাড়িটাতে রয়েছে চার জন এসএস অফিসার – নিশ্চয়ই পালাচ্ছে পশ্চিমের দিকে। ড্রাইভারের পাশে দেখি আমি কর্পোরালের একটা কোট নিয়ে গায়ে টেনে-টুনে পরছে এডুয়ার্ড রশম্যান।

সে আমাকে দেখতে পায়নি কারণ আমি কনকনে হাওয়া থেকে মুখ বাঁচাবার জন্যে একটা পুরনো বস্তা কেটে মাথা-মুখ-ঢাকা টুপি বানিয়ে পরে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি ওকে দেখেছিলাম, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

চার জন চলন্ত গাড়িতেই পোশাক বদলে নিচ্ছিলো। গাড়িটা বাঁকের মুখে আসতে দেখলাম তার জানালা দিয়ে কি যেনো একটা ফেলে দেওয়া হলো। কয়েক মিনিট পরে সেই জায়গাটায় যখন পৌঁছলাম, ঝুঁকে পড়ে দেখি ওটা এসএস অফিসারের একটা জ্যাকেট, একপাশে রয়েছে ওয়াফেন এসএস-এর যুগ্ম বিদ্যুৎ রেখা, অন্য দিকে ক্যাপ্টেনের র‍্যাঙ্ক। এসএস ক্যাপ্টেন রশম্যান অন্তর্হিত হয়ে গেলো।

চব্বিশ দিন পরে এলো মুক্তি। আমরা আর তখন বের হতাম না, কারণ চারদিকে ভীষণ অরাজকতা। বরং জেলখানায় ব'সে অনাহারে থাকাই শ্রেয়। ২৭ শে এপ্রিল শহরে অদ্ভুত শান্তি, চুপচাপ একেবারে। বেশ কিছুক্ষণ হলো সকাল হয়েছে। বুড়ো গার্ডদের একজনের সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলছিলাম: ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে সে, ঘণ্টাখানেক ধ'রে আমাকে বোঝালো যে সে বা তার অন্য সহকর্মীরা কেউই অ্যাডলফ হিটলারকে ভক্তি-টক্তি করতো না, ইহুদি নির্যাতনে তো তারা কোন অংশই নেয়নি।

বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ হলো। ফটকে তালা মারা, শুনলাম জোরে জোরে কেউ শব্দ করছে। বুড়ো হোমগার্ড গেলো সেটা খুলতে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে একটা লোক এগিয়ে এলো, হাতে উদ্যত রিভলভার, পরনে পুরো ব্যাটল ড্রেস। সে ধরনের ইউনিফর্ম আমি আগে দেখিনি।

মনে হলো লোকটা অফিসার, কারণ তার সঙ্গে ছিলো আরো একজন সৈনিক, তার মাথায় টিনের গোল টুপি, হাতে রাইফেল। লোক দুটো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। নির্বাক হয়ে শুধু চারপাশটা দেখলো। তাদের চোখে পড়লো জেলখানার উঠানেই স্তূপ ক'রে রাখা আছে পঞ্চাশটি মৃতদেহ – দু'সপ্তাহ ধ'রে যারা মরেছে,

যাদের গোর দেবার মতো শারীরিক সামর্থ্য কারোর নেই। অন্যেরা অর্ধ-জীবিত, দেয়াল ঘেঁষে ব'সে রোদের সামান্য উত্তাপ পোহাচ্ছে, দেহের অজস্র ক্ষতস্থানগুলো থেকে পুঁজ পড়ছে, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চার দিকে।

লোক দুটো পরস্পরের দিকে তাকালো, তারপর হোমগার্ডের দিকে। অপ্রস্তুতভাবে ফিরে তাকালো বুড়ো লোকটা। আমতা-আমতা ক'রে কি একটা ব'লে উঠলো, বোধহয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শিখেছিলো। বললো :

"হ্যালো টমি।"

অফিসারটি আর একবার তার দিকে তাকিয়ে উঠানের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। পরিষ্কার ইংরেজিতে ব'লে উঠলো "বানচোত ক্রাউট শুয়োর!"

আর ঠিক তক্ষণই হঠাৎ ক'রে আমি কেঁদে ফেললাম।

জানি না কী ক'রে আমি হাম্বুর্গে ফিরলাম, কিন্তু ফিরেছিলাম ঠিকই। মনে হয় দেখতে চেয়েছিলাম পুরনো জীবনের কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা, কিন্তু কিছুই ছিলো না। যেসব অঞ্চলে আমি জন্মেছিলাম, বড় হয়ে উঠেছিলাম, সে সবই বোমার আঘাতে আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। যে অফিসে আমি চাকরি করতাম সেটাও, আমার ফ্ল্যাটটাও, সবকিছুই।

ইংরেজরা আমাকে কিছু দিন ম্যাগডেবুর্গের হাসপাতালে রেখে দিয়েছিলো। কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম, হিচহাইক ক'রে দেশে পৌছলাম। কিন্তু পৌছে দেখি কিচ্ছু নেই। তখন, অতোদিন পরে, আমি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়লাম। অসুস্থ হয়ে কাটালাম একটা বছর হাসপাতালে যেখানে বার্জেন-বেলসের নামে একটা জায়গা থেকে ফিরে আসা আরো বহু রুগী ছিলো। তারপর আরো একটা বছর হাসপাতালেই আর্দারলির কাজ করলাম, যারা আমার চেয়েও দুর্ভাগা তাদের দেখাশোনা ক'রে কাটিয়ে দিলাম।

সেই কাজের শেষে হাম্বুর্গে এলাম, আমার জন্মস্থান। একটা ঘর খুঁজে নিয়ে ঠিকানা গাড়লাম, জীবনের বাকি কটা দিন সেখানেই কাটিয়ে দেবো বলে।

ডায়রির শেষে নতুন টাইপ-করা দুটো পৃষ্ঠ ছিলো, কাহিনীর উপসংহার।

আলটনার এই ঘরে আমি ১৯৪৭ থেকে বাস করছি। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে স্থির করলাম যে রিগাতে আমার ওপর এবং আমার অন্যান্য সঙ্গীদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছিলো তার কাহিনী লিখবো।

কিন্তু শেষ করবার আগেই বুঝলাম যে আমার মতো আরো বহু ব্যক্তি বেঁচে ফিরে এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমার চেয়ে অনে বেশি জানেন, অনেক প্রামাণিক সাক্ষ্য দিতে পারেন। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ওপর এখন শয়ে শয়ে বইও লেখা হয়েছে, অতএব আমার উপাখ্যানে কেউই বিশেষ আগ্রহী হবে না। আমি এটা পড়তেও দেইনি।

www.boiRboi.blogspot.com

আমার এখন মনে হচ্ছে আমার সেই চেষ্টা, বেঁচে গিয়ে ফিরে আসা সবকিছু লিবিবদ্ধ ক'রে রাখবো, সেটা নেহাৎই সময়ের এবং শক্তির অপব্যবহার, কারণ অনেকেই আমার চেয়ে অনেক ভালোভাবে এই কাজ করেছেন। এখন আমার আফশোশ হচ্ছে কেন আমি রিগাতে এসথারের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিনি।

আমার শেষ ইচ্ছা ছিলো এডুয়ার্ড রশম্যানকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখবো, তার বিরুদ্ধে আমি সাক্ষ্য দেবো। কিন্তু সে ইচ্ছাও আমার পূর্ণ হবে না, আমি তা এখন জানি।

কখনো কখনো আমি রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াই, পুরনো দিনের কথা স্মরণ করি, কিন্তু সে-সব দিন আর ফিরে আসবে না। ছেলেরা আমাকে দেখে হাসে, বন্ধুত্ব করতে গেলে পালায়। একদিন একটা ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, মেয়েটি আমাকে দেখে পালায়নি, কিন্তু তার মা চিৎকার করতে করতে এসে তাকে আমার সামনে থেকে টেনে নিয়ে চলে গোলো। কাজেই আমি লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কথা বলি না।

একবার একজন স্ত্রীলোক এসেছিলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। বললো যে ক্ষতিপূরণ দপ্তর থেকে সে এসেছে, আমি নাকি কিছু টাকা পাবো। আমি বললাম টাকা আমি চাই না। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেলো মেয়েটির। বললো কৃতকর্মের জন্যে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার আমার আছে। আমি তা সত্ত্বেও অস্বীকার করলাম। তারপর আরো একজন এলো, আমি আবার অস্বীকার করলাম। সেই লোকটি বললো যে ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করা নাকি ঠিক না। তার কথায় আমার মনে হলো যে সে বলতে চাইছে অস্বীকার করলে তাদের নিয়মের বরখেলাপ হবে। কিন্তু আমি তো শুধু সেটুকুই নেবো যেটুকু আমার তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য।

ব্রিটিশ হাসপাতালে যখন ছিলাম তখন তাদের একজন ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি ইস্রায়েলে চলে যাচ্ছি না কেন, সেই দেশ তখন স্বাধীনতা পেতে চলেছিলো। কি ক'রে আমি তাঁকে বোঝাবো? তাঁকে আমি বলতে পারলাম না যে সেই ভূমিতে আমি কখনই পদার্পণ করতে পারি না, অন্তত আমার স্ত্রী এসথারের সঙ্গে আমি যা করেছিলাম তার পরে তো নয়ই। আমি প্রায়ই সে দেশের কথা ভাবি, কেমন সেই জায়গা, স্বপ্নেও দেখি, কিন্তু যাবার উপযুক্ত আমি নই।

তবে আমার এই কাহিনী যদি কোনদিন ইস্রায়েল ভূমিতে পঠিত হয়, সে-দেশ আমি কোনদিন চোখে দেখবো না, তবে সেখানে কি কেউ আমার উদ্দেশ্যে কোনদিন খাদ্দিশ পড়বেন?

সলোমন টউবের,
আলটনা, হাম্বুর্গ,
২১ শে নভেম্বর ১৯৬৩

ডায়রিটাকে নামিয়ে রেখে পিটার মিলার চেয়ারে হেলান দিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো। সিগারেট খেতে খেতে ছাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। ভোর পাঁচটার দিকে ফ্ল্যাটের দরজা খোলার শব্দ কানে এলো। কাজ থেকে সিগি ফিরলো। তাকে এই সময়ে জেগে থাকতে দেখে সিগি অবাক হলো।

"কি করছিলে এতোক্ষণ ধরে?"

মিলার বললো, "পড়ছিলাম।"

সেন্ট মাইকেলিসের উঁচু গির্জা-চূড়ায় ভোরের প্রথম আলো যখন ফুটলো ওরা তখন বিছানায়। সিগি ঘুমে আচ্ছন্ন, সম্ভোগে তৃপ্ত হয়েছে সে। মিলার ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবছে।

"কি ভাবছো?" একটু পরে সিগি বললো।

"শুধু ভাবছি।"

"সে তো দেখছিই। কী ভাবছো?"

"এবার যে কাজটা শুরু করবো, সেটা।"

আরো কাছে চলে এলো সিগি। "কী করতে যাচ্ছো এখন?"

কাত হয়ে পাশে রাখা ছাইদানিতে সিগারেটটা গুঁজে দিতে দিতে মিলার বললো, "একটা লোককে খুঁজে বের করবো।"

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ৩

হাম্বুর্গে যখন পিটার মিলারও সিগি পরস্পরের বাহুবন্ধনে ঘুমাচ্ছিলো, তখন কাস্তিলে অন্ধকারের ছোপ-ধরা পাহাড়গুলোর ওপর দিয়ে আর্জেন্টিনার এয়ার লাইন্সের বড় একটা করোনাদো বিমান মোড় ঘুরলো মাদ্রিদের বারাজাস এয়ারপোর্টে নামবার জন্যে।

ফার্স্ট ক্লাসের তৃতীয় সারিতে জানালার পাশে যে বসেছিলো তার বয়স প্রায় ষাট, ধূসর চুল আর সযত্নে ছাঁটা গোঁফ।

লোকটার আগেকার চেহারার একটা মাত্রই ছবি ছিলো, তখন তার বয়স ছিলো চল্লিশের একটু ওপরে, কদমছাঁট চুল, কোন গোঁফ-টোফ ছিলো না বলে ইঁদুর মারার জাঁতাকলের মতো মুখটা পরিষ্কার তকতকে দেখা যেতো, মাথার বাম পাশে ক্ষুর চালিয়ে লম্বা সোজা সিঁথি কাটা। যারা সেই ছবি দেখেছে তারা আজ বিমানে উপবিষ্ট এই চেহারাটার সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পাবে না, চুল এখন ঘন, পেছনে উল্টো ক'রে আঁচড়ানো। কোন সিঁথি নেই। নতুন চেহারার সঙ্গে বেশ মিল আছে পাসপোর্টের ছবিটার।

পাসপোর্টের পরিচয় অনুসারে লোকটা হলো সেনর রিকার্দো সুরেতেস, আর্জেন্টিনার নাগরিক। ওই নামটাই কিন্তু পৃথিবীর সাথে বড় একটা ঠাট্টা, কারণ স্প্যানিশ ভাষায় 'সুরেতে' কথাটার অর্থ ভাগ্য, আর ভাগ্যের জার্মান প্রতিশব্দ হচ্ছে গ্ল্যুক্স। জন্মের সময় লোকটার নাম রাখা হয়েছিলো রিচার্ড গ্ল্যুক্স, পরে সে এসএস-এর পূর্ণ জেনারেল হয়, রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদর দপ্তরের পদ পায়, কনসেনট্রেসন ক্যাম্পগুলোতে হিটলারের পক্ষ থেকে ইন্সপেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হয়। পশ্চিম জার্মানি ও ইস্রায়েল থেকে ঘোষিত ফেরারী তালিকায় তার নাম গুরুত্ব অনুসারে তৃতীয় নম্বরে – মার্টিন বর্ম্যান ও প্রাক্তন গেস্টাপো-অধিপতি হাইনরিখ ম্যুলারের পরেই। অউশউইৎসের শয়তান-ডাক্তার ডাঃ জোসেফ মেঙ্গেলের

চেয়েও উঁচু র‍্যাঙ্ক তার। ওডেসা সংগঠনে তার স্থান দুই নম্বরে, মার্টিন বর্ম্যানের নিচেই, ১৯৪৫-এ পর ফ্যুয়েরারের প্রেতাত্মা তো বর্ম্যানকেই আশ্রয় করেছে।

এসএস দলের সমস্ত অপকীর্তিতেই রিচার্ড গ্ল্যুক্‌সের ভূমিকা ছিলো অসামান্য। ধূর্ততায় সে অপ্রতিদ্বন্দ্বি, যেভাবে ১৯৪৫-এর মে মাসে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলো তাতেই বোঝা যায় কত কুটবুদ্ধি তার আছে। অ্যাডলফ আইখম্যানের চেয়েও গ্ল্যুক্‌সের অবদান ছিলো অনেক বেশি, সে-ই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে, অথচ সে নিজে কোনদিন ট্রিগার টেপেনি।

কোন অজ্ঞ বিমানযাত্রীকে যদি সেদিন বলা হোতো যে তার পাশের সিটে যে ব'সে আছে সেই লোকটার আসল পরিচয় কি, তবে হয়তো অবাক হয়ে সে ভাবতো যে অর্থনৈতিক প্রশাসন দপ্তরের প্রাক্তন কর্তা ফেরারি তালিকায় কেন অতো উচ্চ স্থান পেয়েছে?

তার প্রশ্নের উত্তরে সে তখন জানতে পারতো যে ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত জার্মানিতে মানবতার বিরুদ্ধে যেসমস্ত অপরাধ সংগঠিত হয়েছিলো, নির্দ্বিধায় তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগের দায়িত্ব এসএস দলের ওপর অর্পণ করা যায়। তার মধ্যে আবার শতকরা আশি থেকে নব্বই ভাগ দায়িত্ব এসএস-এর দুটো আভ্যন্তরীণ বিভাগের ওপর – রাইখের নিরাপত্তার সদর দপ্তর এবং রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদর দপ্তর।

গণহত্যায় অর্থনৈতিক দপ্তরের দায়িত্ব আছে, এই কথাটা খুব বিস্ময়কর হলেও, নাৎসি আমলের সেই জঘন্য অপরাধের পদ্ধতি বিচার করলে বিষয়টি প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে। ওদের উদ্দেশ্য ছিলো ইউরোপ থেকে প্রতিটি ইহুদিকে এবং যতোদূর সম্ভব প্রত্যেকটি স্লাভ জাতিকে পৃথিবী থেকে যে শুধু মুছেই দেওয়া হবে তাই নয়, মরবার সুযোগ পাচ্ছে বলে তাদের কাছ থেকে টাকাও আদায় করা হবে। গ্যাস-চেম্বারের দরজা খুলবার আগেই এসএস-রা ইতিহাসের জঘন্যতম লুণ্ঠনকর্ম সম্পাদন ক'রে ফেলেছিলো।

ইহুদিদের ক্ষেত্রে অর্থ আদায় হয়েছিলো তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রথমত, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়িঘর, কলকারখানা, ব্যাংকে রাখা অর্থ, আসবাবপত্র, গাড়িঘোড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ সব বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়ে নেওয়া হলো। তারপর তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো পুর্বাঞ্চলে – দাস-শ্রমের ক্যাম্পগুলোতে, নইলে ডেথক্যাম্পে। বলা হয়েছিলো যে পুনর্বাসনের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। অনেকেই তা বিশ্বাস করেছিলো তাই যা পারে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো – সাধারণত দুটো ক'রে স্যুটকেস। ক্যাম্পের চত্বরে এগুলো তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হয়, পরনের পোশাকও।

ইউরোপের ইহুদিরা, বিশেষ ক'রে পোল্যান্ড এবং পূর্বদেশগুলো সে-সময়ে

www.boiRboi.blogspot.com

যথেষ্ট ধনসম্পদ নিজেদের দেহে ধারণ ক'রে রাখতো। ষাট লক্ষ লোকের মালপত্র থেকে উপার্জন হয়েছিলো কয়েকশো কোটি ডলার। ক্যাম্পগুলো থেকে ট্রেনভর্তি আসতো সোনার গয়না, হীরা, নীলা, চুণী, রূপার পাত, লুইদর, সোনার ডলার আর হরেকরকম ব্যাংকনোট। এগুলো জার্মানির ভেতরে এসএস হেড-কোয়ার্টারে পৌঁছে যেতো। এসএস-রা বরাবরই তাদের কাজে লাভ করে এসেছে। এই লাভের একাংশ রূপান্তরিত হয়ে যেতো সোনার বাটে, যার ওপর ছাপা হোতো রাইখের ঈগল আর এসএস-এর যুগ্ম বিদ্যুৎ। যুদ্ধের শেষদিকে এগুলো গাচ্ছিত রাখা হলো সুইজারল্যান্ড, লাইখটেনস্টাইন, ট্যানজিয়ার এবং বৈরুতের বিভিন্ন ব্যাংকে। পরবর্তীকালে ওডেসা সংগঠনের মুলধন হিসেবে এগুলো বেশ কাজে এসেছিলো। এখনো বহু সোনা জুরিখের ভুগর্ভস্থ ভল্টে পড়ে আছে, পাহারা দিচ্ছে ওই শহরের আত্মপ্রসাদের স্ফীত নীতিবাগীশ কতগুলো ব্যাংকার।

শোষণের দ্বিতীয় পর্যায় ছিলো দৈহিক। বহু ক্যালরি শক্তি আছে একেকটি দেহে, অতএব ব্যবহার করা হোক। এই পর্যায়ে এসে পৌছনোর আগেই ইহুদিরা তাদের সমস্ত পর্থিব ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলেছে, অতএব তারাও তখন কপর্দকহীন রুশ ও পোলদের সমগোত্রীয়। কাজ করতে যারা অনুপযুক্ত তাদের সবাইকেই বিনা বাক্য ব্যয়ে হত্যা করা হোতো, কারণ তাদের দেহ আর শোষণ করা সম্ভব নয়। যারা কর্মক্ষম তাদের ভাড়া খাটানো হোতো, এসএস-এর নিজস্ব কারখানায় নইলে অন্যান্য জার্মান শিল্প উদ্যোগগুলোতে, যেমন ক্রুপ, থাইসেন, ফন ওপেল ইত্যাদি। এসএস প্রতিষ্ঠান মাথা পিছু দৈনিক পেতো প্রতি অদক্ষ শ্রমিকের জন্যে তিন মার্ক ও দক্ষ শ্রমিকের জন্যে চার মার্ক হারে। দৈনিক কথাটার অর্থ ছিলো যৎসামান্য খাদ্য দিয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জীবিত দেহ থেকে যতোটা কাজ আদায় করতে পারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক কর্মস্থলেই জীবন হারিয়েছিলো।

এসএস ছিলো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আরেকটি রাষ্ট্র। এদের নিজস্ব কল-কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, নির্মাণশাখা, মেরামত ও পরিচালনা কেন্দ্র এবং পোশাক বিভাগ ছিলো। নিজেদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই এরা নিজেরাই বানিয়ে নিতো, দাস শ্রমিকগুলোকে ব্যবহার করতো কারণ হিটলারের আদেশ বলে তারা এসএস-এর নিজস্ব সম্পত্তি।

শোষণের তৃতীয় পর্যায়ে পড়তো মৃতদেহগুলো। মানুষগুলোকে যখন মারা হোতো তার আগেই তাদের নিরাবরণ ক'রে সব জিনিস খুলে নেওয়া হোতো। গাড়ি ভরতি জুতা, মোজা, দাড়ি কামানোর ব্রাশ, চশমা, জ্যাকেট, ট্রাউজার পাওয়া যেতো। চুলগুলোকে কামিয়ে ফেলে রাইখে পাঠানো হোতো, শীতের ঠাণ্ডায় লড়াই করবার জন্যে তা দিয়ে ফেল্ট-বুটের আস্তরণ তৈরি হোতো। সোনা-বাঁধানো দাঁতগুলোকে মৃতদেহ থেকে প্লায়ার দিয়ে দিয়ে তুলে নেওয়া হোতো, পরে সেগুলো

গলিয়ে সোনার বাট হয়ে চলে যেতো জুরিখে। হাড়গুলো থেকে ফার্টিলাইজার বানানোর চেষ্টা হয়েছিলো, দেহের চর্বি থেকে সাবান, কিন্তু লাভজনক নয় ব'লে সেই পরিকল্পনা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ব্যক্তির গণহত্যার আর্থিক দিকটা ছিলো রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদরদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। অর্থাৎ কিভাবে আরো লাভ করা যায় হত্যাগুলো দিয়ে, সেইসব প্রকল্প তারাই বানাতো। আজ বিমানের ৩-বি নম্বর সিটে যে ব'সে আছে সে ছিলো সেই দপ্তরেরই প্রধান।

গ্ল্যাক্স আর জার্মনিতে ফেরেনি তারপর, অযথা ঝুঁকি নেবার পাত্র নয় সে। প্রয়োজনও ছিলো না। দক্ষিণ আমেরিকাতে বেশ ছিলো রাজার হালে, এখনো রয়েছে। অর্থ আসে গোপন তহবিল থেকে। ১৯৪৫-এর পরেও নাৎসি আদের্শে বিশ্বাস এতোটুকু টলেনি, তার ওপর আছে প্রাক্তন খ্যাতি। সুতরাং আর্জেন্টিনায় পলাতক নাৎসিদের মধ্যে সে যথেষ্ট গণ্যমান্য। ওডেসাও পরিচালিত হয় সেখান থেকেই।

বিমান নিরাপদে নামলো, যাত্রীরাও নিরাপদে কাস্টমস্ পেরিয়ে এলো। তিন নম্বর সারির যাত্রীটিকে অনর্গল স্প্যানিশ ভাষা বলতে দেখে কেউ আশ্চর্য হলো না, কারণ দক্ষিণ আমেরিকান হিসেবেই তার পরিচিতি।

ওখান থেকে বের হয়ে ট্যাক্সি নিলো একটা। বহুদিনের অভ্যাসবশত জুরবুরান হোটেল থেকে সামান্য দূরের একটা ঠিকানা দিলো। মাদ্রিদ শহরের মাঝখানে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ব্যাগ হাতে হাঁটতে হাঁটতে দুশো গজ দুরে হোটেলটায় এসে উঠলো।

টেলেক্সে খবর পাঠিয়ে রুম বুকিং করা ছিলো। রিপোর্ট করেই সোজা উঠে দাড়ি কামালো, গোসল ক'রে নিলো। কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বাজতেই দরজায় তিন বার করাঘাত হলো, একটা থেমে আবার দু'বার। নিজেই গিয়ে দরজা খুললো, পরিচিত ব্যক্তি দেখে দু'পা পিছু হ'টে দাঁড়ালো।

আগন্তুক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। সটান হয়ে দাঁড়িয়ে ডান হাত টান ক'রে তালু নিচের দিকে রাখলো। পুরনো স্যালুট। মুখে ব'লে ওঠে, "সিয়েগ হাইল।"

অনুমোদনের ভঙ্গীতে জেনারেল গ্ল্যাক্স মাথা নেড়ে নিজের ডান হাতটাও বাড়িয়ে দেয়। ধীরে বলে, "সিয়েগ হাইল।" আগন্তুককে বসতে নির্দেশ করলো সে।

আগন্তুকও একজন জার্মান, এসএস-এর ভূতপূর্ব অফিসার। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানিতে ওডেসা সংগঠনের আঞ্চলিক প্রধান। মাদ্রিদে যে তাকে আহ্বান করা হয়েছে এতোবড় একজন নেতার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার জন্যে তাতে খুব অহংকার বোধ করছে সে। মনে করছে ছত্রিশ ঘণ্টাআগে প্রেসিডেন্ট কেনেডির যে মৃত্যু হলো সেই জন্যেই বোধহয় এই আলোচনার বৈঠক।

www.boiRboi.blogspot.com

নাস্তার ট্রে'টা পাশেই রাখা ছিলো, সেখান থেকে এক কাপ কফি নিজের জন্যে ঢেলে নিয়ে জেনারেল গ্ল্যাক্স বিশাল একটা কোরোনা চুরুট ধরালো।

"কারণটা বোধহয় বুঝতে পেরেছো কেন আমি হঠাৎ ইউরোপে এলাম বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও," জেনারেল বললো, "এই মহাদেশে আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও থাকতে চাই না। অতএব এক্ষুণিই আমার কথাবার্তা শুরু করছি এবং সংক্ষেপেই করবো।"

জার্মানি থেকে আগত অধস্তন পুরুষটি চেয়ার থেকে সামনে ঝুঁকে পড়লো।

"কেনেডি এখন মৃত। আমাদের পক্ষে সেটা এক অদ্ভুত সৌভাগ্য," জেনারেল বলতে থাকে,

"এই ঘটনা থেকে যতোটা সুযোগ আমরা নিতে পারি সবটুকুই নিতে হবে, কোন গাফিলতি যেনো না হয়। বুঝেছো, কি বলছি?"

"নিশ্চয়ই, হের জেনারেল, নীতিগতভাবে বুঝলাম, কিন্তু বিশদ অর্থে ঠিক কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছেন?" অপেক্ষাকৃত কমবয়সী লোকটা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।

"বনের দেশদ্রোহী ইতরগুরো তেলআভিভের শুয়োরদের সঙ্গে যে গোপন অস্ত্রচুক্তি করেছে তার কথাই বলছি। সেই চুক্তির কথাটা জানা আছে তো তোমার? ট্যাংক, কামান এবং কতরকম অস্ত্রশস্ত্র জার্মানি থেকে ইস্রায়েলে যাচ্ছে এখন?"

"হ্যা, সেটা আমিও জানি।"

"এ কথাও জানো বোধহয় যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে মিশরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা হচ্ছে, যাতে একদিন না একদিন তারাই যুদ্ধে বিজয়ী হয়।"

"নিশ্চয়ই জানি। আমরাই তো সেই উদ্দেশ্যে বহু জার্মান বৈজ্ঞানিককে ঢুকিয়ে দিয়েছি সেখানে।"

"এই বিষয়টায় আমি পরে আসছি। আমি আমাদের নীতির কথাটা বলছিলাম এখন, আরব বন্ধুদের যতোটা সম্ভব এই বিশ্বাসঘাতী চুক্তির সমস্ত খবরগুলো জানিয়ে দিতে হবে যাতে তারা কূটনৈতিক পন্থায় বন সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে পারে। ইতিমধ্যেই আরবদের প্রতিবাদের ফলে জার্মানির ভেতরে একটা উপদলের সৃষ্টি হয়েছে যারা রাজনৈতিক কারণেই অস্ত্রচুক্তির ভীষণ বিরোধী, কারণ আরবেরা এই চুক্তির ফলে জার্মানির ওপর ভীষণ ক্ষুদ্ধ হয়ে আছে। এই উপদলটি, তাদের অজান্তেই, আমাদের হয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছে, এমন কি মন্ত্রিসভা থেকেও চাপ দেওয়া হচ্ছে নিবোর্ধ এরহার্ডকে, যাতে সে এই অস্ত্র-চুক্তিটা বাতিল ক'রে দেয়।"

"হ্যা, বুঝলাম, হের জেনারেল।"

www.boiRboi.blogspot.com

"বেশ। এরহার্ড অবশ্য এখনো অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করেনি তবে বহুবার দোটানায় প'ড়ে দ্বিধা করেছে। যারা জার্মান-ইস্রলি অস্ত্র-চুক্তি সম্পাদনের স্বপক্ষে, তাদের একমাত্র যুক্তি হচ্ছে এই চুক্তিতে কেনেডির সমর্থন রয়েছে, আর কেনেডি যা চায় এরহার্ড তাকে তাই দেয়।"

"হ্যা, সে কথা সত্যি।"

"কিন্তু কেনেডি এখন মৃত।"

আগন্তুক চেয়ারে একটু পেছনে এলিয়ে বসলো, চোখ দুটো তার প্রত্যাশায় জ্বলছে; কল্পনায় দেখতে পায় নতুন নতুন সম্ভাবনা। এসএস জেনারেল চুরুট থেকে সাবধানে একটু ছাই ফেলে নিলো তার কফি-কাপে, তারপর জ্বলন্ত চুরুটের ডগাটা অধস্তন কর্মীটির দিকে উঁচিয়ে ব'লে উঠলো, "অতএব এই বছরের বাকি দিনগুলোতে জার্মানির ভেতরে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য হবে অস্ত্র-চুক্তির বিরুদ্ধে বিশাল জনমত গড়ে তোলা; বোঝানো হবে যে অস্ত্র-চুক্তিটার ফলে জার্মানি তার বহুকালের সুহৃদ আরবদের হারাতে বসেছে।"

"হ্যা হ্যা, নিশ্চয়ই; এ আর এমন কি কথা, সব করা যাবে।" বেশ চওড়া মাপের হাসি হাসলো আগন্তুক।

"কায়রো সরকারের সঙ্গে আমাদের যে সংযোগসূত্রগুলো আছে, তারা দেখবে যে তাদের এবং অন্যান্য দুতাবাস মারফত অনবরত কুটনৈতিক প্রতিবাদ যেনো জার্মানিতে আসে। অন্য আরব-বন্ধুরা আরব-ছাত্র এবং আরবদের জার্মান-বন্ধুদের দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করাবে; তোমার কাজ হবে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই বিষয়ে প্রচার চালানো; যে সমস্ত পুস্তিকা এবং পত্রিকা আমরা গোপনে গোপনে সমর্থন করি তাদের দিয়ে লেখাবে, বড় বড় খবরের কাগজ এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে, প্রভাবশালী আমলা ও রাজনীতিকদের অস্ত্র-চুক্তির বিরুদ্ধে আনবার চেষ্টা করবে।"

সামনে ব'সে থাকা লোকটার ভুরু কুঁচ্‌কে উঠলো। বিড়বিড় ক'রে বললো, "কিন্তু আজকের জার্মানিতে ইস্রায়েলবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা খুব কঠিন কাজ।"

"সে প্রশ্নই ওঠে না," তীক্ষ্ণ স্বরে জেনারেল বললো, "খুবই সহজ যুক্তি; ব্যবহারিক কারণেই নির্বোধের মতো গোপন চুক্তি-টুক্তি করে জার্মানি আজ আট কোটি আরবকে শত্রু ক'রে তুলতে পারে না। বহু জার্মান এই যুক্তি মানবে, বিশেষত কূটনীতিকেরা। পররাষ্ট্রদপ্তরে আমাদের যে পরিচিত বন্ধুরা আছে তাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এ-ধরনের সহজ সাধারণ যুক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ। অবশ্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা সবই দেয়া হবে। মোট কথা হচ্ছে কেনেডি মরেছে, জনসন বোধহয় ওরকম আন্তর্জাতিক ইহুদি-ঘেঁষা নীতির ধার ধারবে না, অতএব এরহার্ডকে প্রবল চাপ দিতে হবে, তার মন্ত্রিসভার ভেতর থেকেও, অস্ত্র-চুক্তি যাতে স্থগিত রাখা হয়। মিশরীয়দের যদি দেখাতে পারি যে আমরা বনের বৈদেশিক নীতি পাল্টে দিতে

www.boiRboi.blogspot.com

পেরেছি তাহলে কায়রোতে আমাদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যাবে।"

জার্মানি থেকে আগত ব্যক্তিটি বহুবার ঘাড় নাড়লো, যেনো কি করতে হবে না হবে, সেই নকশা তার চোখে ভাসছে। বললো, "সব করা হবে।"

"বাহ," জেনারেল গ্ল্যকস অনুমোদনের ধ্বনি ক'রে উঠলো। লোকটা কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে এখন।

"হের জেনারেল, আপনি জার্মান বৈজ্ঞানিকদের কথা বলছিলেন, মিশরে যারা কাজ করছে..."

"ও, হ্যা। বলেছিলাম তো, তাদের কথা পরে বলবো। তারা হচ্ছে, বুঝলে, আমাদের অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় – ইহুদিদের চিরকালের জন্যে বিনাশ ক'রে দেওয়ার অভিযান। হেলওয়ান সম্বন্ধে কিছু ছিলো না?"

"হ্যা, স্যার, মোটামুটিভাবে..."

"কিন্তু সেগুলো আদতে কি জন্যে... জানো না?"

"আন্দাজ করেছি অবশ্য..."

"ওগুলো ছুঁড়ে ইস্রায়েলের ওপর কয়েক টন ভারি বিস্ফোরক ফাটানো হবে...তাই না?"

অমায়িক হাসি হাসলো জেনারেল গ্ল্যক্স। "কিছুই বোঝোনি তুমি। যাক, তোমার বোধহয় এখন জানা প্রয়োজন যে কেন ওই রকেটগুলো আর যারা সেগুলো তৈরি করছে তারা আমাদের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ।"

পিঠ এলিয়ে আরাম ক'রে বসলো গ্ল্যকস। ছাদের দিকে দৃষ্টি মেলে অধস্তন কর্মীটিকে হেলওয়ান রকেটের সত্য কাহিনী বর্ণনা ক'রে গেলো।

যুদ্ধের অল্পকাল পরেই হাজার হাজার নাৎসি এবং প্রাক্তন এসএস সদস্য ইউরোপ থেকে পালিয়ে এসেছিলো মিশরে। নীলনদের বালুকাময় তীরে নিরাপদ আশ্রয় গেড়েছিলো তারা। তখন মিশরে ছিলো রাজা ফারুকের শাসন। যারা এসেছিলো তাদের মধ্যে ছিলেন কিছু বৈজ্ঞানিকও। ফারুককে গদিচ্যুত করবার কুদেতা ঘটবার কিছুদিন আগেও ফারুক দু'জন জার্মান বৈজ্ঞানিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছিলেন যে তাঁরা নাকি রকেট নির্মাণের কারখানা গড়বার জন্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। সেটা ছিলো ১৯৫২ সাল; অধ্যাপক দু'জনের নাম পল গ্যের্কে এবং রলফ্ এঙ্গেল।

প্রকল্পটা স্থগিত রইলো কয়েক বছরের জন্যে। ইতিমধ্যে ক্ষমতা হাতে পেয়েছেন গামাল আব্দেল নাসের। ১৯৫৬ সালে সিনাইয়ের যুদ্ধে মিশরী বাহিনী হেরে গেলো। নাসের তখন প্রতিজ্ঞা করলেন যে ইস্রায়েলকে কোন-না-কোনদিন ধূলিসাৎ করতেই হবে।

১৯৬১-তে যখন ভারি ভারি রকেট পাঠানোর অনুরোধ মস্কো বতিল ক'রে দিলো তখন মিশরী রকেট নির্মাণের জন্যে গ্যের্কে-এঙ্গেল পরিকল্পনাটাকে আবার অতি উৎসাহে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোলা হলো। সেই বছরেই জলের মতো অর্থব্যয়ে, সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেই প্রায়, জার্মান অধ্যাপকেরা এবং মিশরীয়রা গড়ে তুললো কায়রোর উত্তরে হেলওয়ানে ফ্যাক্টরি নং ৩৩৩।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু কারখানা গড়া এক কথা, রকেট ডিজাইন করা বা বানানো আরেক কথা। বহুদিন থেকেই নাসেরের কিছু প্রবীণ সমর্থক – দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে তাঁদের নাৎসি অনুকূল প্রেক্ষাপটের জন্য – মিশরে অবস্থিত ওডেসা-প্রতিনিধিদের সঙ্গে গভীর সংযোগ রেখে চলতেন। সেই সূত্রে মিশরের প্রধান সমস্যাটির সমাধানও খুঁজে পাওয়া গেলো – রকেট নির্মাণের জন্যে বৈজ্ঞানিক পাওয়া যাবে কোথা থেকে।

রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন বা ফ্রান্স কেউ একটি লোকও দেবে না। ওডেসার পক্ষ থেকে বলা হলো নাসেরের যেসমস্ত রকেটের প্রয়োজন তার আয়তন বা রেঞ্জ, যুদ্ধের সময়ে জার্মানি পিনেমুন্ডে ওয়ার্নার ফন ব্রউন এবং তাঁর সতীর্থের লন্ডনকে ধ্বংস ক'রে ফেলবার জন্যে যেসব ভি-২ রকেট বানিয়েছিলেন, তার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিল খেয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকদের সেই পুরনো দলের মধ্যে অনেকেই এখনো জীবিত এবং সক্ষম।

১৯৬১-তে শুরু হলো জার্মান বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্তি। তাদের মধ্যে অনেকেই তখন স্টাটগার্টে 'ওয়েস্ট জার্মান ইনস্টিটুট ফর অ্যারোস্পেস রিসার্চ'-এ কাজ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই কাজ সম্বন্ধে উদাসীন, কারণ ১৯৫৪-র প্যারিসের সন্ধিচুক্তি অনুসারে জার্মানির পক্ষে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে প্রাযুক্তিক গবেষণা করা একেবারে নিষেধ, বিশেষ ক'রে পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায় এবং রকেট্রিতে। তার ওপরে আছে গবেষণাগারে চিরন্তন অর্থাভাব। সুতরাং অনেকেই মিশরে আসতে রাজি হয়ে গেলেন; সূর্যকরোজ্জ্বল দেশ, গবেষণার জন্যে অঢেল অর্থ, সত্যিকারের রকেট ডিজাইন করবার সুযোগ – নিঃসন্দেহে লোভনীয় প্রস্তাব।

জার্মানিতে একজন প্রধান নিয়োগকর্তাকে রাখলো ওডেসা। সে আবার তার একজন প্রাক্তন এসএস সার্জেন্টকে রাখলো সহকারী হিসাবে, নাম হাইনৎস ক্রুগ। দু'জনে মিলে গোটা জার্মানি চষে ফেললো – কে রাজি আছো মিশরে যেতে, নাসেরের জন্যে রকেট বানাতে হবে।

অতো ভালো বেতন, সুখসুবিধা, কাজেই ভালো ভালো লোক পেতেও বিশেষ অসুবিধা হলো না। তাদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে অধ্যাপক উলফগ্যাং পিল্‌ৎসের; যুদ্ধোওর জার্মানি থেকে ফরাসীরা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলো, ফ্রেঞ্চ ভেরোনিক রকেটের তিনিই জন্মদাতা। অধ্যাপক পিল্‌ৎস ১৯৬২-র গোড়ার দিকে মিশরে গেলেন। ফন ব্রউনের ভি-২ রকেটের দল থেকে পাওয়া গেলো ড: হাইনৎস

www.boiRboi.blogspot.com

ক্লাইনওয়াখটার এবং ড: কিরমেয়ার। সবাই তাঁরা সঞ্চালন-ইন্ধন এবং প্রয়োগকৌশলে বিশেষজ্ঞ। পৃথিবী তাদের শ্রমের ফল দেখলো ফারুকের পতনের অষ্টম বার্ষিকীতে কায়রো শহরে অনুষ্ঠিত প্যারেডে। সেদিন ২৩শে জুলাই, ১৯৬২। সামরিক শোভাযাত্রায় দুটো রকেট চললো চাকা লাগানো পাটাতনে চেপে। রকেট দুটোর নাম আল কাহিরা ও আল জাফিরা। জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি ক'রে উঠলো। অবশ্য ও দুটো ছিলো শুধু রকেটের বহিরাঙ্গ, বিস্ফোরক বা ইন্ধন তাতে তখনো ছিলো না; তবুও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অদূর ভবিষ্যতে ওই ধরনের ৪০০ অস্ত্র ছোঁড়া হবে।

জেনালের গ্লুক্স থেমে গেলো। চুরুটে টান দিয়ে আবার বললো, "সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যদিও কাঠামো, বিস্ফোরক এবং বাকি সব কিছু বানিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছি, তো যে কোন গাইডেড মিসাইলের চাবিকাঠি হচ্ছে তার টেলি-গাইডেন্স সিস্টেম।"

পশ্চিম জার্মানটির দিকে চুরুট উঁচিয়ে ধ'রে বললো, "সে জিনিস আমরা এখনো মিশরকে দিতে পারিনি। দুর্ভাগ্যবশত গাইডেন্স সিস্টেমে যারা বিশেষজ্ঞ, যারা স্টুটগার্ট বা অন্য কোথাও কাজ করছে, তাদের কাউকেই আমরা মিশরে যেতে রাজি করাতে পারিনি। ওখানে আজ পর্যন্ত যারা গেছে তারা শুধু এ্যারোডায়নামিক্স, সঞ্চালন এবং বিস্ফোরণ নির্মাণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। আমরা মিশরকে কথা দিয়েছি যে রকেট তাদের হবেই, এবং হবেই যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রেসিডেন্ট নাসেরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে একদিন না একদিন মিশর ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ হবে, এবং তাও যে হবেই সেটা একেবারে অবধারিত। নাসের অবশ্য মনে করেন যে তাঁর ট্যাংক এবং তাঁর সেনাবাহিনীই যুদ্ধ জেতার পক্ষে যথেষ্ট। আমরা কিন্তু ততোটা নিশ্চিত নই। সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও নাও জিততে পারেন। কিন্তু ভেবে দেখো, কোটি কোটি ডলার ব্যয় ক'রে যে সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্র তিনি আনিয়েছেন সেগুলো যখন অকৃতকার্য হয়ে যাবে অথচ আমাদের দ্বারা নিয়োজিত বিজ্ঞানীরা যে রকেট বানাবে সেগুলো দিয়ে তিনি যখন যুদ্ধ জিতে যাবে, তখন আমাদের মান কতোখানি বেড়ে যাবে। ডাবল লাভ হবে আমাদের – চিরকালের জন্যে পাবো এক চিরকৃতজ্ঞ মধ্যপ্রাচ্য, সর্বসময়ের জন্যে যা হয়ে উঠবে আমাদের পক্ষে এক পরম-নিরাপদ আশ্রয়। আর দ্বিতীয়ত, ইহুদি শুয়োরগুলোর রাষ্ট্র চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে, মরোণোন্মুখ ফ্যুয়েরারের শেষ ইচ্ছে আমরা রাখতে পারবো। আমাদের সামনে তাই আজ এক বিরাট কর্তব্য এসেছে, আমাদের যা করতেই হবে, অকৃতকার্য হলে চলবে না"

তার বক্তৃতার শেষভাগে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে জেনারেল ঘরে পায়চারি করতে লাগলো। আগন্তুক একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, "হের জেনারেল, ৪০০টি

মাঝারি আয়তনের বিস্ফোরক দিয়ে কি সত্যি সত্যিই ইহুদিগুলোকে চিরতরের জন্যে বিনাশ ক'রে দেয়া সম্ভব? অসাধারণ ক্ষতিসাধন হয়তো হবে, কিন্তু পূর্ণ বিনাশ?"

গ্লুক্স ঘুরে দাঁড়ালো। বিজয়ী-মার্কা হাসি তার মুখে।

"কিন্তু কি ধরনের বিস্ফোরক, সেটা ভাবো তো দেখি?" অধস্তন কর্মীটির দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে আবার শুরু করলো, "ভাবছো যে, ওই হতচ্ছাড়াগুলো ওপর শুধু বারুদ ফাটাতে যাচ্ছি? না না, প্রেসিডেন্ট নাসেরকে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং তিনি যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে সেটা গ্রহণও করেছেন। কাহিরা বিস্ফোরক হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কতোগুলোতে থাকবে বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু, আর কতোগুলো ভূমির অনেক ওপরে ফেটে গিয়ে গোটা ইস্রায়েল রাষ্ট্রে তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়াম-৯০ ছড়িয়ে দেবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হয় প্লেগ রোগে, নয়তো গামারশ্মির প্রচণ্ড প্রভাবে ওরা সবাই মারা যাবে। এই দাওয়াই রেখেছি ওদের জন্যে।"

সহকারিটির মুখ হা হয়ে গেছে। কোনমতে শ্বাস ছেড়ে বললো, "অদ্ভুত! হ্যা...এখন আমার মনে পড়েছে, গত গ্রীষ্মে সুইজারল্যান্ডের একটা বিচার-কাহিনী পড়েছিলাম। শুধু সংক্ষিপ্তসার, কেননা সাক্ষ্য গ্রহণ হয়েছিলো একান্ত গোপনে। তাহলে দেখছি কথাটা সত্যি। আহ্, জেনারেল, এ তো অপূর্ব একটি ব্যাপার!"

"অপূর্ব, হ্যা, তা বলতে পারো। এবং অবশ্যম্ভাবীও বটে, যদি আমরা, ওডেসার লোকেরা রকেটগুলোতে ঠিক ঠিক টেলি-গাইডেন্স সিস্টেম বসিয়ে দিতে পারি, যাতে ওগুলো শুধু নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই যাবে তাই নয়, সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে বিস্ফোরন ঘটাবে। সেই টিলি-গাইডেন্স সিস্টেমের অনুসন্ধান এবং গবেষণা এখন চলছে পশ্চিম জার্মানিতে। যে ব্যক্তিটি আছে এই প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে তার সাংকেতিক নাম ভালকান। গৃক পুরাণ মনে আছে তো তোমার? ভালকান ছিলো একজন কামার যে ঈশ্বরের জন্যে বজ্র বানিয়ে দিয়েছিলো।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আগন্তুক প্রশ্ন করলো, "তিনি কি বৈজ্ঞানিক?"

"না, নিশ্চয়ই না। ১৯৫৫-তে যখন অদৃশ্য হয়ে যেতে বাধ্য হলো, তখন আর্জেন্টিনাতে চলে আসাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু আমাদেরই নির্দেশে তোমার পূর্বসুরী তাকে একটা ভূয়া পাসপোর্ট বানিয়ে দিয়েছিলো জার্মানিতে থাকার জন্যে। তারপর জুরিখ থেকে তাকে দশ লক্ষ আমেরিকান ডলার তুলে দেয়া হয়, জার্মানিতে একটা কারখানা স্থাপন করবার জন্যে। শুরুতে উদ্দেশ্য ছিলো অন্য একটা গবেষণার ব্যাপারে ওই কারখানাটাকে আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তখন সেই গবেষণাতেই ছিলো আমাদের উৎসাহ, কিন্তু হেলওয়ানে গাইডেন্স সিস্টেম আরো গুরুত্বপূর্ণ তাই সেটা এখন স্থগিত আছে। ভালকানের ফ্যাক্টরিতে ট্রানজিস্টার রেডিও তৈরি হয় কিন্তু সেটাও একটা আড়াল। ওই কারখানার গবেষণা

www.boiRboi.blogspot.com

বিভাগে একদল বৈজ্ঞানিক টেলি-গাইডেন্স সিস্টেম নিয়ে এখনো কাজ ক'রে যাচ্ছে। হেলওয়ানের রকেট সিস্টেম একদিন না একদিন লাগানো হবে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রশ্ন করলো, "তারা ইজিপ্টে চলে গেলেই পারে?"

গ্লুকস একটু হেসে আবার পায়চারি করতে শুরু করলো। বললো, "সেইখানেই তো চালাকি। তোমাকে আমি বললাম না যে জার্মানিতে ওই ধরনের রকেট গাইডেন্স সিস্টেম বানানোর লোক আছে, কিন্তু তাদের কাউকেই ওদেশে পাঠানো সম্ভব হলো না। ভালকানের কারখানায় যারা এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণায়রত তারা আজও বিশ্বাস করে যে একান্ত গোপনীয়তার আড়ালে তারা আসলে বনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হয়ে কাজ করছে।"

"অ্যা?" লোকটা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলে কার্পেটে কফি ছল্‌কে পড়লো। "কি ক'রে করলেন?"

"অত্যন্ত সহজ। প্যারিস-চুক্তি অনুসারে রকেট সম্বন্ধে কোন গবেষণাই করতে পারবে না জার্মানি। বনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সত্যিকারের একজন খাঁটি অফিসার ...আমাদেরই লোক সে...ভালকানের বিজ্ঞানীদের দিয়ে গোপনীয়তার শপথ নেওয়ালো, সঙ্গে ছিলো এমন একজন জেনারেল যার ছবি গত মহাযুদ্ধে সময় সবাই দেখেছে। বৈজ্ঞানিকগুলো সবাই জার্মানির জন্যে কাজ করতে উৎসুক তা প্যারিস চুক্তি লঙ্ঘন হলোই বা, কিন্তু মিশরের হয়ে তারা কাজ করতে রাজি নয়। এখন তারা ভাবছে যে জার্মানির হয়েই তারা কাজ করছে। অবশ্য সাংঘাতিক বেশি খরচ হচ্ছে। এই ধরনের গবেষণা তো সাধারণত বৃহৎ শক্তিগুলো ছাড়া কেউ করতে পারে না। আমাদের গোপন তহবিল থেকে খুব বেশি ব্যয় হয়ে গেলো এসব করতে গিয়ে। এখন বুঝলে তো ভালকানের গুরুত্ব?"

"নিশ্চয়ই" জার্মানিতে অবস্থিত ওডেসা প্রধান ব'লে উঠলো, "তবে, ধরুন কখনো যদি তার কিছু ঘ'টে যায়, কাজটা চলবে না?"

"না। ফ্যাক্টরি এবং কোম্পানি ভালকানের নিজস্ব। সেই-ই চেয়ারম্যান, সেই-ই ম্যানেজিং ডিরেক্টর, শেয়ার হোল্ডারও একমাত্র সেই-ই, টাকাপয়সা দেবার অধিকারীও সে নিজে, বিজ্ঞানীদের মাইনে এবং গবেষণার খরচ একমাত্র সেই-ই মেটাতে পারে। বিজ্ঞানীদের করো সঙ্গেই কারখানার অন্য কোন অংশের সম্পর্ক নেই, কারখানার অন্য কেউই কোম্পানির অতো বড় গবেষণা বিভাগে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানে না। তারা জানে যে ওই সুরক্ষিত গবেষণাগারে মাইক্রোওয়েভ সার্কিট নিয়ে এমন সব কাজ হচ্ছে যা ট্রানজিস্টার ব্যবসায়ে বিপ্লব এনে দেবে। গোপনীয়তার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে শিল্প-রাজ্যে যথেষ্ট গুপ্তচরবৃত্তি চলে, কাজেই এরকম ব্যবস্থা কোম্পানির স্বার্থেই প্রয়োজন। দুটি বিভাগের মধ্যে একমাত্র সংযোগ ভালকান নিজে। অতএব সে যদি চলে যায়, গোটা প্রকল্পই ধসে পড়বে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"কারখানাটার নাম আমাকে বলতে পারেন?"

জেনারেল গ্লুকস মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত ক'রে একটা নাম বললো। আগন্তুক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো।

"কিন্তু ওই রেডিওগুলো তো আমি দেখেছি।"

"দেখবে না কেন? কোম্পানিটি আসেলে সত্যিসত্যিই রেডিও তৈরি করে।"

"আর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তাঁর নাম কি...?"

"হ্যা, সেই-ই তো ভালকান। এখন বুঝেছো লোকটার গুরুত্ব কতোখানি। সেই জন্যেই তোমাকে আরো কিছু নির্দেশ দেবার আছে। এই দেখো –" জেনারেল তার বুকপকেট থেকে একটা ছবি বের ক'রে লোকটির হাতে দিলো। অনেকক্ষণ ধ'রে ছবিটা দেখে তার মুখে বিভ্রান্তির ছাপ ফুটে উঠলো। তারপর, ছবিটা উল্টে পেছন দিকে লেখা নামটা প'ড়ে অবাক হয়ে গেলো।

গ্লুক্স মাথা ঝাঁকালো, "উঁহু, বরং এর নামই হচ্ছে ভালকান।...শোনো, ওর কাজ এখন একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এসে পৌছেছে। অতএব, কেউ যদি তার সম্বন্ধে কোন রকম প্রশ্ন-টশ্ন করছে বলে তুমি শুনতে পাও তবে তাকে তুমি...নিরুৎসাহিত করবে। একবার সাবধান ক'রে দেবে, তারপর স্থায়ী সমাধান। বুঝতে পারলে, কামেরার্ড? কেউ যেনো কোন মতেই ভালকানের আসল পরিচয় জানতে না পারে।"

এসএস জেনারেল উঠে দাঁড়ালে তার অতিথিও উঠে দাঁড়ালো। "ব্যস," গ্লুকস আলোচনার সমাপ্তি টেনে দিলো, "এই হলো তোমার কর্তব্য, নির্দেশ তো জানতেই পারলে।"

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ৪

রবিবারে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর কার্ল ব্রান্ডটের ছুটি। খুঁজে খুঁজে পিটার মিলার লাঞ্চের সময় তার বাড়িতে এসে তাকে ধরলো। পরিবারের সবার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে বসতে যাচ্ছে, এমন সময় মিলার এলো তার জাগুয়ার গাড়িতে করে। ব্রান্ডটের বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলো গাড়িটাকে। সেখানেই আসলো ব্রান্ডট, "কিন্তু তুমি তো জানোই না যে, সে বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে।"

"না, তা জানি না। যদি মরে গিয়ে থাকে রশম্যান তো ল্যাঠা চুকেই গেলো। তবে সেটাও তো জানতে হবে। তুমি আমাকে সাহায্য করো না?"

কথাটা ভেবে দেখলো ব্রান্ডট। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো, "না, পারবো না, দুঃখিত।"

"কেন?" মিলার জানতে চাইলো।

"দেখো, তোমাকে আমি ডায়রিটা দিয়েছিলাম কেন জানো? ওটা পড়ে আমার ভীষণ খারাপ লেগেছিলো, তাই ভাবলাম তুমি হয়তো কোন কাহিনী-টাহিনী বানাতে পারবে। কল্পনাও করতে পারিনি তুমি আবার রশম্যানের পেছনে ধাওয়া করবে। ডায়রিটার বিষয়বস্তু নিয়ে একটা কিছু লিখছো না কেন?"

"লিখছি না, তার কারণ এ থেকে কিছু লেখারই নেই," মিলার বললো। "কি লিখবো – 'দেখুন দেখুন, কী আশ্চর্য, একজন বৃদ্ধ গ্যাসে আত্মহত্যা করেছে, রেখে গেছে একটা ডায়রি, তাতে যুদ্ধের সময়ের নানা কাহিনী-টাহিনী লেখা আছে?' কোন সম্পাদক এরকম মাল কিনবে ভাবছো? আমরা নিজস্ব ধারণা অবশ্য যে, ডায়রিটা একটা মর্মান্তিক ইতিহাস, কিন্তু সে তো নেহাৎ আমার ব্যক্তিগত মতামত। যুদ্ধের পর থেকে এমন শয়ে শয়ে স্মৃতিচারণ বই হয়ে বেরিয়েছে। এসব আর চলে না। জার্মানির কোন প্রকাশক বা সম্পাদক এসব নেবেই না।"

"তো, কি করতে চাও তুমি?" ব্রান্ডট প্রশ্ন করলো।

www.boiRboi.blogspot.com

"অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। ডায়রিটার ওপর ভিত্তি ক'রে বড় রকম একটা পুলিশি তৎপরতা শুরু ক'রে দেয়া, তাহলেই আমি পাবো একটা ভালো সংবাদ-কাহিনী।"

ড্যাশবোর্ডের ছাইদানির ওপরে ধীরে ধীরে সিগারেটে টোকা মেরে ব্রান্ডট বললো, "কোন বড় রকম পুলিশি তৎপরতা ঘটবে না। দেখো, তুমি হয়তো সাংবাদিকতা জানো, কিন্তু হামুর্গের পুলিশকে আমি বেশ ভালো করেই চিনি। এই তেষট্টি সালে আমাদের কাজ হলো হামুর্গকে শুধু অপরাধ-মুক্ত ক'রে রাখা। বিশ বছর আগে রিগাতে কে কী করেছিলো তার জন্যে আমাদের গোয়েন্দাদের দৈনন্দিন কাজ থেকে সরিয়ে আনা – ? ভুলে যাও।"

"কিন্তু তুমি অন্তত বিষয়টা তো উত্থাপন করতে পারো?" মিলার বললো।

ব্রান্ডট মাথা ঝাঁকালো, "উঁহু, আমার দ্বারা হবে না।"

"কেন? কী ব্যাপার?"

"কারণ, আমি এতে জড়িয়ে পড়তে চাই না। তোমার কথা আলাদা। বিয়ে-থা করোনি, ঝাড়া হাত পা, ইচ্ছে করলে মরীচিকার পেছনে ছুটতে পারো। আমার বউ আছে, দুটো ছেলেমেয়ে আছে, চাকরিতে ভবিষ্যৎ আছে। সেই ভবিষ্যৎ তো আমি নষ্ট করতে পারি না।"

"কেন, পুলিশ লাইনে তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে কেন এতে? রশম্যান তো একটা অপরাধী, তাই না? পুলিশের কাজই তো অপরাধীদের ধরা, তা হলে?"

সিগারেটের শেষ অংশ থেঁতলে দিলো ব্রান্ডট।

"পরিষ্কার ক'রে বোঝানো মুশকিল। পুলিশমহলে, জানো, একটা হাওয়া আছে – শুধুই হাওয়া কিন্তু, জমাট কিছু না – যে এসএস'র যুদ্ধ-অপরাধ নিয়ে বেশি আগ্রহ দেখালে তরুণ অফিসারদের চাকরিতে লাভ হয় না। স্পষ্ট ক'রে কিছু বলা হয় না অবশ্য। তদন্ত করবার অনুরোধটা নামঞ্জুর হয়ে যায়। কিন্তু এরকম একটা অনুরোধ যে করা হয়েছিলো সেই খবরটা চলে যায় ফাইলে। তোমার প্রমোশনেরও সঙ্গে সঙ্গে বারোটা বেজে যায়। কেউ কিছু বলে না, কিন্তু সবাই জানে। তাই বলছি যে তুমি যদি এটা নিয়ে বড় কিছু খুঁড়ে বের করতে চাও তো তুমি নিজেই করো, আমাকে বাদ দাও।"

মিলারর একটু চুপ ক'রে বসে থাকলো, উইন্ডস্ক্রিন ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে যায় তার দৃষ্টি। তারপরে বললো, "আচ্ছা, তাই করবো। কিন্তু শুরু তো করতে হবে কোন এক জায়গা থেকে। মরার সময় টউবের কি কিছু লিখে গেছে?"

"হ্যা, ছোট্ট একটা চিঠি। সেটা আবার আমাদের নিয়ে যেতে হয়েছিলো, আত্মহত্যার বিবরণের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিয়েছি। এতোক্ষণে ফাইল হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। পুলিশের চোখে কেসটা এখানেই শেষ।"

"কি লেখা ছিলো ওটাতে?" মিলার জানতে চাইলো।

www.boiRboi.blogspot.com

"কি আর বিশেষ!" ব্রান্ডট জানায়, "লিখেছিলো যে, সে আত্মহত্যা করছে। হ্যা, হ্যা, আরো একটা কথা ছিলো অবশ্য, বলে গিয়েছে যে, তার জিনিসপত্র সব তার বন্ধু হের মার্ক্সকে দিয়ে গেলো।"

"আচ্ছা, তবে তো একটা সূত্র পাওয়া গেলো। মার্ক্স কে?"

"আমি কি ক'রে জানবো?" ব্রান্ডট বললো।

"মানে বলতে চাচ্ছো যে, চিঠিতে শুধু ওইটুকুই ছিলো? শুধু হের মার্ক্স? কোন ঠিকানা না?"

"কিচ্ছু না," ব্রান্ডট বললো, "শুধু মার্ক্স। কোথায় থাকে, তারও কোন হদিস নয়।"

"কাছেই কোথাও হবে নিশ্চয়ই। খোঁজ করেছিলে?"

ব্রান্ডট বেশ জোরে নিশ্বাস ফেললো। "তোমার মাথায় কি কিছুই ঢোকে না? বললাম না যে, আমরা পুলিশেরা সব সময়েই ভীষণ ব্যস্ত থাকি। তোমার কোন ধারণা আছে হাম্বুর্গে কতোজন মার্ক্স রয়েছে? টেলিফোন ডিরেক্টরিতেই তো কয়েকশো পাবে। এই বিশেষ মার্ক্সের খোঁজে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারি না আমরা। তাছাড়া, বুড়ো যা রেখে গেছে তার দাম দশ ফেনিগেরও বেশি হবে না।"

"আচ্ছা! তাহলে শুধুই এই? আর কিছু না?" মিলার জিজ্ঞেসা করলো।

"উহু, আর কিচ্ছু না। মার্ক্সকে যদি খুঁজে বের করতে চাও, তুমি নিজেই চেষ্টা করো, আপত্তি নেই।"

"বেশ, তাই করবো।" মিলার বললো।

দু'জনে হাত-টাত মেলাবার পর ব্রান্ডট বাড়ির ভেতরে চলে গেলো পরিবারের সঙ্গে খেতে বসতে।

পরদিন সকালে মিলার চলে এলো সেই বাড়িতে যেখানে টউবের থাকতো। দরজা খুলে দিলো একজন মাঝবয়সী লোক। তার পরনের প্যান্টটা দাগ-দাগ, দড়ি দিয়ে কোমরে শক্ত ক'রে বাঁধা, গলা-খোলা জামা, কলার-টলার নেই। গালে অন্তত তিন দিন না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

"হায়। আপনিই কি বাড়িওলা?"

লোকটা মিলারকে ভালো ক'রে দেখে নিয়ে মাথা নাড়লো। শরীর থেকে তার বাঁধাকপির গন্ধ বেরুচ্ছে।

মিলার বললো, "কয়েক রাত আগে এখানে একজন লোক গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলো।"

"আপনি কি পুলিশ?"

"না, প্রেস," প্রেসকার্ডটা বের ক'রে দেখালো মিলার।

www.boiRboi.blogspot.com

"আমার কিছুই বলার নেই।"

লোকটার হাতে একটা দশ মার্কের নোট গুঁজে দিলো মিলার, এতে সে কোন আপত্তি করলো না।

"ঘরটা আমি একটু দেখতে চাই।"

"নতুন ভাড়াটে এসে গেছে।" লোকটা জানালো।

"ওর জিনিসপত্র কী করেছেন?"

"পেছনের উঠানে রেখে দিয়েছি। তাছাড়া করার কি ছিলো, বলেন?"

কিছু জিনিস এক কোণায় রাখা ছিলো, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তার ওপর। ওগুলোতে এখনো গ্যাসের গন্ধ। পুরনো একটা টাইপরাইটার, দু'জোড়া ক্ষয়ে-যাওয়া জুতো, কিছু কাপড়চোপড়, অল্প কিছু বই আর পাড়-লাগানো একটা সাদা রেশমী স্কার্ফ। স্কার্ফটাকে দেখে মিলার ভাবলো যে ইহুদি ধর্মের কোন অনুষ্ঠানে বোধহয় ওটা লাগে। সব জিনিসপত্র খুঁজে দেখলো মিলার কিন্তু কোন ঠিকানার খাতা-টাতা পেলো না, মার্ক্সের ঠিকানাও কোথাও লেখা নেই।

"এই সব?" জিজ্ঞেস করলো মিলার।

"হ্যা," পেছন-দরজার পাশ থেকেই লোকটা মিলারের দিকে বিশ্রী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো।

"আপনার কোন ভাড়াটে আছে মার্ক্স নামে?"

"না।"

"টউবেরের কোন বন্ধুবান্ধব ছিলো?"

"আমি দেখিনি কখনো। একা একাই থাকতো, আসা-যাওয়ার সময়-অসময়ও ছিলো না। মাথায় ছিট ছিলো মিস্টার। কিন্তু ভাড়ার টাকাটা ঠিক ঠিক দিয়ে দিতো, সেদিকে কোন অসুবিধা ছিলো না।"

কখনো কারোর সঙ্গে তাকে দেখেছেন? মানে, বাইরে, রাস্তায়?"

"না, কখনো না। বন্ধু-টন্ধু ছিলো না বোধহয়। তাতে আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি, ওইরকম সব সময় বিড়বিড় ক'রে আপন মনে কথা বলতো সে, বদ্ধ পাগল একেবারে।"

মিলার ওখান থেকে বেরিয়ে এলো। রাস্তার আশেপাশে নানা লোককে জিজ্ঞাসা করলো। অনেকেরই মনে আছে মাথা নিচু ক'রে বুড়ো লোকটা রাস্তায় পায়চারি ক'রে বেড়াতো হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা গ্রেটকোট পরে, উলের টুপি মাথায়, হাতে দস্তানা।

তিন দিন ধ'রে সেই এলাকায় জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে বেড়ালো মিলার। দুধের ডেয়ারি ফার্ম, মুদিদোকান, মাংসওলা, লোহালক্কড়ের দোকান, বিয়ারের বার, তামাকের দেকান – সর্বত্র খোঁজ করলো। রাস্তার দুধওলা এবং পোস্টম্যানকেও

www.boiRboi.blogspot.com

ধরলো। কিন্তু কোন লাভ হলো না। বুধবার বিকেলে দেখলো একদল ছেলে গুদামের দেয়ালটাতে বল দিয়ে কিক মেরে খেলছে।

তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই সেই দলের এক খেলোয়াড় পাল্টা প্রশ্ন করলো, "কে, ওই বুড়ো ইহুদিটা? বদ্ধপাগলটা?" ততোক্ষণে একে একে খেলা ছেড়ে সবাই এসে মিলারের চারপাশ ঘিরে ধরেছে।

"হ্যা," মিলার বললো,"সেই পাগলটাই।"

দলের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলো, "ছিট ছিলো তার মাথায়, এমনি ক'রে হাঁটতো।"

বলেই ছেলেটি তার নিজের কাঁধে মাথা গুঁজে দু'হাতে জ্যাকেটের দুটো পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা জড়িয়ে জড়িয়ে হেটে দেখালো, মুখে বিড়বিড় করে আর চারদিকে চোখ গোল গোল ক'রে তাকালো সে। হো হো ক'রে হেসে ওঠলো সবাই। একজন এসে ছেলেটাকে মারলো এক ধাক্কা, উপুড় হয়ে পড়ে গেলো সে। আবার হাসির রোল ওঠে।

"কেউ দেখেছো তাকে অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলতে?" মিলার জিজ্ঞেস করে, "অন্য কোন লোক?"

দলের সর্দার টাইপের ছেলেটা সন্দেহের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে, "জেনে আপানার কি লাভ?"

"কোন ক্ষতি হবে না, ভালোর জন্যেই।"

মিলার পকেট থেকে পাঁচ মার্কের একটা মুদ্রা বের ক'রে নিরাসক্তভাবে সেটা ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিলো। আটজোড়া চক্‌চকে চোখ এসে পড়লো এই ঝক্‌ঝকে রূপালি মুদ্রাটার ওপর। মুখ ঘুরিয়ে হাঁটতে শুরু করলো মিলার।

"শুনুন।"

থম্‌কে ফিরে দাঁড়ালো মিলার। দলের সবচেয়ে ছোট ছেলেটি তার কাছে এসে পড়েছে।

"আমি একবার ওকে দেখেছিলাম একটা লোকের সঙ্গে। কথা বলছিলো তারা দু'জনে। ব'সে ব'সে কথা বলছিলো।"

"কোথায়?"

"নদীর ওইদিকটাতে, যেখানে অনেক ঘাস আছে। বেঞ্চিও পাতা আছে, বেঞ্চিতে ব'সে ব'সে কথা বলছিলো ওরা।"

"দ্বিতীয় লোকটা কতো বড়, বুড়ো?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"ভীষণ বুড়ো, মাথাভর্তি সাদা চুল।"

মুদ্রাটা ওকে যদিও দিয়ে দিলো মিলার তবুও মনে মনে নিশ্চিত যে বৃথাই গেলো সেটা। হেঁটে হেঁটে চলে গেলো নদীর দিকে। দু'পাশে ঘাসে ঢাকা পাড়।

www.boiRboi.blogspot.com

সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো। ডজনখানের বেঞ্চি আছে দু'পাশে পাতা, কিন্তু সবগুলো ফাঁকা। গরমকালে প্রচুর লোক এলব্ শসির তীরে ব'সে ব'সে বড় বড় জাহাজগুলোর আসা-যাওয়া, দেখে, কিন্তু এখন নভেম্বরের শেষে কেউ নেই।

এপারে বাম দিকটাতে রয়েছে মাছের ঘাট। বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে উত্তরসাগরের গোটা ছয় ট্রলার, হয় তারা সদ্য ধরা হেরিং আর ম্যাকারেলের ঝাঁক নামিয়ে দিচ্ছে, নয়তো আবার সাগরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ছোটবেলায় আলটনার তীরের এই মাছের ঘাটটা তার খুব প্রিয় ছিলো। জেলেদেরও খুব ভালো লাগতো তার। সরল স্পষ্ট-বক্তা সব মানুষ, কিন্তু মায়া-দয়া খুব, গা দিয়ে তাদের আলকাতরা, লবন আর তামাকপাতার গন্ধ বের হোতো। রিগার এডুয়ার্ড রশম্যানের কথা মনে পড়লো। আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে, এই একই দেশ থেকে এ-ধরনের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ জন্মায় কী ক'রে!

আবার টউবেরের কথা মনে পড়লো। সমস্যাটা যে সমস্যাই রয়ে গেলো, জানাও গেলো না কোথায় গেলে তার বন্ধু মার্ক্সের দেখা পাওয়া যাবে। তবু মনে হয় কোন একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে, ঠিক মাথায় আসছে না সেটা। ফিরে গিয়ে গাড়ি চালিয়ে রওনা দিলো। আলটনা রেলস্টেশনের কাছে এসে ঢুকলো একটা পেট্রল পাম্পে। এইখানেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো কথাটা তার মনে পড়লো। মনে পড়লো পাম্পের লোকটার খুব সাধারণ একটা কথা থেকে। লোকটা তাকে বোঝাচ্ছিলো যে সেদিন থেকেই ভালো গ্রেডের পেট্রলের দাম বেড়ে গেছে। দু-চারটা মিষ্টি কথায় খদ্দেরের মেজাজ ঠিক রাখবার জন্যেই বোধহয় বললো যে আজকাল কি যে হয়েছে, দিনকে দিন টাকার দাম কমছে। খুচরা আনতে চলে গেলো সে, কিন্তু মিলার তখন হা ক'রে তার নিজের মানিব্যাগের দিকে তাকিয়েই আছে।

টাকা...অর্থ। টউবের টাকা কোথায় পেতো? সে তা কোন কাজ করতো না। জার্মান রাষ্ট্র থেকে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ নিতেও অস্বীকার করেছিলো। তবুও তো সে ঠিকমতো ভাড়া দিতো, খেতে পারতো। বয়স ছিলো ছাপ্পান্ন, অতএব বার্ধক্য পেনশনের বয়সও হয়নি। অক্ষমতার পেনশন বোধহয় পেতো, নিশ্চয়ই পেতো।

খুচরো টাকা পকেটে নিয়েই চলে এলো আলটনা পোস্ট-আফিসে। একটা জানালায় ফলক লাগানো ছিলো 'পেনশনস', সেখানে এসে দাঁড়ালো সে।

শিকের ওপাশে ব'সে আছে একজন বেশ মোটা-সোটা মহিলা। তাকে জিজ্ঞেস করলো মিলার, "আচ্ছা বলতে পারেন, পেনশনভোগীরা কবে এসে টাকা নিয়ে যায়?"

"মাসের শেষদিকে।"

"মানে, এই শনিবারে?"

"না, সপ্তাহের শেষের দিনে দেওয়া হয় না। তাই এই মাসে দেওয়া হবে

www.boiRboi.blogspot.com

শুক্রবারে, মানে পরশুদিন।"

"যারা অক্ষমতার পেনশন পায় তারাও কি ওইদিন পাবে?" মিলার জানতে চাইলো।

"সবাই। সব পেনশনভোগীরাই একই দিনে পায়।"

"এইখানেই, আপনার কাছ থেকেই?"

"যদি আলটনায় থাকেন তো এইখান থেকেই," মহিলা জানালো।

"কখন? ক'টার সময়?"

"পোস্ট অফিস যখন থেকে খোলে।"

"ধন্যবাদ।" মিলার এই বলে ওখান থেকে সেদিনের মতো চলে এলো।

শুক্রবার সকালে মিলার আবার ফিরে গেলো সেখানে। দেখলো পোস্ট অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়োবুড়ী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেওয়ালের একপাশে দাঁড়িয়ে মিলার লক্ষ্য করলো টাকা নিয়ে কে কোনদিকে যায়। এগারোটার একটু আগে পেনশন নিয়ে বেরুলো এক বুড়ো, যার মাথাভর্তি ফুরফুরে সাদা চুল। সিঁড়িতে বারবার টাকা গুনে নিলো, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কোটের ভেতর-পকেটে সেটা ঢুকিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে, যেনো কউকে খুঁজছে। কয়েক মিনিট পরে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করলো লোকটা। গেট থেকে বিরিয়ে আবার এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর মিউজিয়াম স্ট্রট ধ'রে সোজা নদীর ধারে চলে গেলো। মিলারও আসলো পেছনে পেছনে।

এলব্ শসি পর্যন্ত আধমাইল রাস্তা হাঁটতেই বিশ মিনিট সময় লাগলো। নদীর পাড়ে পৌছে ধীরে ধীরে ঘাসের ওপর দিয়ে গিয়ে বসলো একটা বেঞ্চিতে লোকটা। পেছন থেকে আস্তে ক'রে মিলার এসে দাঁড়ালো।

"হের মার্ক্স?" মিলার পেছন থেকে বললো।

বৃদ্ধ ফিরে তাকালো কিন্তু আশ্চর্য হলো না, যেনো অপরিচিত লোকদের আহ্বান শুনতে সে অভ্যস্ত।

"হ্যা," গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "আমি মার্ক্স।"

"আমি মিলার।"

কথাটা শুনে শুধু বুড়ো মাথা নাড়লো।

"আপনি কি...হের টউবেরের জন্যে অপেক্ষা করছেন?"

"হ্যা," এবারেও বৃদ্ধ আশ্চর্য হলো না।

"আমি একটু বসি?"

"বসুন।"

মিলার বেঞ্চিতে তার পাশে ব'সে পড়লো। দু'জনেরই মুখ এলব্ নদীর দিকে। বিশাল একটা মালবাহী জাহাজ, ইওকোহামার কোতামারু, তখন উজানের টানে

চলেছে।

"হের টউবের আর বেঁচে নেই।" মিলার আস্তে করে লোকটাকে জানালো।

বৃদ্ধ চলন্ত জাহাজটার দিকেই নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো। বিস্ময় বা শোকের কোন অভিব্যক্তিই নেই তার মুখে, যেনো এই ধরনের সংবাদ সে প্রায়ই শুনে থাকে।

শুধু বললো, "ও!"

মিলার তাকে গত শুক্রবার রাতের ঘটনা বিস্তারিত সব জানিয়ে দিলো।

"অবাক হচ্ছেন না, আত্মহত্যা করলেন তিনি?"

"না।" মার্ক্স বললো, "ও খুব অসুখী ছিলো।"

"একটা ডায়রি রেখে গেছেন, জানেন?"

"হ্যা, আমাকে একবার বলেছিলো।"

"পড়েছেন আপনি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"না, কাউকেই পড়তে দিতো না। তবে আমাকে বলেছিলো।"

"যুদ্ধের সময় তিনি রিগাতে ছিলেন, সেইসব কাহিনী লেখা আছে।"

"হ্যা, আমাকে বলেছিলো যে সে রিগাতে ছিলো।"

"আপনিও কি রিগাতে ছিলেন?"

বিষণ্ন দৃষ্টি মেলে তাকালো বৃদ্ধ।

"না, আমি ডাটাউয়ে ছিলাম।"

"দেখুন হের মার্ক্স, আমার খুব আপনার সাহায্য দরকার। তাঁর ডায়রিতে আপনার বন্ধু একজন এসএস অফিসারের কথা লিখে গেছেন। তার নাম রশম্যান, এডুয়ার্ড রশম্যান। আপনাকে তার কথা কখনো বলেছিলো?"

"হ্যা, বলেছিলো। রশম্যানের কথা আমাকে বলেছিলো সে। ও তো কেবল বেঁচেছিলো সেই জন্যেই। আশা করতো যে কোন-না-কোনদিন রশম্যানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।"

"হ্যা, ডায়রিতেও সে কথা লিখে গেছেন। আমি তাঁর মৃত্যুর পর ডায়রিটা পড়েছি। আমি একজন সাংবাদিক। রশম্যানকে আমি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছি। তাকে বিচারের জন্যে আদালতে আনতে চাই। বুঝেছেন?"

"হ্যা।"

"কিন্তু রশম্যান যদি বেঁচে না থাকে তবে তো এগুলো বৃথাই পণ্ডশ্রম হবে। আপনার মনে আছে কি হের টউবের কিছু জানতে পেরেছিলেন, রশম্যান বেঁচে আছে না মরে গেছে?"

কোতামারু জাহাজের বিলীয়মান অবয়বের দিকে তাকিয়ে রইলো মার্ক্স, কয়েক মিনিট ধরে।

"ক্যাপ্টেন রশম্যান জীবিত আছে," অবশেষে বললো সে, "এবং স্বাধীনভাবেই

www.boiRboi.blogspot.com

ঘুরে ফিরছে।"

মিলার উত্তেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। "কি ক'রে জানলেন?"

"টউবের তাকে দেখেছিলো।"

"হ্যা, সে তো আমি ডায়রিতে পড়েছি, কিন্তু সেটা হলো আপনার এপ্রিল, ১৯৪৫-এর ঘটনা।"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো মার্ক্স। "না, গত মাসে।"

হতভম্বের মতো মার্ক্সের দিকে তাকিয়েই রইলো মিলার।

দৃষ্টি সরিয়ে মার্ক্স নদীর দিকে তাকালো।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মিলার আবার জিজ্ঞাসা করলো, "গত মাসে? কোথায়, কেমন করে, বলেছিলেন আপনাকে?"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মার্ক্স মিলারের দিকে তাকালো।

"হ্যা, সেদিন সে অনেক রাতে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, ঘুম না এলে তাই করতো সে। স্টেট অপেরা হাউসের পাশ দিয়ে আসছিলো। কিছু লোক তখন হল থেকে বেরিয়ে এসে ফুটপাতে দাঁড়াতেই টউবেরকে কয়েক মিনিট থমকে দাঁড়াতে হয়েছিলো। বলেছিলো যে তারা সবাই নাকি বেশ বড়লোক, পুরুষগুলোর গায়ে ডিনার জ্যাকেট, স্ত্রীলোকগুলোর গায়ে ফারকোট, দামি দামি অলংকার। ফুটপাতের পাশেই তিনটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিলো। ওরা এসে গাড়িতে উঠছে, তাই হলের কর্মীরা দু'পাশের পথচারীদের থামিয়ে দিয়েছিলো। তখন সে রশম্যানকে দেখেছিলো।"

"অপেরা দর্শকদের মধ্যে?"

"হ্যা। আরো অন্য দু'জনের সঙ্গে সে ট্যাক্সিতে চড়ে চলে গিয়েছিলো।"

"অ্যা, বলেন কি? শুনুন, হের মার্ক্স, লোকটা যে রশম্যান তা কি উনি সঠিক চিনেছিলেন?"

"হ্যা, বলেছিলো, রশম্যান যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তার।"

"কিন্তু তাকে তো তিনি শেষ দেখেছিলেন উনিশ বছর আগে। চেহারা অনেক বদলে যেতে পারে। কী ক'রে অমন নিশ্চিত হতে পারলেন?"

"বলেছিলো যে সেই লোকটাও তার দিকে চেয়ে হেসেছিলো।"

"কি করেছিলো?"

"হেসেছিলো। রশম্যান হেসেছিলো।"

"সেটা কি এতোই গুরুত্বপূর্ণ?"

কয়েক বার মাথা নাড়লো মার্ক্স। "ও বলেছিলো যে, রশম্যানের হাসি একবার যে দেখেছে সে কোনদিন ভুলতে পারে না। হাসিটার বর্ণনা অবশ্য ও দিতে পারেনি, কিন্তু বলেছিলো যে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে দুনিয়ার যে কোন স্থানে ওই হাসি

দেখলেই সে চিনতে পারবে।"

"তাই নাকি? আপনি বিশ্বাস করেন সে কথা?"

"হ্যাঁ। রশম্যানকে যে ও দেখেছিলো তা আমি বিশ্বাস করি।"

"বেশ, আমিও না হয় বিশ্বাস করলাম। ট্যাক্সির নম্বর লক্ষ্য করেছিলেন?"

"না। বলেছিলো যে এমন সাংঘাতিক চম্‌কে উঠেছিলো সে যে, কিছুই করেনি, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়িটাকে চলে যেতে দেখে ছিলো।"

"ইস্‌!" মিলার বললো, "সম্ভবত ট্যাক্সিটা গিয়েছিলো কোন হোটেলে। নম্বরটা থাকলে ড্রাইভারকে ডিজ্ঞেস করা যেতো সেদিন ওদের কোথায় নিয়ে গিয়েছিলো। হের টউবের আপনাকে এই ঘটনা কবে বলেছিলেন?"

"গত মাসে, যেদিন আমরা পেনশন নিলাম। এইখানে, এই বেঞ্চিতে বসেই।"

উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো মিলার। "আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন যে তাঁর গল্প কেউ বিশ্বাশ করবে না?"

মার্ক্স সুদূর থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে রিপোর্টারের মুখের ওপরে রাখলো। "জানি। টউবেরও জানতো, আর সেইজন্যেই তো ও আত্মঘাতী হলো।"

সেই সন্ধ্যায় পিটার মিলার তার মায়ের বড়িতে গেলো, সপ্তাহে একবার ক'রে মায়ের সঙ্গে দেখা করবার নিয়মটা পালন করবার জন্যে। মায়ের সেই একই অনুযোগ, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে না, দিনভর অতোগুলো সিগারেট খাওয়া কেন, জামা-কাপড় কি বিশ্রী নোংরা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিলারের মায়ের মুখ ঠিক মায়েদের মতোই, তেমনই কোমল আর মমতাময়ী। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা তাঁর, কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি এখনো যে তাঁর ছেলে জীবনে সাংবাদিক হওয়া ছাড়া আর কিছু চায় না।

সেই সন্ধ্যায় এটা-সেটা বলার পর মা একবার জিজ্ঞেস করলেন যে পিটারের হাতে এখন কোন কাজ, কিছু লিখছে-টিকছে নাকি। সংক্ষেপে তাঁকে ঘটনাটা জানিয়ে পিটার বললো যে এডুয়ার্ড রশম্যানকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে সে। শুনে তো তার মা আঁতকে উঠলেন।

পিটার কিন্তু একমনে ডিনার খেয়েই গেলো, মায়ের যে অতো বকুনি সব যেনো তার মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে গিয়ে মিশলো।

"এমনিতেই তো তুমি ওই চোর-ডাকাতগুলোর কথা লিখতে গিয়ে তাদের সঙ্গে মেশো," মা বলছিলেন, "যতোসব বদসঙ্গ, তার ওপর কি নাৎসিগুলোর মধ্যে গিয়ে না পড়লেই নয়? তোমার বাবা আজ বেঁচে থাকলে কি ভাবতেন, আমি সত্যি সত্যিই বুঝি না..."

মূহুর্তেই তার মাথার মধ্যে কী একটা চিন্তার উদয় হলো।

www.boiRboi.blogspot.com

"মা – "

"উম...বলো?"

"যুদ্ধের সময়ে, জানো...এসএস-রা যা করেছিলো না লোকদের ওপর...মানে ওই ক্যাম্পগুলোতে...আচ্ছা, তখন কি তোমরা জানতে যে ওইরকম কিছু ঘটছে সেখানে?"

ভীষণ ব্যস্ত হয়ে মা টেবিল মুছতে শুরু ক'রে দিলেন। কয়েক সেকেন্ড পরে বললেন, "সাংঘাতিক সব ব্যাপার। উহ্, কী ভয়ংকর! যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ওগুলোর ফিল্ম আমাদের দেখিয়েছিলো। ওসব কথা আমি আর শুনতে চাই না বাবা।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। পেছনে পেছনে পিটার চলে এলে রান্নাঘরে।

"তোমার মনে আছে মা, আমি যখন ষোলো বছরের, সেই ১৯৫০ সালে, স্কুল থেকে আমরা বহু ছাত্র প্যারিসে গিয়েছিলাম?"

মা একটু থেমে, বাসন মাজবার জন্যে আবার সিংকে পানি ভরতে থাকলেন।

"হ্যা, মনে আছে।"

"সেখানে সাকর্ কোয়ের নামে একটা চার্চ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো আমাদের। যখন পৌছলাম তখন একটা মেমোরিয়াল সার্ভিস মাত্র শেষ হলো, জ্যঁ মুল্যাঁ নামে একজন লোকের স্মৃতিতে। ততোক্ষণে কিছু লোক বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো, তাদের কানে গেলো যে আমি আরেকটা ছেলের সঙ্গে জার্মানে কথা বলছি। শোনা মাত্রই একজন এসে আমার গায়ে থুতু ছিটিয়ে দিলো। এখনো আমার মনে আছে সেই থুতু আমার জ্যাকেটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিলো। ফিরে এসে তোমাকে বলেছিলাম। তোমার মনে আছে তুমি তখন কি বলেছিলে?"

মিসেস মিলার ডিনার-প্লেটগুলো খুব জোরে জোরে ঘষতে লাগলেন।

"তুমি বলেছিলে যে ফরাসিরা অমনই হয়। খুব নোংরা সব অভ্যেস ওদের।"

"হ্যা, তাই তো। ওদের আমি দেখতে পারি না।"

"কিন্তু জানো, মা, জ্যঁ মুল্যাঁ মরে যাওয়ার আগে আমরা তার ওপর কী করেছিলাম? তুমি নও। বাবা নয়, আমিও নই। তবে আমরা, জার্মানরা, সত্যি বলতে কি, আসলে শুধু গেস্টাপো বাহিনী। কোটি কোটি বিদেশীর চোখে ও দুটো একই জিনিস।"

"ওই সব কাহিনী আমাকে শোনাতে হবে না। এখন ওসব কথা রাখো।"

"তোমাকে ওসব কাহিনী শোনাতে চাইলেও আমি শোনাতে পারবো না। কারণ আমি নিজেই জানি না। অবশ্য কোথাও না কোথাও ওসব কাহিনী নিশ্চয়ই লিখে রাখা আছে। তবে কথাটা কি জানো, আমার গায়ে থুতু ছিটিয়েছিলো আমি গেস্টাপো ব'লে নয়, আমি জার্মান ব'লে।"

www.boiRboi.blogspot.com

" জার্মান বলে তো তোমার গর্ব হওয়াই উচিত।"

"নিশ্চয়ই, আমি গর্বিতও। কিন্তু তার মনে তো এই নয় যে নাৎসি বা এসএস বা গেস্টাপোদের নিয়েও গর্ব করতে হবে।"

"না, তা কে বলেছে! তবে তাদের নিয়ে দিনরাত ভ্যাজর ভ্যাজর করলেই তো আর তারা ভালো হয়ে যাচ্ছে না!"

রেগে গেছে মা। পিটার তর্ক করলেই এমন হয়। তোয়ালে দিয়ে হাত দুটো মুছে হুট ক'রে চলে গেলেন বসার ঘরে। পিটারও এলো পিছু পিছু।

"মা, তুমি বুঝছো না, ডায়রিটা না পড়া পর্যন্ত আমরা কোন দোষে দোষী তা জানারও আমার কোন কৌতুহল হয়নি। কিন্তু এখন যেনো বুঝতে পারছি। সেইজন্যেই তো লোকটাকে, ঐ পাষণ্ডটাকে খুঁজে বের করতে চাই। ওর অপরাধের বিচার হওয়া তো উচিত।"

সোফার ওপর ব'সে রইলেন তিনি, দু চোখভরা অশ্রু।

"পিটারকিন, ছেড়ে দে বাবা ওসব মতলব। অতীতকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস না, কোন লাভ হয় না তাতে। ওগুলো তো কবেই চুকেবুকে গেছে, আবার কেন? ভুলে যা।"

পিটার মিলারের চোখ গিয়ে পড়লো ম্যান্টলপিসের ওপরে রাখা তার বাবার ছবিটার দিকে। আর্মি ক্যাপ্টেনের পোশাক পরে আছেন বাবা, চোখ তেমনি স্নেহময় কিন্তু ঈষৎ বিষণ্ন দৃষ্টি। শেষবার যখন ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন, তখনকার তোলা ছবি।

বাবার কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে তার। পাঁচ বছরের পিটারকে হাত ধরে ধরে হ্যাগেনবেক চিড়িয়াখানা দেখিয়েছিলেন, কতো রকমের জন্তু-জানোয়ার সেখানে, আজও মনে পড়ে।

আর্মিতে নাম লিখিয়ে এসেছিলেন যেদিন – ১৯৪০ সাল সেটা – বাড়িতে মায়ের সে কি কান্না। পিটারও ভেবেছিলো তখন, সামরিক পোশাকপরা বাবা, কী সুন্দর ব্যাপার...অথচ – ? মেয়েমানুষ কতো বোকার মতো কাঁদে!

১৯৪৪-এর সেদিনটার কথাও মনে আছে তার, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো একজন আর্মি অফিসার, বললো যে তাঁর সমরনায়ক স্বামী পূর্ব-রণাঙ্গনে নিহত হয়েছেন।

"তাছাড়া," মা আবারো বললে, "ওইসব পুরনো জঘন্য কাজ এখন আর কেউ প্রকাশ করতে চায় না। এই যে বিচারগুলো, কতোরকম বীভৎস কাহিনী তাতে বাইরে এসে পড়লো, কেউ কি তা নিয়ে আনন্দিত হয়? তুমি যদি ওদের খুঁজে বেরও করো, তাহলেও কেউ তোমাকে ধন্যবাদ দেবে না, বরং তোমার দিকে আঙুল দিয়ে দিয়েই দেখাবে। মানে, এইসব বিচার-টিচার এখন আর কেউ চায় না। এতোদিন

www.boiRboi.blogspot.com

হয়ে গেলো, ক'দিন বা মানুষ ওগুলো মনে রাখতে চাইবে। ছেড়ে দে, অন্তত আমার মুখ চেয়ে ছেড়ে দে।"

পিটারের মনে পড়লো খবরের কাগজে কালো বর্ডার দেয়া সেই খবরটির কথা। প্রতিদিনের মতো অতোখানিই লম্বা ছিলো, তবু অক্টোবরের সেদিনেরটা কতো ভিন্ন, কারণ প্রায় মাঝখানেই ছাপানো ছিলো:

"ফ্যুয়েরার এবং পিতৃভূমির জন্যে জীবন দিয়েছেন : ১১ই অক্টোবর তারিখে অস্টল্যান্ডে – মিলার, এরউইন, ক্যাপ্টেন।"

অতোটুকুই, আর কিছু না। কোথায়, কেন, কখন – কিছুই না। পূর্বাঞ্চল থেকে প্রাপ্ত দশ-বিশ হাজার নামের মধ্যে শুধু একটি নাম।

মা বলছিলেন, "তোর বাবার কথাটাও একবার ভেবে দেখ। তিনি বেঁচে থাকলে কি চাইতেন যে তাঁর ছেলে আরেকটা যুদ্ধ-অপরাধীর বিচার আদালতে টেনে আনবে? তিনি কি কখনো সে কাজে অনুমোদন দিতেন?"

মিলার ঘরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলো। মায়ের কথা শুনে চট ক'রে ঘুরে দাঁড়ালো। কাছে এগিয়ে এসে মায়ের দু কাঁধে দু'হাত রেখে তাঁর ভীতসন্ত্রস্ত টলটলে দুই নীল চোখের মধ্যে চোখ রেখে বললো, "হ্যা, মুট্টি। তিনি বেঁচে থাকলে এটাই চাইতেন।"

মায়ের কপালে আলতো ক'রে চুমু খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো সে। গাড়িতে উঠে ব'সে দ্রুত গতি তুলে চললো হাম্বুর্গের দিকে। মনের রাগ মনের ভেতরেই টগবগিয়ে ফুটতে থাকলো।

হ্যান্স হফম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় যাদের ছিলো বা যাদের ছিলোও না, তারা সবাই স্বীকার করে যে হফম্যান হলো সফল পত্রিকা-সম্পাদকের নিখুঁত এক চরিত্র। চল্লিশোর্ধ বয়স, কিশোরের মতো চঞ্চল্য, পাকধরা চুলেও আধুনিক ছাঁট, ম্যানিকিউর করা নখ। গায়ের সুটটা সেভিল-রো থেকে বানানো, ভারি রেশমী টাই'টা পিয়েরে কার্দিনের। তাকে ঘিরে আছে যেনো সচ্ছলতার সমুদ্র।

অবশ্য শুধু চেহারা দিয়েই হফম্যান আজ পশ্চিম জার্মানির মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও সবচাইতে সফল পত্রিকা-সম্পাদক হয়নি, হওয়াও যায় না। যুদ্ধের পর শুরু করেছিলো হাতে চালানো মেশিন দিয়ে, ছাপাতো শুধু ব্রিটিশ-অধিকারী কর্তৃপক্ষের নানা রকম হ্যান্ডবিল। ১৯৪৯-এ তার প্রথম সাপ্তাহিক সচিত্র প্রত্রিকা বের হয়। তার নীতি খুব সহজ – ভাষা দিয়ে দিয়ে এমন কাহিনী বানাও যে লোকে যেনো আঁতকে ওঠে, তার সঙ্গে দাও তেমনি সব ছবি যাতে অন্যান্য পত্রিকার ছবিগুলোকে মনে হবে নেহাতই পানসে। কাজ হলো। আটটা পত্রিকার মালিক এখন সে নিজে, কিশোরদের জন্যে প্রেমের গল্প থেকে শুরু ক'রে ঝক্‌ঝকে পৃষ্ঠায় ধনী যৌনাচারীদের

অভিসার কাহিনী। ফলে হফম্যান এখন কোটিপতি। তবু তার নিজস্ব সংবাদ-পত্রিকা *কমেট*-ই এখনো তার প্রিয়পাত্র, যেনো বাড়ির আদরের ছোট ছেলে।

সেদিন বুধবার বিকেলে, সলোমন টউবেরের ডায়রির ভূমিকা পড়ে নিয়ে সেটা বন্ধ করলো হফম্যান। তারপর চেয়ারে পিঠ এলিয়ে আরাম ক'রে ব'সে তাকালো মিলারের দিকে।

"আচ্ছা, বাকিটকু ধারণা ক'রে নিতে পারছি। তা তুমি কি চাও?"

"আমার তো মনে হচ্ছে দলিল হিসাবে এটা সাংঘাতিক," মিলার বললো, "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ডায়রিতে একটা লোকের বর্ণনা আছে, নাম এডুয়ার্ড রশম্যান। লোকটা রিগার শিবিরে এসএস ক্যাপ্টেন ছিলো, ৮০,০০০ নরনারী-শিশুকে নির্দ্বিধায় হত্যা করেছে। আমার বিশ্বাস সে এখনো বেঁচে আছে এবং পশ্চিম জার্মানিতেই রয়েছে। তাকে আমি খুঁজে বের করতে চাই।"

"কি ক'রে জানলে যে সে বেঁচে আছে?"

মিলার তাকে সংক্ষেপে সব বললো, হফম্যান সব শুনে ঠোঁট কুঁচকে ব'লে উঠলো, "প্রমাণটা খুবই দূর্বল।"

"হ্যা, তবু আরো একটু দেখতে ক্ষতি কি? আমি তো এর আগে কতো কাহিনী এনে দিয়েছি আপনাকে, গোড়াতে সেগুলোতে তো প্রমাণ ছিলো আরো অনেক কম।"

হফম্যান হাসলো। "তা সত্যি, এইসব ব্যাপারে মিলারের রীতিমতো প্রতিভা আছে বলতে হয়, সমাজ-সংসার শিউরে ওঠে যেসব সত্য কাহিনী প'ড়ে সেগুলো খুঁজে বের করতে মিলার প্রায় অদ্বিতীয়। হফম্যান সেগুলো প্রকাশও করেছে বিনা বাধাঁয়, কারণ, যাচাই ক'রে দেখেছিলো যে সব সত্যি কথা। সেই কারণেই তো তার পত্রিকার প্রচার এতো বেড়ে গেছে।

"তাহলে এই যে লোকটা, কি যেনো নাম বললে – রশম্যান? তার নাম নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় আছে। আর পুলিশ যদি তাকে খুঁজে না পেয়ে থাকে, তুমি কি ক'রে পাবে?"

"পুলিশ কি সত্যি সত্যিই তাকে খুঁজছে," মিলার জানতে চাইলো।

হফম্যান কাঁধ ঝাঁকালো। "খোঁজারই তো কথা, সেইজন্যেই তো আমরা ট্যাক্স দিয়ে থাকি।"

"তবুও যদি একটু সাহায্য করি মন্দ কি? খুঁজে বের করবার চেষ্টা করবো লোকটা বেঁচে আছে কিনা, আগে কোনদিন ধরা-টরা পড়েছিলো কিনা, পড়লে কি হয়েছিলো সেসব?"

"বুঝলাম, তা আমার কাছ থেকে কি চাও?" হফম্যান প্রশ্ন করলো।

"চেষ্টাটা করার জন্যে আপনার কাছ থেকে একটা অনুমতি। শেষপর্যন্ত যদি

www.boiRboi.blogspot.com

কিছু না পাওয়া যায়, ছেড়ে দেবো।"

হফম্যান চেয়ারসহ ঘুরলো। জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখলো বিশ তলা নিচে, অন্তত মাইলখানেক দূরে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে শুধু জাহাজঘাট। মাইলের পর মাইল শুধু ক্রেন আর ক্রেন, আর নোঙর-করা পোত।

"এই ব্যাপারটা তো তোমার লাইনে পড়ে না, মিলার। হঠাৎ এতো উৎসাহ কেন!"

মিলার ভাবতে থাকলো কী বলা যায়। প্রকাশক বা সম্পাদককে পটানোই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিককে তো আবার কাহিনী বেঁচেই খেতে হয়, প্রথমে হয় প্রকাশকের কাছে, নইলে সম্পাদকের দুয়ারে। পাঠকসমাজ আসে তার অনেক পরে।

"কাহিনীটায় মানবিক দিক যথেষ্ট রয়েছে। তাছাড়া দেশের পুলিশ বিভাগ যেখানে নাজেহাল সেখানে *কমেট* যদি তাদের ঈপ্সিত ব্যক্তিটিকে খুঁজে বের করতে পারে তো সে কাহিনী মাঠে মারা যাবে কিভাবে! লোকে তো দরুণ আগ্রহে লুফে নেবে।"

ডিসেম্বরের ধোঁয়াটে আকাশের দিকে চেয়ে রইলো হফম্যান। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললো, "উহু, যা ভাবছো তা নয়। সেইজন্যেই তো তোমাকে আমি এই কাজের ভার দিচ্ছি না। লোকে এই জিনিস মোটেই শুনতে চাইবে না।"

"কিন্তু, হের হফম্যান, তা কেন হবে? রশম্যান যাদের মেরেছিলো তারা তো পোল বা রাশিয়ান নয়, তারা জার্মান। ইহুদি বটে, তবে জার্মান। তাহলে লোকে কেন শুনতে চাইবে না?"

জানালার দিক থেকে চেয়ারসহ ঘুরে আবার টেবিলের সম্মুখে ফিরলো হফম্যান। ডেস্কে কনুইয়ের ভর দিয়ে গালের দু'পাশে হাত রাখলো।

"তুমি ভালো রিপোর্টার, মিলার। তোমার সংবাদ আহরণ করার পদ্ধতি আমার বেশ ভালো লাগে। তোমার লেখার ধরনটাও চমৎকার। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো তুমি নিজে খবর-সন্ধানী, শিকারীর মতোই তোমার শ্যেন দৃষ্টি। টেলিফোন তুললেই আমি এই শহরে যে কোন মুহূর্তে পঞ্চাশ থেকে একশোজন সাংবাদিককে পেয়ে যেতে পারি, তাদের যা বলবো তারা তাই করবে, যে কাহিনীর পেছনে ছোটাবো সেগুলোই খুঁটে খুঁটে সংগ্রহ ক'রে আনবে। কিন্তু তারা কেউই তোমার মতো নিজের থেকে কোন কাহিনীকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে পারে না। শুধু সেই কারণেই তুমি আমার কাছ থেকে প্রচুর কাজ পেয়ে থাকো ভবিষ্যতে আরো পাবে। কিন্তু এইটা না।"

"কেন, এটা তো বেশ ভালো কাহিনী?"

www.boiRboi.blogspot.com

"শোনো মিলার, তোমার এখন বয়স কম, সাংবাদিকতা সম্বন্ধে দু'চারটা কথা শুনে রাখো। সাংবাদিকতার একটা পিঠ হলো ভালোভাবে ভালো কাহিনী লেখা, আর দ্বিতীয় পিঠ হলো সেগুলো বিক্রি করা। প্রথমটা তুমি করতে পারো, কিন্তু দ্বিতীয়টা আমি। সেইজন্যেই আজ আমি এখানে ব'সে আছি, আর ওইখানে তুমি। তুমি বললে যে এই কাহিনী সবাই পড়তে চাইবে, কারণ রিগাতে যারা মরেছিলো তারা জার্মান ইহুদি। কিন্তু আমি বলছি, শুনে রাখো তুমি, শুধুমাত্র সেই কারণেই কেউ তোমার এই কাহিনী পড়বে না। কোনদিন পড়তে চাইবেও না। যদি না তুমি আইন পাস ক'রে বাধ্য করো যে অমুক পত্রিকার অমুক সংখ্যা তোমাদের পড়তেই হবে কেননা তাতেই আছে তোমাদের মঙ্গল। যতো দিন সেরকম কোন নিয়ম না হচ্ছে ততো দিন লোকে তাদের রুচি মাফিক পত্রিকাই পড়বে এবং সেরকম পত্রিকাই বিক্রি হবে। কাজেই আমি ওদের শুধু সেটুকুই দেই যেটুকু ওরা পড়তে চায়।"

"কিন্তু রশম্যানের কাহিনী পড়তে চাইবে না কেন...কারণ কি?"

"ও, বোঝোনি দেখছি। আচ্ছা, খোলাসা ক'রে বলছি। যুদ্ধের আগে জার্মানিতে প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ইহুদিকে চিনতো। আসলে, হিটলারের অভ্যুত্থানের আগে জার্মানিতে মোটেই ইহুদি-বিদ্বেষ ছিলো না। ইউরোপের যেকোন দেশের চাইতে ইহুদি সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আমরা জার্মানরাই সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করতাম। পোল্যান্ড বা রাশিয়ার চেয়ে তো বটেই, এমন কি ফ্রান্স বা স্পেনের চাইতেও। তারপর হিটলার শুরু করলো সেই খেলা। জনগনকে বলতে লাগলো সবকিছুর মূলে আছে ইহুদিরা, তা সে প্রথম মহাযুদ্ধই হোক বা দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বই হোক – যা কিছু খারাপ সবার মূলে ওই ইহুদি, লোকে বুঝতে পারে না কোন কথাটা বিশ্বাস করবে। সবাই ভাবে আমি যে ইহুদিকে চিনি, সে তো ভালো লোক, অন্তত ভালো না হলেও ক্ষতিকারক তো নয়। অথচ হিটলার বলছে – তাহলে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য? তারপর যখন ভ্যানগুলো এসে ওদের নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো, লোকে কোন প্রতিবাদ করলো না, চুপচাপ এড়িয়েই থাকলো। ততো দিনে বোধহয় যার গলা যতো উঁচু, সে ততো খাটি এই নীতি শুরু হয়ে গেছে, লোকে বিশ্বাস না করলেও তাদের অবিশ্বাস ভেঙে গেছে। কারণ আমাদের জার্মানদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যই যে এই রকম। আমরা খুব বাধ্য। এটা অবশ্য যেমন আমাদের পক্ষে লাভজনক, আবার ক্ষতিকারকও তেমনি। এরই জোরে তো আমরা অর্থনৈতিক বিষয় সৃষ্টি করতে পেরেছি যখন বৃটিশদের মতো জাত শুধু দেশময় ধর্মঘট ক'রে বেড়াচ্ছে। আবার এরই জন্যে আমরা নির্বিবাদে হিটলারের পেছনে পেছনে বিশাল গোরস্থানে গিয়ে পৌঁছেছি। বহুদিন লোকে জিজ্ঞাসাই করেনি যে, তাদের চেনা ইহুদিদের ভাগ্যে কী ঘটেছিলো। তারা শুধু অদৃশ্য হয়ে গেলো – ব্যস, আর কিছুই না। যুদ্ধ-অপরাধের বিচারকাহিনীগুলো অজানা, কোথায় কোন ওয়ারস, লুবলিন,

www.boiRboi.blogspot.com

বিয়ালিস্তক বা পোল্যান্ড বা রাশিয়ার নামহীন গোত্রহীন ইহুদি। আর তুমি এখন তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাও যে তাদের পাশের বাড়ির ইহুদিটার কী হয়েছিলো? এখন বুঝতে পারছো তুমি? এই ইহুদিগুলো – " ডায়রিটার ওপর টোকা মেরে হফম্যান বললো, "তাদের চেনা, তাদের বিশেষ পরিচিত, রাস্তায় দেখা হলেই হ্যালো বলতো, তাদের দোকান-টোকান তো এরাই কিনে নিয়েছে, অথচ হের রশম্যান যখন ওদের শায়েস্তা করবার জন্যে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেলো তখন তারা নির্বিকার হয়ে রাস্তা থেকে দেখেছিলো। ভাবছো যে এই কাহিনী কেউ পড়বে? জার্মানিতে অন্তত না।"

কথা বলা শেষ ক'রে হ্যান্স হফম্যান চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। ডেস্কের ওপরে রাখা কৌটা থেকে বেছে একটা ছোট চুরুট বের ক'রে নিয়ে সোনার লাইটার দিয়ে জ্বালালো। মিলার চুপচাপ ব'সে ব'সে হফম্যানের বক্তৃতাটা হজম করতে করতে ভাবলো এরপর কী করা যায়, উদ্দেশ্য তো পূরণ হলো না।

একটু পরে সে বলে উঠলো, "মাও কি এ কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন?"

হফম্যান ঘোঁৎ ক'রে শব্দ ক'রে উঠলো, "হয়তো।"

"তবুও সেই খচ্চরটাকে আমি খুঁজে বের করবো।"

"মিলার, বাদ দাও। কেউ তোমাকে অভিনন্দনও জানাবে না।"

"আচ্ছা, ওইটাই একমাত্র কারণ নয়, তাই না? ওই যে জনমত-টনমত ওটাই শুধু নয়, আরো একটা কারণ আছো। তাই না?"

চুরুটের ঘন ধূম্রজালের ভেতর দিয়ে চোখ কুঁচকে হফম্যান তাকে দেখে নিলো। তারপর বলে ওঠে, "হ্যা।"

"ভয় পান ওদের এখনো?" মিলার জানতে চাইলো।

মাথা নাড়ে হফম্যান। "না, তা নয়। তবে ঝামেলা-টামেলা হোক, তা আমি চাই না।"

"ঝামেলা মানে...কি হবে কি?"

হফম্যান জিজ্ঞেস করে, "হ্যান্স হেবের নাম শুনেছো?"

"কে, ঔপন্যাসিক হেব? হ্যা...কেন?"

"এক সময় তিনি মিউনিখে একটা পত্রিকা প্রকাশ করতেন, অনেকদিন আগে, পঞ্চাশের প্রায় গোড়ার দিকে। পত্রিকাটা ভালো ছিলো, তিনি নিজেই তো খুব ভালো সাংবাদিক ছিলেন, তোমার মতোই। নাম ছিলো *সপ্তাহের প্রতিধ্বনি*। নাৎসিদের ভীষণ ঘৃণা করতেন তিনি, মিউনিখে এসএস-এর যেসব প্রাক্তন অফিসার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছিলো, তাদের আগেকার কাজকর্ম ফাঁস ক'রে দেবার জন্যে তাঁর পত্রিকায়ধারাবাহিক এক সংবাদকাহিনী শুরু করলেন।"

"তারপর, কি হলো তাঁর?"

www.boiRboi.blogspot.com

"কিছু না...তাঁর নিজের কিচ্ছু হয়নি। একদিন শুধু অনেকগুলো চিঠি এলো ডাকে, অর্ধেকটাই তাঁর বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে, তারা বিজ্ঞাপন তুলে নিচ্ছে। আরেকটা চিঠি এসেছিলো তাঁর ব্যাংক থেকে, অনুরোধ করা হলো তিনি যেনো একবার ব্যাংকে আসেন। ব্যাংকে যেতেই তারা জানিয়ে দিলো যে ঠিক তখনই, সেই মুহূর্ত থেকেই , তাঁর ওভারড্রাফট বন্ধ ক'রে দেয়া হচ্ছে। এক সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকাটা বন্ধ হয়ে গেলো। তিনি এখন উপন্যাস লেখেন, ভালো ভালো উপন্যাস। তবে পত্রিকা আর তিনি চালান না।"

"তাহলে আমাদের কি করতে হবে? ভয়ে গর্তে ঢুকবো?"

হফম্যান একটান দিয়ে মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে নিলো।

"তোমার কাছ থেকে আমি এসব শুনতে চাই না, মিলার," আগুনের ভাঁটার মতো চোখ ক'রে বললো, "এই খচ্চরগুলোকে আমি তখনো ঘৃণা করতাম, এখনো করি। কিন্তু আমার পাঠকদের আমি চিনি। তারা এডুয়ার্ড রশম্যানের কাহিনী শুনতে চাইবে না।"

"বেশ, আমি দুঃখিত, হের হফম্যান। আমি কিন্তু তবুও ছাড়ছি না এই কাহিনী, খুঁজে বের করবোই।"

"দেখো মিলার, তোমাকে আমি যদি না চিনতাম, তাহলে নিশ্চয়ই ভাবতাম যে তোমার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে এর পেছনে। সাংবাদিকতাকে কখনো ব্যক্তিগত বিষয় ক'রে তুলো না, তার ফল খারাপ হয়, রিপোর্টিংয়ের পক্ষে এবং রিপোর্টারের পক্ষেও। সে যাক, এই কাজের খরচ যোগাবে কি ক'রে?"

"আমার কিছু সঞ্চয় আছে।" মিলার উঠে বললো।

টেবিল ঘুরে মিলারের সামনে চলে এলো হফম্যান। "ঠিক আছে, তাহলে তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি...হ্যা, শোনো, রশম্যানকে যদি পশ্চিম জার্মানির পুলিশ কখনো গ্রেপ্তার করে তাহলে আমি তোমাকে সেই সংবাদের কাহিনী লিখতে আমার পত্রিকার পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেবো। কারণ তখন সেটা হবে প্রকাশ্য ব্যাপার, স্রেফ সংবাদ। যদি সেটা নাও ছাপাই তবুও পকেটের পয়সা দিয়ে কিনে নেবো তোমার কাহিনী। কিন্তু যতো দিন তুমি এই ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবে, আমরা পত্রিকার পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিনিধিত্ব তুমি পাবে না।"

"ঠিক আছে," মিলার ঘাড় নাড়লো। "আবার ফিরে আসবো আমি।"

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ৫

সেই বুধবার সকালে, ইস্রায়েলি ইনটেলিজেন্স সংগঠনের সব কটি বিভাগ-প্রধানেরা মিটিংয়ে বসেছিলো। প্রতি সপ্তাহেই তাঁরা একবার ক'রে এরকম বৈঠকে বসেন। ইস্রায়েলের সৌভাগ্য যে অন্য বড় বড় দেশেগুলোর মতন সেখানে কোন বিভাগীয় রেষারেষি নেই; ইনটেলিজেন্স সংগঠনের পাঁচটি বিভাগের মধ্যেই আছে পূর্ণ সহযোগিতার পরিবেশ।

ডিসেম্বরের ৪ তারিখে সেই মিটিংয়ে যোগ দেবার জন্যে কালো লম্বা গাড়ি ক'রে আসছিলেন ইস্রায়েলি ইনটেলিজেন্স সংগঠন বা মোসাদের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মেইর আমিত। সবে ভোর হয়েছে। তেল আভিভের আকাশ থেকে ভোরের প্রথম ছটা এসে শহরের শ্বেতশুভ্র অট্টালিকাগুলোকে আলোকিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু এসব নিসর্গ সৌন্দর্য দেখবার মতো মন তখন ছিলো না জেনারেলের; ভীষণ চিন্তা তাঁর।

চিন্তার কারণ ছিলো এক টুকরো সংবাদ, রাতের শেষ দিকে যা এসে পৌছেছে তাঁর কাছে। ছোট খবর, মোটা নথিতে গিয়ে যুক্ত হবে। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাঁর কায়রোস্থিত প্রতিনিধি প্রেরিত সেই সংবাদ যে নথিতে গিয়ে সংরক্ষিত হবে তার বিষয়বস্তু হলো হেলওয়ানের রকেট।

উর্দিপরা শোফেয়ার গাড়িটাকে জিনা সার্কাসে প্রায় পূর্ণবৃত্তে ঘুরিয়ে নিয়ে রাজধানীর উত্তরাঞ্চলের দিকে চললো। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স্ক জেনারেল নরম গদীতে হেলান দিয়ে মনে মনে ভাবতে থাকলো হেলওয়ান রকেটের কথা, কায়রোর উত্তরে যেগুলো বানানো হচেছ...লম্বা ইতিহাস তার...কতগুলো লোক যে প্রাণ দিলো ওই রকেটের পেছনে...পূর্বসুরী জেনারেল ইয়ার হ্যারেল চাকরিই খোয়াতে বসেছিলেন।

নাসের যখন তাঁর রকেট দুটিকে কায়রো শহরের রাস্তায় লোকচক্ষুর সামনে

প্রদর্শনী ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার অনেক আগেই, ১৯৬১ সালের কোন একসময়, মোসাদ ওগুলোর অস্তিত্ব টের পেয়েছিলো। মিশর থেকে খবর আসা মাত্র ফ্যাক্টরি ৩৩৩-এর ওপর সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখলো তারা।

ওডেসার সহায়তায় মিশরীয়রা যে হেলওয়ান রকেটের ওপর কাজ করবার জন্যে প্রচুর সংখ্যক জার্মান বৈজ্ঞানিক নিয়োগ করছে, সে খবরও তারা জানতো। ব্যাপারটা তখনই বেশ গুরুতর ছিলো, কিন্তু ১৯৬২-র বসন্তে এসে সেটা চরমে উঠলো।

সেই বছরের মে মাসে, বৈজ্ঞানিকদের নিয়োগ করবার বন্দোবস্ত করতো যে জার্মান, সেই হাইনৎস ক্রগ, ভিয়েনাতে গিয়ে অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ড: অটো ইয়কলেকের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সব কথা বলে দিলেন। শুনে তো তেল আভিভ চমৎকৃত। মোসাদের যে প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিলো তার কাছে তিনি জানালেন যে, মিশরিয়রা রকেটগুলোর ওয়ার-হেডে তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক আবর্জনা এবং বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু ভরবার পরিকল্পনা করছে।

খবরটা এতোটাই অপ্রত্যাশিত যে স্বয়ং মোসাদের কনট্রোলার, জেনারেল ইসার হ্যারেল উড়ে এলেন ভিয়েনায়, ইয়কলেকের সঙ্গে কথা বলতে। জেনারেল হ্যারেলই হলেন সেই লোক যিনি অপহৃত অ্যাডলফ আইখম্যানকে নিজস্ব পাহারায় বুয়েনোস আইরেস থেকে তেল আভিভ-এ নিয়ে এসেছিলেন। অধ্যাপাকের সঙ্গে কথা বলে সে নিশ্চিত হলো যে তাঁর খবরটা সত্য। আরো প্রমাণ পাওয়া গেলো: কায়রো সরকার জুরিখের একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে এতো পরিমাণের তেজস্ক্রিয় কোবল্ট কিনেছে যা তাদের চিকিৎসাগত প্রয়োজনের অন্তত পঁচিশগুণ বেশি।

ভিয়েনা থেকে ফিরে ইসার হ্যারেল প্রধামন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়নের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে মিশরে যে-সমস্ত জার্মান বৈজ্ঞানিক কাজ করছেন বা যাঁরা সেখানে যাবার জন্যে প্রস্তুত তাঁদের বিরুদ্ধে যেনো তাঁকে প্রতিশোধ নিতে দেয়া হয়। বৃদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ফাঁপরে পড়লেন। একদিকে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ওইসব জঘন্য ষড়যন্ত্র, আবার অন্যদিকে জার্মানি থেকে ট্যাংক আর বন্দুক আসবার আসন্ন প্রত্যাশা। জার্মানির পথে যদি ইস্রায়েলি প্রতিশোধের পালা শুরু হয়ে যায় তো চ্যান্সেলর অ্যাডেনয়ের তাঁর বিদেশ মন্ত্রণালয় ইস্রায়েল-বিরোধী উপদলের পরামর্শ শুনে অস্ত্র-সরবরাহ বন্ধ ক'রে দিতে হয়তো বাধ্য হবেন।

তেল আভিভের মন্ত্রিসভাতেও অস্ত্র-চুক্তিটি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে, প্রায় বনের মতোই। ইসার হ্যারেল এবং বৈদেশিক মন্ত্রী মাদাম গোল্ডামায়ার জার্মান বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী; ওদিকে শিমন পেরেজ এবং সশস্ত্রবাহিনী আতংকিত, যদি অমূল্য জার্মান ট্যাংকগুলো না পাওয়া যায়। বেন

www.boiRboi.blogspot.com

গুরিয়ন এই দুইয়ের মাঝে দ্বিধান্বিত।

অবশেষে একটা আপোষ করলেন তিনি। হ্যারেলকে বললেন যে, নাসেরকে রকেট বানিয়ে দিতে যাচ্ছে যে জার্মান বৈজ্ঞানিকরা তাদেরকে যেভাবে হোক নিরুৎসাহিত করলে তাঁর কোন আপত্তি নেই। তবে হ্যারেল অন্তর থেকে জার্মানদের ঘৃণা করতেন, কাজেই কার্যক্ষেত্রে তিনি বেন গুরিয়নের আদেশের সীমা ছাড়িয়ে অনেকদুর এগিয়ে গেলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২, হাইনৎস ক্রুগ উধাও হলো। আগের রাত্রেই ভোজ করেছিলো ডঃ ক্লাইন ওয়াখটারের সঙ্গে, রকেট-প্রোপালশন বিশেষজ্ঞ হিসাবে যাঁকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো ক্রুগ। ১১ তারিখ সকালে মিউনিখের শহরতলী অঞ্চলে ক্রুগের বাড়ির কাছেই তার পরিত্যক্ত মোটরগাড়িটি পাওয়া গেলো। তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রী অভিযোগ জানালো যে ইস্রায়েলি চরেরা তার স্বামীকে অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে। কিন্তু মিউনিখের পুলিশ কোন সূত্রই খুঁজে পেলো না; ক্রুগের কোন চিহ্ন নেই, তথাকথিত অপহরণকারীদেরও নয়। আসলে কিন্তু তাকে যারা অপহরণ করেছিলো তাদের নেতা একজন প্রায় অশরীরী একজন – নাম লিও, আর ক্রুগের দেহে ভারি ভারি শেকলের কর্সেট পরিয়ে স্ট্যানবার্গ হ্রদে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

তারপর শুরু হলো যে-সমস্ত জার্মান ইতিমধ্যেই মিশরে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে তাদের ওপর আঘাত হানার অভিযান। ২৭শে নভেম্বর হাম্বুর্গ থেকে পোস্ট করা একটা রেজেস্ট্রি প্যাকেট এলো অধ্যাপক উলফগ্যাঙ্গ পিলৎসের নামে তাঁর কায়রোর ঠিকানায়। প্যাকেটটা তাঁর সেক্রেটারি মিস হ্যানেলার ওয়েন্ডা খুলতে গিয়েই বিরাট বিস্ফোরণে চিরতরের জন্যে পঙ্গু এবং অন্ধ হয়ে গেলো।

নভেম্বরের ২৮ তারিখে আরো একটা পার্শেল এলো ৩৩৩নং ফ্যাক্টরিতে। এটিও হাম্বুর্গ থেকে পাঠানো হয়েছিলো। মিশরিয়রা ততোদিনে সাবধান হয়ে গেছে, সুরক্ষার জাল বসিয়েছে আগত পার্শেলগুলোর ওপর। অতএব, পার্শেলটির ফিতা কাটলো ডাকঘরের জনৈক মিশরিয় কর্মী। ফল পাঁচ জন হত, দশজন আহত হলো। ২৯শে তারিখে অন্য একটা পার্শেলকে বিনা বিস্ফোরণেই ডিফিউজ ক'রে দেয়া গেলো।

১৯৬৩-র ২০শে ফেব্রুয়ারির দিকে, হ্যারেলের অনুচরেরা আবার জার্মানির দিকে দৃষ্টি দিলো। ডঃ ক্লাইনওয়াখটার তখনো মনস্থির করতে পারেননি কায়রোতে যাবেন কি যাবেন না। সুইস সীমান্তের কাছে লোয়েরাখে তাঁর ল্যাবরেটরি থেকে তিনি তাঁর গাড়ি ক'রে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ একটা কালো মার্সিডিজ এসে পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ির মেঝেতে শুয়ে পড়লেন, আর ওদিকে উইন্ডস্ক্রিনের ভেতর দিয়ে অটোমেটিক পিস্তলের সবকটা গুলি এসে ঢুকলো। পুলিশ পরে মার্সিডিজটাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিলো। দেখা গেলো যে

www.boiRboi.blogspot.com

ঘটনার দিন সকালবেলা ওই গাড়িটা চুরি হয়ে গিয়েছিলো। গ্লোভস কম্পার্টমেন্ট হাতরে একটা পরিচয়-পত্রও পাওয়া গেলো, কর্নেল আলি সামিরের নামে। অনুসন্ধান ক'রে অবগত হওয়া গেলো যে কর্নেল আলি সামির হচ্ছেন মিশরিয় সিক্রেট সার্ভিসের প্রধানের নাম। অর্থাৎ ইসার হ্যারেলের অনুচরেরা এবার তাদের বক্তব্য বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, সঙ্গে রেখেও গেছে একটু স্থূল রসিকতা।

ইতিমধ্যে আক্রোশের অভিযান কাহিনীগুলো জার্মানিতে ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছিলো, সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে খবরগুলো ছাপা হচ্ছিলো। বেন গালের ব্যাপার তো রীতিমতো কেলেংকারির সৃষ্টি করলো। মার্চের ২রা তারিখে নাসের-রকেটের পুরোধা ব্যক্তি অধ্যাপক পল গ্যের্কের যুবতী কন্যা হাইতি গ্যের্কে তার ফ্রেইবুর্গের বাড়িতে টেলিফোনে একটা দাওয়াত পেলো। তাকে ফোনে জানানো হলো যে সে যেনো সীমানার ঠিক ওপারেই সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে ত্রিয়াজ হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করে।

জার্মান পুলিশকে জানিয়ে দিলো হাইতি, তারা জানালো সুইসদের। সাক্ষাৎকারের জন্যে যে কামরা ভাড়া করা হয়েছিলো সেখানে তারা গোপনে বাগিং বা আঁড়িপাতার যন্ত্র লাগিয়ে রাখলো। সেই মিটিংয়ে কালো চশমা পরা দু'জন লোক হাইতি এবং তার ছোট ভাইকে শাসিয়ে গেলো যে মিশর থেকে তাদের বাবা যদি না চলে আসেন তো তাঁর প্রাণহানি ঘটবে। চুপিচুপি পিছু ধাওয়া ক'রে সেই রাতেই পুলিশ তাদের জুরিখে গ্রেপ্তার করে। ব্যাসেলে বিচার শুরু হলো ১০ই জুন ১৯৬৩ সালে। আন্তর্জাতিক কেলেংকারির কাহিনী। অনুচর দু'জনের পাণ্ডা ছিলো ইয়োসেফ বেনগাল, ইস্রয়েলের নাগরিক।

বিচার ভালোভাবেই চললো। অধ্যাপক ইয়কলেক সাক্ষ্য দিলেন প্লেগজীবাণু এবং তেজস্ক্রিয় ওয়ারহেডগুলো সম্বন্ধে। বিচারকেরা মর্মাহত হলেন। ইস্রায়েলিরাও চেষ্টার ত্রুটি রাখলো না এই অঘটন থেকে যতোটা সম্ভব মিশরিয়দের হীনতম চক্রান্ত সম্পর্কে ফলাও প্রচার হোক। ফলে অভিযুক্ত দু'জন মুক্তি পেয়ে গেলো।

কিন্তু এই ঘটনায় ইস্রায়েলে ঘটে গেলো অনেক কিছু। জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাডেনয়ের ব্যক্তিগতভাবে বেন গুরিয়নকে কথা দিয়েছিলেন যে তিনি নিজে হেলওয়ান রকেট নির্মাণে জার্মান বৈজ্ঞানিকদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করবেন। কাজেই বেন গুরিয়ন এই বিশ্রী কাণ্ডটার পর ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন: অ্যাডনয়ের কি ভাববেন, ছি ছি! রাগের চোটে তিনি ইসার হ্যারেলকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করলেন; জার্মানির পথেঘাটে অমন প্রকাশ্য গুণ্ডামি কেন, বারণ করা হয়েছিলো না! হ্যারেলও সমান তেজে পদত্যাগপত্র দিয়ে দিলেন। কিন্তু হ্যারেল ভাবতেই পারেননি যে বেন গুরিয়ন সেটা গ্রহণ করবেন। বোধ হয় ওটা গ্রহণ ক'রে

www.boiRboi.blogspot.com

বেন গুরিয়ন প্রমাণ করলেন যে তিনি মুখে যা বলেন, কাজেও তাই করেন অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই শাসনতন্ত্রে অপরিহার্য নয়, এমন কি কনট্রোলার অব ইনটেলিজেন্সও নয়।

সেই রাতে, ১৯৬৩-র ২০শে জুনে, ইসার হ্যারেল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সামরিক ইনটেলিজেন্সের প্রধান, জেনারেল মেইর আমিতের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে কথা বলেছিলেন। আজও সেই আলোচনার কথা জেনারেল আমিতের স্পষ্ট মনে আছে; সেদিন রাশিয়ান – জাত সংগ্রামী পুরুষ, মুখে মুখে যার নাম ছড়িয়ে গিয়েছিলো ইসার-দি-টেরিবল্ বলে, তাঁর মুখকান্তি ক্ষোভে ক্রোধে ভয়ঙ্কর থমথমে হয়ে উঠেছিলো।

"বুঝলে মেইর, আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আজ থেকে ইস্রায়েল আর প্রতিশোধের মধ্যে নেই। রাজনৈতিক নেতারা এখন চুপসে গেছেন। আমি পদত্যাগ করেছি এবং সেটা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি অবশ্য বলেছি যে তোমাকে যেনো এখন আমার পদটা দেয়া হয়; আশা করছি তারা রাজি হবে।"

রাজি তারা হলো। জুনের শেষে, জেনারেল আমিত কনট্রোলার অফ ইনটেলিজেন্সের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

অবশ্য এই ব্যাপারেই বেন গুরিয়নও আর মাত্র কয়েকটা দিন টিকলেন। মন্ত্রিসভার উগ্রপন্থীরা লেভি এশকল এবং তাঁরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী গোল্ডামায়ারের নেতৃত্বে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। ২৬শে জুন ১৯৬৩, লেভি এশকল হলেন প্রধানমন্ত্রী। রাগে দুঃখে তুষারশুভ্র মাথাটা নাড়তে নাড়তে বেন গুরিয়ন চলে গেলেন নেগেভে, তাঁর খামার-বাড়িতে। অবশ্য ইস্রায়েলি সংসদ নেসেতের সদস্যপদে তিনি থাকলেন।

নতুন সরকার কিন্তু ইসার হ্যারেলকে তাঁর পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন না। হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন যে মেইর আমিতের মতো জেনারেল অন্তত গভর্নমেন্টের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে বেশি তর্কাতর্কি করবেন না: কিন্তু হ্যারেল যে ইতিমধ্যেই ইস্রায়েলি জনমানসে রূপকথার নায়ক হয়ে গেছে। তার ওপর তার যা মেজাজ! বেন গুরিয়নের শেষ আদেশও প্রত্যাহৃত হলো না। রকেট-বিজ্ঞানীদের ব্যাপার নিয়ে জার্মানিতে প্রকাশ্য মাস্তানি এখন আর চলবে না। অতএব উপায়ান্তর না দেখে জেনারেল আমিত মিশরের অভ্যন্তরে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আছেন তাঁদের ওপরেই তাঁর বিভীষিকার গোপন অভিযান চালালেন।

ওই বৈজ্ঞানিকরা থাকতেন নীলনদের উত্তর তীরে, কায়রো শহর থেকে সাত মাইল দক্ষিণে মিয়াদি নামের এক উপশহরে। সুন্দর জায়গা, তবে চারদিকে মিশরিয় নিরাপত্তারক্ষীদের বেড়াজালের মধ্যে। জার্মান বাসিন্দাগুলো যেনো সোনার খাঁচায় বন্দী। সেই বেড়াজাল টপকানোর জন্যে আমিত মিশরে তাঁর প্রধান চর

www.boiRboi.blogspot.com

উলফগ্যাঙ্গ লুটজকে লাগিয়ে দিলেন। রাইডিং স্কুলের মালিক হলেন লুটজ। কিন্তু ১৯৬৩-র সেপ্টেম্বর মাস থেকে তিনি এতো বেশি ঝুঁকি নিতে আরম্ভ করলেন যে ষোলো মাস পরে তাতেই তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেলো।

জার্মান বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে জীবন হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। ১৯৬৩-র শরতে জার্মানি থেকে আসতে শুরু করেছিলো একের পর এক বোমার পার্শেল। মিয়াদিতে মিশরিয় নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও তাঁরা কায়রো থেকেই হুমকি দেয়া চিঠিপত্র পেতে আরম্ভ করলেন, যেগুলোতে তাঁদের প্রাণনাশের ভয় দেখানো হোতো।

ড. জোসেফ আইসিগ যে চিঠিটা পেয়েছিলেন তাতে নিখুঁতভাবে তাঁর বউ, ছেলেমেয়ে এবং তাঁর কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো যে তিনি যেনো মিশর ছেড়ে অনতিবিলম্বে জার্মানিতে ফিরে যান। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরাও সবাই ওই ধরনের চিঠি পেলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর একটা চিঠি ড. কিরমেয়ারের মুখের সামনে ফাটলো। সেপ্টেম্বরের শেষে ড: পিলৎস কায়রো ছেড়ে জার্মানি চলে গেলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন হতভাগিনী ফ্রাউলিন ওয়েন্ডাকে।

আরো অনেকেই চলে গেলেন। ক্রুদ্ধ মিশরীয়রা আর তাঁদের আটকাতে পারলেন না, কারণ হুমকি দেয়া চিঠিগুলো আসা তো তাঁরা বন্ধ করতে পারেনি।

১৯৬৪ সালের শীতের সেই উজ্জ্বল সকালে গাড়ির গদিতে গা ডুবিয়ে আরোহীটি ভাবছিলেন যে খবরটা তো এসেছে তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধির কাছ থেকে। লুটজকে তো সবাই ভাবে নাৎসি-দরদী ব'লে; চিঠি এবং পত্র-বোমাগুলো তাঁরই পাঠানো। তবু রকেট পরিকল্পনা তো বাতিল হয়ে যায়নি। যে খবরটা ভোরে এসেছে তাতে তো সে কথাটাই আবার নতুন ক'রে প্রকাশিত হলো। সাঙ্কেতিক অক্ষরযুক্ত খবরটা তিনি আরেকবার নতুন ক'রে পড়লেন। শুধু জানানো হয়েছে যে, কায়রো মেডিক্যাল ইনস্টিটুটের পরীক্ষাগারে সাংঘাতিক জাতের একটা তেজী বিউবোনিক ব্যাসিলাসকে জীবন্ত অবস্থায় পৃথক করা সম্ভব হয়েছে, এবং সেই বিশেষ বিভাগটির ব্যয়বরাদ্দ দশ গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে গত বছরের গ্রীষ্মে ব্যাসেলের বিচারপর্বে মিশরের বিরুদ্ধে ফলাও প্রচার সত্ত্বেও মিশর গণহত্যার এই মারণাস্ত্র বানাতে দৃঢ়সংকল্প।

হফম্যান দেখতে পেলে নিশ্চয়ই মিলারকে তার দুঃসাহসের জন্যে পুরো নম্বর দিতো। ছাদের অফিস-ঘর থেকে লিফটে ক'রে ছ'তলায় নেমে মিলার চলে এলো পত্রিকার আদালতের সংবাদদাতা, ম্যাক্স ডর্নের ঘরে।

চেয়ারে বসতে বসতেই বললো, "হফম্যানের ঘর থেকে আসলাম এইমাত্র,

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু ব্যাক-গ্রাউন্ড দরকার। আপনার মগজে একটু খোঁচা মারি?"

"বলুন," ডর্ন ধরে নিলো *কমেট* পত্রিকার হয়েই বোধহয় কোন কাজে নেমেছে মিলার।

"জার্মানির যুদ্ধ-অপরাধগুলো তদন্ত করে কে?"

চম্‌কে ওঠে ডর্ন। "যুদ্ধ-অপরাধ?"

"হ্যা, যুদ্ধ-অপরাধ। যে সব দেশ আমরা যুদ্ধের সময়ে কব্জা ক'রে নিয়েছিলাম, সে সব জায়গায় কী কী ঘটেছিলো, গণহত্যার জন্যে কোন কোন ব্যক্তি দায়ি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা, এইসব কাজের ভার কার ওপর?"

"ও, বুঝেছি। তা এগুলো হলো গিয়ে পশ্চিম-জার্মানির প্রদেশগুলোর বিভিন্ন অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের কাজ।"

"মানে ওরা সবাই সেই কাজ করে?"

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম ক'রে বসলো ডর্ন। নিজের ক্ষেত্র দেখতে পেয়েছে সে, তাই ভরসা বেড়ে গেলো অনেক।

"পশ্চিম জার্মানিতে ষোলোটা প্রদেশ আছে, তাদের প্রত্যেকেরই রাজধানীতে একজন ক'রে অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরে রয়েছে একটা ক'রে বিভাগ যাদের কাজ 'নাৎসি আমলে হিংসাত্মক অপরাধে'র তদন্ত করা। প্রতিটি প্রাদেশিক রাজধানীর ওপর প্রাক্তন রাইখের কোন অংশ বা অধিকৃত কোন দেশের ভার দেয়া আছে।"

"যেমন?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"যেমন ধরুন স্টুটগার্টের ওপর ভার দেয়া আছে ইতালি, গ্রিস বা পোলিশ গ্যালিসিয়ায় নাৎসি এবং এসএস-রা যে সমস্ত অপরাধ করেছিলো সেগুলোর।"

"বাল্টিক রাজ্যগুলোর ভার কার ওপর?"

"হাম্বুর্গ!" একটুও দেরি হয় না ডর্নের, "তিনটি বাল্টিক রাজ্য, ড্যানজিগ এবং পোল্যান্ডের ওয়ারেশ অঞ্চলের ভার হাম্বুর্গের ওপর।"

"হাম্বুর্গ!" মিলার যেনো আকাশ থেকে পড়লো, "মানে বলতে চান, এইখানে, এই হাম্বুর্গে?"

"হ্যা। কেন?"

"আমি...মানে, আমার দরকার রিগা।"

ডর্ন মুখ বেঁকিয়ে ফেললো।

"ও! জার্মান-ইহুদি? তা এইখানেই, এখানকার অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসেই পাবেন।"

"তাহলে রিগাতে যুদ্ধ অপরাধের জন্যে যদি কারো বিচার হয়ে থাকে বা কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, সে সব এখানেই, মানে হাম্বুর্গেই হয়েছে।"

"বিচার এখানেই হবে," ডর্ন বললো, "গ্রেপ্তার যে কোন জায়গায় হতে

পারে।"

"গ্রেপ্তার করার পদ্ধতি কি?"

"হু! ফেরারী তালিকার একটা বই আছে, যেটাতে প্রত্যেকের নাম বর্ণানুক্রমে সাজানো রয়েছে। সাধারণত বছরের পর বছর ধরে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে কেস তৈরি করা হয় গ্রেপ্তারের জন্যে। তৈরি হলে পরে লোকটা যে প্রদেশে বাস করছে সেখানকার পুলিশকে অনুরোধ জানানো হয় তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে। দু'একজন গোয়েন্দাও পাঠানো হয়, তারা গিয়ে লোকটাকে ধরে নিয়ে আসে কিন্তু মুশকিল হলো বেশির ভাগ এসএস-এর লোকেরাই ছদ্মনামে আছে।"

"বুঝেছি," মিলার বললো, "আচ্ছা, রিগাতে অপরাধ করবার জন্যে কি হাম্বুর্গে কারো বিচার হয়েছে?"

"মনে করতে পারছি না," ডর্ন বললো।

"লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে?"

"হ্যা! ১৯৫০ থেকে আমরা কাটিং রাখতে শুরু করেছি, তার মধ্যে হলে পাওয়া যাবে।"

"দেখতে পারি?" মিলার বললো।

"নিশ্চয়ই।"

লাইব্রেরি-ঘরটি আন্ডারগ্রাউন্ডে। ওরা যেতেই প্রধান গ্রন্থাগারিক তাদের দিকে এগিয়ে এলো।

ডর্ন জিজ্ঞেস করলো মিলারকে, "কি চান আপনি?"

"রশম্যান, এডুয়ার্ড," মিলার বললো।

"পার্শোন্যাল ইনডেক্স সেকশন ওদিকে, আমার সাথে আসুন," লাইব্রেরিয়ান তাদের নিয়ে গেলো।

বর্ণক্রমে সাজানো কার্ডগুলো দেখে মিলার বললো, "আচ্ছা, যুদ্ধ-অপরাধের ওপর কিছু আছে?"

"হ্যা," লাইব্রেরিয়ান জানালো, "যুদ্ধ-অপরাধ এবং যুদ্ধ-বিচার। আসুন, এদিকটায় আছে।"

সারি সারি আলমারির পাশ দিয়ে আরো একশ' গজ গেলো তারা।

মিলার বললো, "রিগার নিচে দেখুন।"

মই বেয়ে উঠে গেলো গ্রন্থাগারিক। কিছুক্ষণ পরেই নেমে এলো লাল মলাট দেয়া একটা খাতা নিয়ে যার ওপরে লেবেল লাগানো, 'রিগা—যুদ্ধ-অপরাধের বিচার'। মিলার সেটা খুলতেই খবরের কাগজের দুটো ছোট্ট টুকরো নিচে পড়ে গেলো। সেটা তুলে নিয়ে মিলার পড়ে দেখলো যে দুটো বিচারপর্বই ১৯৫০-এ সমাপ্ত হয়ে গেছে। একটাতে তিন জন এসএস জওয়ানের বিচার, ১৯৪১ থেকে

www.boiRboi.blogspot.com

১৯৪৪-এর মধ্যে রিগাতে অনুষ্ঠিত বর্বরতার জন্যে। আরেকটিতে ওই তিনজনের বিরুদ্ধেই দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ। ১৯৬৩-র শেষদিকে অবশ্য ছাড়া পেয়ে গেছে তারা, কী আর এমন দীর্ঘমেয়াদী!

"ব্যস?" মিলার বললো।

"হ্যা, আর কিছু নেই," লাইব্রেরিয়ান জানালো।

ডর্নের দিকে ফিরে মিলার বললো, "মানে, বলতে চান যে স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস পনেরো বছর ধ'রে আমার ট্যাক্সের টাকা খেয়ে খেয়ে শুধু এটুকুই কাজ করেছে?"

প্রশাসনিক কায়দায় গম্ভীর হয়ে ডর্ন বললো, "যথাসাধ্য করেছে তারা।"

"সন্দেহ হচ্ছে।" মিলার বললো।

দুটো তলা ওপরে উঠে বিদায় নিয়ে মিলার বেড়িয়ে পড়লো। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তবু তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ৬

হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের বিভাগীয় প্রধানের দেখা পেতেই সাত দিন লেগে গেলো। মিলারের সন্দেহ হলো যে ডর্ন বোধহয় টের পেয়ে গেছে সে হফম্যানের হয়ে কাজ করছে না, তাই এদের জানিয়ে দিয়েছে।

বিভাগীয় প্রধানকে দেখালো কেমন যেনো অস্বচ্ছন্দ, পালাই-পালাই ভাব।

"দেখুন," শুরু করলেন তিনি, "আপনার সঙ্গে আমি দেখা করছি কেবল আপনি জেদ ধরেছিলেন তাই –"

"ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ মিস্টার," মিলারের কণ্ঠস্বরে কিন্তু একটুও কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠলো না। "আমি এমন একজন লোকের খোঁজ করছি যার সম্বন্ধে আমার ধারণা, আপনাদের কাছ থেকে অনুসন্ধান হয়তো হয়েছে, লোকটির নাম এডুয়ার্ড রশম্যান।"

"রশম্যান?" উকিল ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

"হ্যা, রশম্যান," মিলার বললো, "১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত রিগা শিবিরে এসএস কম্যানড্যান্টের ক্যাপ্টেন। আমি জানতে চাই, সে বেঁচে আছে কিনা। না থাকলে কোথায় তাকে কবর দেয়া হয়েছিলো। আপনারা তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা, কোনদিন সে গ্রেপ্তার হয়েছিলো কি, বা বিচার হয়েছিলো তার? না হলে, এখন সে কোথায় আছে?"

ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন তিনি। বললেন, "ওরে বাবা, এসব আমি কী ক'রে বলবো?"

"কেন বলবেন না? বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণ খুবই আগ্রহী। প্রচণ্ড রকম আগ্রহ।"

ততোক্ষণে উকিলটি তাঁর ভারসাম্য ফিরে পেয়েছে। "না, না কি যে বলেন! হলে আমি জানতাম না! অনবরত লোকে খোঁজ করতে আসতো। আমার যতোদূর

www.boiRboi.blogspot.com

মনে হচ্ছে আপনারটাই প্রথম... মানে কোন সাধারণ মানুষ..."

"আসলে আমি কিন্তু প্রেসের লোক," মিলার জানিয়ে দিলো।

"তা হলেও! এই সব ব্যাপারে জনসাধারণকে যতোটুকু খবর দেয়া যায় তার চেয়ে বেশি আপনাদের দেয়া যায় না।"

"কতোটুকু সেটা?" মিলার জিজ্ঞেসা করলো।

"দেখুন, অনুসন্ধানের বর্তমান অবস্থা কি অর্থাৎ কতোটা এগিয়েছে বা না এগিয়েছে, সেসব খবর দেয়ার এক্তিয়ার আমাদের নেই।"

"অদ্ভুত কথা বলছেন তো!"

"আমাকে অবশ্য জানায়। পুলিশ তো আমাদের রীতিমতো বুলেটিন ধরিয়ে দিয়ে, কত শীগগির গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, তাদের কিরকম প্রত্যাশা, সব জানিয়ে দেয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তার নিশ্চয়ই বলবে যে তাদের খবর অনুযায়ী সন্দেহজনক ব্যাক্তি জীবিত না মৃত। এতে তাদের জনসংযোগ ভালো হয়।"

কর্তাটি মুখে একটু লোক দেখানো হাসি ফুটিয়ে তুললো। "হ্যা, সে হিসাবে আপনারা অবশ্য চমৎকার কাজ করেন। তবে আমাদের এই বিভাগের নিয়ম অনুসারে অনুসন্ধানের অগ্রগতি সম্বন্ধে আমরা একটি কথাও বলতে পারবো না।" হঠাৎ একটা ভালো ওকালতি প্যাঁচ যেনো পেয়ে গেছে, এইরকম ভাবে ব'লে ওঠে, "দেখুন, ফেরারী আসামী একবার যদি জানতে পারে যে আমরা কতোদূর এগিয়েছি তাহলে তো উধাও হয়ে যাবে।"

"হতে পারে," মিলার জবাব দেয়, "কিন্তু নথিপত্রে দেখা যায় যে আপনারা রিগার তিন জন রক্ষীরই শুধু বিচার করেছিলেন। আর সেটাও ১৯৫০-এ, অর্থাৎ বৃটিশরাই হয়তো তাদের বিচারের অপেক্ষায় জেলে রেখে দিয়েছিলো, তারপর আপনাদের বিভাগের কাছে দিয়ে চলে যায়। তাহলে ফেরারী অপরাধীদের উধাও হয়ে যাবার বিশেষ কোন আশংকা আছে কি?"

"অ্যা? এইরকম মন্তব্য করাটা আপনার ঠিক হয়নি।"

"বেশ। আপনাদের অনুসন্ধান না হয় এগিয়েই গেলো। তবু এডুয়ার্ড রশম্যানের তদন্ত আপনারা করছেন কিনা বা বেঁচে থাকলে সে এখন কোথায় আছে, সে খবর দিলে তো আপনাদের অনুসন্ধানের কোন ক্ষতি হবে না।"

"আমি আপনাকে শুধু বলতে পারি যে আমার বিভাগের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সবসময় অনুসন্ধান ক'রে থাকি। তাহলে, হের মিলার, আর আমার কিছু বলার নেই।" বলেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে মিলারও।

যেতে যেতে মিলার টিপ্পনি কাঁটলো, "দেখবেন, বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে আবার দমটম বন্ধ না হয়ে যায়।"

www.boiRboi.blogspot.com

আরো সপ্তাহখানেক লেগে গেলো অনুসন্ধানের পরবর্তী লক্ষ্য স্থির করতে। সেই ক'টা দিন বাড়িতে ব'সে ব'সে মিলার ছয়টা মোটা বই পড়ে শেষ ক'রে ফেললো...পূর্বরণাঙ্গনে যুদ্ধের ইতিহাস, অধিকৃত পূর্ব-অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন ক্যাম্পের কাহিনী, ইত্যাদি। স্থানীয় পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান তাকে একদিন গল্পচ্ছলে জেড কমিশনের নাম বললো।

"ওটা হুডউইগসবুর্গে আছে। একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম আমি। পুরো নাম 'নাৎসি শাসনকালে অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক অপরাধসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যাকরণের জন্যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান'। মস্তবড় নাম, তাই লোকে ছোট ক'রে জার্মানে বলে জেনট্রেল স্টেল। আরো ছোট ক'রে, জেড-কমিশন। ওরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা দেশব্যাপী অথবা কখনো কখনো বিদেশে নাৎসিদের অনুসন্ধান ক'রে বেড়ায়।"

"ধন্যবাদ," উঠতে উঠতে মিলার বললো, "দেখি, ওরা কিছু সাহায্য করতে পারে কিনা।" পরদিন সকালে মিলার তার ব্যাংকে গেলো। বাড়িওলার নামে জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসের ভাড়ার চেক লিখে বাকি টাকা তুলে ফেললো। শুধু অ্যাকাউন্ট খোলা রাখবার জন্যে যেটুকু টাকা রাখার দরকার সেটুকুই রাখলো।

ক্লাবে কাজ যাওয়ার আগে মিলারের কাছ থেকে সিগি পেলো একটা সস্নেহ চুম্বন আর সাদামাটা কয়েকটা কথা, "আমি বাইরে যাচ্ছি সপ্তাখানেকের জন্যে, দেরিও হতে পারে।"

তারপর গ্যারেজ থেকে জাগুয়ারটা বের ক'রে মিলার চললো দক্ষিণে, রাইনল্যান্ডের দিকে।

তুষারপাত সবে শুরু হয়েছে। উত্তর সাগরের দিক থেকে হিমবাতাস আসছে, তীক্ষ্ণ শিষের মতো আওয়াজ তুলে। ব্রেমেনের দক্ষিণে মহাসড়কের ওপর জায়গায় জায়গায় তুষার জ'মে তুষারবৃষ্টি নিম্ন স্যাক্সনির সমতল ভূ-খণ্ডের দিকে চলেছে প্রচণ্ড বেগে।

দু'ঘণ্টাপর থামলো মিলার কফির জন্যে। তারপর আবার চললো উত্তর রাইন ওয়েস্টফ্যালিয়ার ভেতর দিয়ে। বাতাসের তীব্র বেগ সত্ত্বেও গাড়ি চালাতে দারুণ লাগে তার, আবহাওয়া যতোই খারাপ হোক। এক্স কে ১৫০-এস মডেলের গাড়িটার ভেতরে তার মনে হয় সে যেনো একটা ধাবমান বিমানের ককপিটে ব'সে রয়েছে। সামনে জ্বলছে ড্যামবোর্ডের নিষ্প্রভ আলো আর বাইরে শীতের রাতের ঘনীভূত অন্ধকার, হিম-ঠাণ্ডা, হেডলাইটের আলোতে চক্‌চক্ করছে নেমে আসা নরম তুষারকণা, উইন্ডস্ক্রিনে লেগে সেগুলো শূন্যতায় মিলে যাচ্ছে।

একই গতিতেই চললো সে, দ্রুতবেগে। ঘন্টায় প্রায় একশো মাইল। হুস্ হুস্ শব্দে বিশাল লরিগুলোর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললো তার জাগুয়ারটা।

ছ'টা নাগাদ হ্যাম জংশন পেরিয়ে গেলো। অন্ধকারের মধ্যে দূরে দেখা যায়

www.boiRboi.blogspot.com

আলোর ছটা। শিল্পসমৃদ্ধ এই অঞ্চল দেখে সে এখনো অবাক হয়। মাইলের পর মাইল শুধু কারখানা, চিমনি, ফারনেসের ঝলসে ওঠা আগুন আর আলোর মালা। কি অদ্ভুত শিল্পবৈভব! চৌদ্দ বছর আগে যখন স্কুল থেকে যাচ্ছিলো প্যারিসে তখন শুধু ছিলো খাঁ খাঁ পাথর আর রুক্ষ প্রান্তর। গর্ব হয় বৈকি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যে তার দেশের মানুষেরা ভেলকিবাজি ক'রে ফেলেছে।

হেডলাইটের সামনে চ'লে এলো কলোন রিংয়ের বিরাট নিওন বিজ্ঞাপন। সেখান থেকে চললো দক্ষিণ-পূর্ব দিক ধরে। উইসব্যাডেন, ফ্রাংকফুর্ট, ম্যানহাইম, হাইলব্রন একের পর এক চলে গেলো।

অবশেষে এসে পৌছালো স্টুটগার্ট শহরের একটা হোটেলের সামনে। লুডভিগসবুর্গের নিকটতম শহর। গাড়ি থামিয়ে হোটেলে উঠলো রাত কাটাবার জন্যে।

লুডভিগসবুর্গ একটা ছোট্ট নিরিবিলি শান্ত শহর। প্রদেশের রাজধানী স্টুটগার্ট থেকে পনেরো মাইল উত্তরে, উরটেমবার্গের মনোরম ঢালু পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। বড় সড়ক থেকে একটু ভেতরে জেড কমিশনের কর্মীসংখ্যা স্বল্প, বেতনও ভালো না, অথচ কাজ প্রচুর। যুদ্ধের সময় যেসব নাৎসি বা এসএস গণহত্যার অপরাধে অপরাধী তাদের খুঁজে বের করাই এদের কাজ। কাজই শুধু নয়, জীবনের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। স্টাট্যুট অফ লিমিটেশন পাস হয়ে যাওয়ার পর হত্যা এবং গণহত্যা ছাড়া এসএস'দেরও খুঁজে বেড়াতো, যেমন বলপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়, ডাকাতি, দৈহিক পীড়ন ইত্যাদি।

হত্যা-অপরাধে অপরাধীর সংখ্যাও এদের খাতায় ১,৭০,০০০, যাদের এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। অতএব তাদের বর্তমান লক্ষ্য ওই তালিকার ভেতর থেকে অন্ত ত কয়েক হাজার ঘাতককে – যেখানে হোক, যখনই হোক – খুঁজে বের করা।

গ্রেপ্তার করবার ক্ষমতা তদের নেই, কাজেই যখন কাউকে এরা অকাট্যভাবে সনাক্ত ক'রে ফেলে তখন জার্মানির বিভিন্ন প্রদেশের পুলিশের কাছে যেতে হয় অনুরোধের চিঠি নিয়ে। বনের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যৎসামান্য বার্ষিক ভাতা পায় তারা। কিছুই হয় না তাতে, তবু কাজ ক'রে যায়, কারণ এই কাজেই তারা উৎসর্গীকৃত।

কর্মীদের ভেতরে আছে আশি জন গোয়েন্দা এবং পঞ্চাশ জন অনুসন্ধানী অ্যাটর্নি। গোয়েন্দাদের অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকা সম্ভব নয়। উকিলেরা অবশ্য একটু বয়স্ক, তই তাদের সম্বন্ধে পূঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ক'রে তবে নেওয়া হয়েছে যে তারা ১৯৪৫-এর পূর্বে ওইসব ঘটনায় বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহণ করেনি।

উকিলেরা অধিকাংশই এসেছে তাদের নিজস্ব ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে, যেখানে

আবার তারা একদিন ফিরে যাবে। গোয়েন্দারা ভালোভাবেই জানে যে তাদের আর কিচ্ছু হবে না জীবনে। জার্মানির কোন পুলিশ বিভাগে লুডভিগসবুর্গের কোন প্রাক্তন গোয়েন্দাকে চাকরি দেবে না। পশ্চিম জার্মানিতে যে সব পুলিশি গোয়েন্দা এসএস'দের অনুসন্ধান ক'রে বেড়ায় তাদেরও পদোন্নতি চিরদিনের জন্যে বন্ধ।

বহু প্রদেশেই সহযোগিতার আবেদনে কেউ কর্ণপাতও করছে না, ফাইলপত্র ধার দিলে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে, সন্দিগ্ধ ব্যক্তি কারো কাছ থেকে খবর পেয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়, এসব তো জেড-কমিশনের নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা। তবু কর্তব্য হিসাবে কাজ করে যায় এরা, যদিও ভালোভাবেই জানে যে দেশবাসীর সমর্থন নেই।

লুডভিগসবুর্গের মতো হাসিখুশি শহরেও রাস্তায় জেড কমিশনের লোক দেখলে কেউ ডেকে দুটো কথাও বলে না, হ্যালোও জানায় না। বরং তাদের রয়েছে বদনাম।

পিটার মিলার কমিশনের অফিস-বাড়িতে এসে পৌছালো। ৫৮ নং শর্নডরফার স্ট্রস, বিরাট বড় একটা পুরনো বাড়ি, চারদিকে আট ফুট উঁচু দেয়াল। বিশাল দুটো ভারি লোহার গেট। গেটটা বন্ধ থাকায় গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলো না সে। গেটের একটা পাশে ছিলো ঘন্টার হাতল। সেটা ধ'রে টানতেই লোহার পাল্লায় সামান্য ফাঁক হয়ে গিয়ে একটা মুখ বেরিয়ে এলো। নিঃসন্দেহে দারোয়ান।

"বলুন?"

"অনুসন্ধানী উকিলদের কারো সঙ্গে কথা বলতে চাই," মিলার বললো।

"কার সঙ্গে?"

"নামটাম জানি না। যে কোন একজন হলেই হবে," মিলার বললো, "এই যে আমার কার্ড।"

ফোকরের ভেতর দিয়ে কার্ডটা গুঁজে দিলো, যাতে লোকটা বাধ্য হয় সেটা নিতে। অন্তত তাহলে নিশ্চিন্ত যে সেটা দালানের ভেতরে গিয়ে পৌছুবে। ফোকর বন্ধ ক'রে দিয়ে লোকটা চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে গেট খুলে দিলো। পাথরে বাঁধানো পাঁচটা সিঁড়ি বেয়ের মিলার পৌছালো সামনের দরজায়। সেটা বন্ধ, বাইরের হিমবাতাস যাতে ভেতরে না ঢুকতে পারে তার জন্যে। ঘরের মধ্যে সেন্ট্রাল হিটিংয়ের কল্যাণে বন্ধ গরম। ডানদিকের কাঁচ-বসানো বুথ থেকে একজন চাপরাশি বেরিয়ে এসে তাকে ছোট্ট একটা বিশ্রামকক্ষ দেখিয়ে দিলো।

"বসুন এখানে। এক্ষুণি আসছেন একজন।" দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে চলে গেলো।

তিন মিনিট পরে যে এলো পঞ্চাশের কোঠায় তার বয়স, মৃদুভাষী, বেশ ভদ্র। মিলারের কার্ডটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "বলুন, কী করতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারি?"

গোড়া থেকে শুরু করলো মিলার। টউবেরের ঘটনা বললো, ডায়রির কথা, এডুয়ার্ড রশম্যান সম্পর্কে তার নিজের অনুসন্ধান, সব জানালো। উকিলটি বেশ আগ্রহে শুনলো।

শেষ হলে বললো,"চমৎকার।"

"কথা হলো, আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?" তিন সপ্তাহ আগে হাম্বুর্গে যখন রশম্যান সম্বন্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছিলো তারপর এই প্রথম, মিলারের মনে হলো, এমন একজনের দেখা পেয়েছে, যে সত্যি সত্যিই তাকে সাহায্য করতে চায়।

"কিন্তু কি জানেন, আপনার আগ্রহ যদিও আমি আন্তরিক ব'লে মেনে নিচ্ছি, তবুও আমাদের হাত-পা বাঁধা। কতোগুলো আইনকানুন আছে যা আমাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। নইলে আমাদের উঠে যেতে হবে। সুতরাং নির্দিষ্ট কয়েকটি সরকারী দপ্তরের অনুরোধের চিঠি ছাড়া, আমরা কোন ফেরারী এসএস আসামীর সম্পর্কে কোন খোঁজখবর দিতে পারি না।"

"মানে, বলতে চান আমাকে কিছুই বলতে পারবেন না?" মিলার জানতে চাইলো।

"প্লিজ...ব্যাপারটা একটু বুঝে দেখুন," আইনজীবী জানালো, "আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের ওপর সব সময় আক্রমণ চলছে। খোলাখুলি নয় অবশ্য, সেরকম সাহস কেউ করবে না। কিন্তু গোপনে ক্ষমতার ভেতরে চলছে এই লড়াই। আমাদের ওপর সবসময়ই গোয়েন্দাগিরি করা হয়, আমাদের বাজেট, যেটুকু ক্ষমতা আমাদের আছে, আমাদের বিধিগত কার্যক্রম সব সময় তীক্ষ্ণ সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু। আইনকানুন নিয়ে আমরা এতোটুকু এদিক ওদিক করতে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি জার্মানির সাংবাদিক জগতের সহযোগিতা চাই, কিন্তু আইনত তা নিষিদ্ধ।"

"ও!"মিলার বললো, "আচ্ছা, আপনাদের কি কোন সংবাদপত্র কাটিংয়ের রেফারেন্স লাইব্রেরি আছে?"

"না।"

"জার্মানিতে কি কোন সংবাদ-কাটিংয়ের রেফারেন্স লাইব্রেরিই নেই, জনসাধারণের কেউ যেটা দেখতে পারে?"

"না। আমাদের দেশে সংবাদপত্র কাটিং সংগ্রহ ক'রে রেফারেন্স সাজিয়ে রাখে শুধু কতোগুলো পত্রিকা এবং সংবাদপত্রের অফিসে। শুনেছি *ডার স্পিগেল* পত্রিকার সংগ্রহ সবচেয়ে ভালো, তারপর *কমেট* পত্রিকার।"

"অদ্ভুত তো," মিলার বললো, "তাহলে যুদ্ধ-অপরাধের তদন্ত সম্বন্ধে কোন নাগরিক যদি উৎসুক হয় বা ফেরারী এসএস অপরাধীদের পটভূমিকা যদি জানতে

চায়, জার্মানির কোথায় সে খোঁজ করবে?"

লোকটির মুখে যেনো কেমন একটু অপ্রস্তুত ভাব দেখা দিলো। বললো, "সাধারণ নাগরিকের পক্ষে সেরকম কোন সুবিধা নেই।"

"ও!" মিলার বললো, "আচ্ছা, তাহলে এসএস লোকেদের কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে নথিপত্র কোথায় সংরক্ষিত থাকে, জার্মানির কোন্ আর্কাইভে?"

"এখানে কিছু আছে...আন্ডারগ্রাউন্ড কক্ষে," আইনজীবীটি বললো, "তবে সেগুলো সব প্রতিলিপি, ফটোস্ট্যাট করা। এসএস-এর সমগ্র মূল কার্ড ইনডেক্স ১৯৪৫-এ একটি আমেরিকান ইউনিট দখল করেছিলো। বাভারিয়ার যে দুর্গে সেগুলো রাখা ছিলো সেখানে কতোগুলো এসএস কর্মী শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন ক'রে রয়ে গিয়েছিলো, সমস্ত রেকর্ড পুড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলো তারা। আমেরিকান সৈন্যেরা তাড়াতাড়ি এসে পড়ে ওদের বাঁধা দেয়। এক-দশমাংশ নষ্টই হয়ে গিয়েছিলো। জার্মানদের সাহায্য নিয়ে আমেরিকানদের দু'বছর লেগেছিলো সেগুলো সাজিয়ে তুলতে। সেই দু'বছরে বহু জঘন্য এসএস অপরাধী কিছুদিন মিত্র-শক্তির হেফাজতে থেকে পরে ছাড়া পেয়ে যায়, কারণ ওই গণ্ডগোলে ওদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। সাজানো-গোছানো শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ইনডেক্সগুলো বার্লিনেই থেকে যায়, আমেরিকানদের দখলে। আমাদের যদি কিছু দরকার হয়, ওদের কাছে দরখাস্ত ক'রে আনিয়ে নিতে হয়। তবে ওরা এই বিষয়ে খুব ভালো, সব সময় সহযোগিতা পাওয়া যায়।"

"ব্যস্! গোটা দেশে মোটে এই দুটো জায়গায়?"

"হ্যা," উকিলটি বললো, "দেখুন, আবার বলছি, আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি সত্যিই খুশি হতাম। যাক, রশম্যান সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে পারেন আমদের জানালে আনন্দিত হবো।"

মিলার চিন্তা করে নিলো। "আচ্ছা, আমি যদি কিছু পাই তো দুটো অফিস আছে যারা এই বিষয়ে কিছু করতে পারে, আপনারা আর হাম্বুর্গের অ্যাটর্নিজেনারেল অফিস। তাই না?"

"হ্যা।"

"আর হাম্বুর্গের অফিসের চেয়ে আপনাদেরই কিছু করবার সম্ভাবনা বেশি।" মিলার সোজাসুজি বললো, কোনরকম না রাখঢাক না করেই।

"এখানে মূল্যবান কিছু এলে তাতে ধুলো জমতে আমরা দেই না।"

"বুঝলাম," মিলার উঠে বললো। "আচ্ছা, এডুয়ার্ড রশম্যানকে কি আপনারা এখনো খুঁজছেন? গোপনেই বলুন, কথাটা শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যেই থাকবে।"

"আমাদের দু'জনের মধ্যে বলতে গেলে...হ্যা, ভীষণভাবে খুঁজছি।"

"ধরা যদি পড়ে তো সাজা পেতে অসুবিধা নেই তো?"

www.boiRboi.blogspot.com

"একটুও না, তার বিরুদ্ধে শক্ত অভিযোগ রয়েছে। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড নির্ঘাত হবে।"

"বেশ," মিলার বললো, "আপনার ফোন নম্বরটা একটু দিন তো।"

আইনজীবী এক টুকরো কাগজের ওপরে লিখে মিলারকে দিলো। "এই হলো আমার নাম, আর দুটো টেলিফোন নম্বর। বাড়ির এবং অফিসের। সব সময় আমাকে পাবেন, দিনে রাত্রে যখনই হোক, পুলিশের নতুন কিছু লোককে আমি জানি, যাদের বললে কাজ শুরু হয়ে যাবে। আবার কিছু কিছু লোক আছে যাদের এড়িয়ে থাকতে হয়। সুতরাং আমাকেই আগে জানাবেন, কেমন?"

মিলার কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে নিলো।

যেতে যেতে বললো, "মনে থাকবে।"

"বেশ, আপনার সৌভাগ্য কামনা করছি," আইনজীবী জানালো।

স্টুটগার্ট থেকে বার্লিন অনেকটা দূরের পথ। পরের দিনটা প্রায় রাস্তাতেই কাটলো মিলারের। সৌভাগ্যবশত আবহাওয়া ভালো ছিলো, শুকনো খটখটে দিন। অদম্যগতিতে চললো জাগুয়ারটা, মাইলের পর মাইল ধূ-ধূ প্রান্তর। ফ্রাংকফুর্ট, ক্যাসেল, গটিংগেন পেরিয়ে হ্যানোভার পৌছালো। এইখানে এসেই ৪নং মহাসড়ক ছেড়ে ই-৮ ধরলো মিলার, পূর্ব জার্মানির সীমান্তের দিকে।

ম্যারিয়েনবর্ন চেকপয়েন্টে এক ঘণ্টালেগে গেলো। টাকার পরিমান জানিয়ে ফরম পূরণ ক'রে, ট্র্যানজিট ভিসার দরখাস্ত করলো: পশ্চিম বার্লিন পৌছাতে হলে পূর্ব জার্মানির ভেতর দিয়ে ১১০ মাইল যেতে হবে। নীল পোশাক-পরা শুল্ক অফিসার আর সবুজ লোমের টুপি মাথায় পুলিশ তার জাগুয়ারের ওপর-নিচ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো।

সীমান্তের বিশ মাইল ভেতরে চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে এলো এলবের ওপরে বিরাট সেতু। এখানেই, ১৯৪৫ সালে, ইয়াল্টা-চুক্তি অনুসরণ ক'রে বৃটিশবাহিনী তাদের বার্লিন অভিমুখে অভিযান বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো। ডানদিকে তাকিয়ে দেখলো মিলার – বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ম্যাগডেবুর্গের জনবসতি। মনে মনে ভাবলো, পুরনো কারাগারটা কি এখনো আছে কিনা। পশ্চিম বার্লিনে ঢুকতে আবার দেরি হলো। আবার গাড়ি সার্চ করা হলো, ব্যাগ থেকে সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখা হলো চেকপোস্টে। মানিব্যাগ খুলে দেখলো, শ্রমিকদের স্বার্গরাজ্যে দান ক'রে আসেনি তো! সব শেষে হয়ে গেলে আবার জাগুয়ারটা চললো রাস্তা দিয়ে। আবুস সারকিট পেরিয়ে ধেয়ে গেলো আলো-ঝলমল কুরফুরস্টেন্ডামের রূপালী ফিতার মতো চক্‌চকে রাস্তার দিকে। আলো দিয়ে সাজনো, ক্রিস্টমানের সূচনা হিসেবে। ১৭ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যা নামলো।

www.boiRboi.blogspot.com

মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছে আর হুট ক'রে যাওয়া নয়, যেমন গিয়েছিলো হাম্বুর্গে অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরে বা লুডভিগসবুর্গে জেড কমিশনের অফিসে। বেশ বুঝতে পেরেছে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে জার্মানিতে কেউই নাৎসিদের ফাইলের ধারে-কাছেও যেতে পারে না।

পরদিন সকালে বড় ডাকঘর থেকে ব্রান্ডটকে ফোন করলো। ব্রান্ডট তো শুনে অবাক, স্তম্ভিত।

"না না, আমি পারবো না," ফোনের মধ্যেও যেনো চম্‌কে উঠলো সে, "বার্লিনে আমি কাউকে চিনি না।"

মিলার দমবার পাত্র নয়। চিৎকার ক'রে বললো, "ভালো ক'রে ভেবে দেখো। তোমাদের পুলিশের কলেজে পশ্চিম বার্লিনের কারো না কারো সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার দেখা হয়েছে। আমি শুধু চাই, আমি যখন ওখানে যাবো, সে যেনো আমার হয়ে বলে দেয়।"

"তোমাকে তো আমি বলেইছি, আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাই না।"

"জড়িয়ে তো পড়েইছো।" কয়েক সেকেন্ড থেমে মোক্ষম একটা অস্ত্র ছাড়লো মিলার, "হয় আমি সরকারী সূত্রে ওই আর্কাইভে যাবো নইলে বলবো তুমি আমাকে পাঠিয়েছো।"

"না, না, না..."

"না মানে, নিশ্চয়ই বলবো। দেশের এক কোণ থেকে আরেক কোণ আর আমি এমন ধাক্কা খেয়ে বেড়াতে পারবো না। কাজেই খুঁজে দেখো কে আমাকে ওখানে সরকারী সূত্রে পাঠাতে পারে। হ্যা, দেখো, ঘাবড়িয়ে যেয়ো না, ফাইলগুলো দেখা হয়ে গেলে এক ঘন্টার মধ্যে মৌখিক অনুরোধটার কথা আমরা সবাই ভুলে যাবো।"

"ভাবতে হবে আমাকে," ব্রান্ডট বললো। সময় ক্ষেপন করার জন্যে চালাকি করলো।

"এক ঘণ্টাসময় দিচ্ছি," মিলার বললো, "তারপর আবার ফোন করবো।"

এক ঘণ্টাপরেও ব্রান্ডট ঠিক আগের মতোই রেগে ছিলো, তবে ভয় পেয়েছে বোধহয় একটু। আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিলো তার কেন ডায়রিটা নিজের কাছে রেখে নষ্ট ক'রে ফেলেনি।

"দেখো," ফোনের মধ্যে বললো, "একজনকেই চিনি শুধু, আমার সঙ্গে ডিটেকটিভ কলেজে ছিলো। খুব ভালোমতো পরিচয় নেই, পশ্চিম বার্লিন পুলিশ বিভাগের এক নম্বর বিভাগে আছে সে। ওই বিষয় নিয়েই কাজকর্ম।"

"নাম কি?"

"শিলার। ফোকমার শিলার, ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর।"

www.boiRboi.blogspot.com

"আচ্ছা, দেখা করছি ওর সঙ্গে।"

"না, আমার ওপরে ছেড়ে দাও। আমি আজ ওকে ফোন ক'রে তোমার কথা জানাচ্ছি। তারপর তুমি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু রাজি যদি না হয় আমি কিছু করতে পারবো না, বার্লিনে আর কাউকে আমি চিনি না।"

দু'ঘণ্টাপরে মিলার আবার ব্রান্ডটকে ফোন করলো। ব্রান্ডটের গলার স্বর এবার উল্লসিত।

"ও এখন ছুটিতে আছে," বললো, "ক্রিসমাসের ডিউটি পড়েছে ওর, আমাকে বললো। তাই সোমবারের আগে ফিরছে না।"

"আরে, আজ তো মাত্র বুধবার। চারটা দিন আমি কি হাওয়া খাবো নাকি?"

"কি করবো বলো? সোমবার সকালে ও ফিরবে, তখন ফোন করবো।"

চারট দিন পশ্চিম বার্লিনের এদিক-ওদিক ঘুরে মিলার কাটিয়ে দিলো। ভীষণ একঘেয়ে লাগলো তার। অবশ্য ১৯৬৩-র সেই ক্রিসমাসে বার্লিনে খুব হৈ-চৈ: এই প্রথমবার প্রাচীরের অপর পার থেকে পূর্ব জার্মান সরকার পাস ইসু করছে যাতে পশ্চিম বার্লিনের লোকেরা ওপারে গিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে পারে। দুই শহরের আলোচিত ঘটনাই হলো এটা। সপ্তাহের শেষ দিনটায় মিলার হাইন স্ট্রাসের চেকপয়েন্ট পেরিয়ে পূর্বের একটা শহরে গেলো (পশ্চিম জার্মানির নাগরিক হিসাবে তার পাসপোর্টের জোরেই সে ওদিকে যেতে পারে) পূর্ব বর্লিনের রয়টার সংবাদদাতা তার চেনা ছিলো, দেখা করলো তার সঙ্গে। কিন্তু লোকটা তখন প্রাচীর-পারাপারের কাহিনী নিয়ে খুব ব্যস্ত। তাই তার সঙ্গে কফি খেয়ে মিলার পশ্চিমে ফিরে এলো আবার।

সোমবার সকালে গেলো ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ফোকমান শিলারের সঙ্গে দেখা করতে। দেখে ভালো লাগলো লোকটা প্রায় তারই বয়সী, এবং জার্মানির সাধারণ মনোবৃত্তির ছিটেফোঁটাও নেই তার মধ্যে, লাল ফিতা সে মানে না। বেশি ওপরে তাকে উঠতে হচ্ছে না, মিলার ভাবলো, কিন্তু সে যাকগে, সেটা তার সমস্যা। মিলার তো খুশি।

সংক্ষেপে মিলার ওকে বললো যে ও কী চায়। শুনে শিলার বললো, "কেন নয়? অসুবিধা তো দেখছি না। আমেরিকানরা তো আমাদের এক নম্বর বিভাগের সঙ্গে যথেষ্ট সহযোগিতা ক'রে থাকে। প্রায়ই তো ওখানে যাচ্ছি আমরা। উইলি ব্রান্ডট আমাদের ওপর নাৎসি অপরাধের তদন্তের ভার চাপিয়েছে, সেই সূত্রেই যাতায়াত।"

মিলারের জাগুয়ারেই চললো ওরা দু'জন। শহর ছাড়িয়ে চলে এলো উপকণ্ঠে, তারপর বনজঙ্গল, হ্রদ পেরিয়ে, কোন একটা হ্রদের তীরে এসে পৌঁছালো – বার্লিন-৩৭ এলাকার জেলেনডর্ফ শহরতলীতে এক নম্বর, ওয়াসের কাফের স্টিয়েগ।

www.boiRboi.blogspot.com

গাছপালার ভেতরে লম্বা সরু একতলা একটা বিল্ডিং। দেখেই অবিশ্বাসের কণ্ঠে মিলার বললো, "এটা?"

"হ্যাঁ, এটাই," শিলার জানালো, "তবে যা ভাবছেন তা নয়। মাটির নিচে আছে আটটা তলা, সেখানেই আর্কাইভ, অগ্নিনিরোধক ভল্টে।"

সামনের দরজা দিয়ে তারা ঢুকলো। ডানদিকেই দপ্তরীর ঘর। গোয়েন্দাটি এগিয়ে গিয়ে তাকে পুলিশ-কার্ড দেখাতেই লোকটা একটা ফরম বের ক'রে দিলে ওরা দু'জনে একটা টেবিলে গিয়ে ফরম পূরণ করলো । গোয়েন্দা তার নিজের নাম র‍্যাংক সব লিখে প্রশ্ন করলো, "কি যেনো নাম লোকটার?"

"রশম্যান," মিলার বললো, "এডুয়ার্ড রশম্যান।"

ফরম পূরণ ক'রে অফিসের কেরানীটিকে দিয়ে দিলো।

"দশ মিনিট লাগবে," শিলার জানালো। বড় একটা ঘরে এসে ওরা ঢুকলো। সারি সারি টেবিল চেয়ার। প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে আরেকজন কেরানী এসে নিঃশব্দে টেবিলের ওপর একটা ফাইল রাখলো, প্রায় এক ইঞ্চি মোটা, বিষয়ের স্থানটিতে ট্যাগ মারা, 'রশম্যান, এডুয়ার্ড।'

ফোকমার শিলার উঠে দাঁড়ালো।

"কিছু যদি মনে না করেন, আমি তাহলে আসি। এক সপ্তাহের ছুটি কাটিয়ে এসে এখন আর দেরি করা যায় না। যদি কোন কাগজের ফটোস্ট্যাট কপি চান ওই লোকটাকে বলবেন।" আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো অন্যদিকে, ডায়াসের ওপরে ব'সে থাকা একজন কেরানীকে। নিশ্চয়ই লোকটা ওখান থেকে লক্ষ্য রাখে কেউ কোন ফাইল থেকে কাগজ-টাগজ সরাচ্ছে কিনা।

মিলার উঠে হাত মেলালো। "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

"না, না, এটা তেমন কিছু না।"

টেবিলে ব'সে আরো দু-তিনজন লোক তাদের ফাইলগুলোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মিলার তাদের দিকে তাকিয়েও দেখলো না। একমনে প'ড়ে গেলো শুধু এডুয়ার্ড রশম্যানের ওপর লিখিত এসএস-এর নিজস্ব বিবরণ।

সব কিছুই আছে ফাইলে। নাৎসি পার্টি নম্বর, এসএস নম্বর, এই দুটোর জন্যে তার স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত, ডাক্তারি পরীক্ষার ফল, প্রশিক্ষণ শেষে তার শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য, নিজের হাতে লেখা তার নিজের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ, বদলির আদেশ, অফিসার পদে নিয়োগপত্র, পদোন্নতির সার্টিফিকেট, ১৯৪৫'র এপ্রিল পর্যন্ত । দুটো ছবিও ছিলো: একটা পুরো মুখের, আরেকটা পাশ থেকে। তা থেকে দেখা গেলো ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা একটা মানুষ, ছোট ক'রে ছাঁটা চুল, বাম দিকে সোজা সিঁথি, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে গম্ভীর মুখে, লম্বা নাক তার। মিলার পড়তে আরম্ভ করলো...

www.boiRboi.blogspot.com

এডুয়ার্ড রশম্যানের জন্ম ২৫শে আগস্ট, ১৯০৮; অস্ট্রিয়ান শহর গ্রাৎসে: অস্ট্রিয়ার নাগরিক; পিতা বিয়ার কারখানার শ্রমিক, সৎ এবং সম্মানিত। গ্রাৎসেই সে কিন্ডারগার্টেনের জুনিয়র এবং হাইস্কুলের পাঠ শেষ করেছিলো। কলেজে ভর্তি হয়েছিলো উকিল হবার জন্যে কিন্তু ফেল করেছিলো। ১৯৩১ সালে তেইশ বছর বয়সে বাবা যে কারখানায় কাজ করতো সেখানেই চাকরিতে ঢোকে। ১৯৩৭-এ কারখানার থেকে বিয়ার কোম্পানির প্রশাসনিক বিভাগে বদলি হয়। সেই বছরেই অস্ট্রিয়ান নাৎসি পার্টি এবং এসএস-এ যোগ দেয়, দুটোই যখন নিরপেক্ষ অস্ট্রিয়ায় নিষিদ্ধ ব'লে ঘোষিত ছিলো। এক বছর পরে হিটলার অস্ট্রিয়া অধিকার করে অস্ট্রিয়ান নাৎসিদের বিভিন্ন জায়গায় উঁচু উঁচু পদে উন্নীত করেন।

১৯৩৯-এ যুদ্ধে স্বেচ্ছায় ওয়াফেন এসএস-এ যোগ দেয়: জার্মানিতে পাঠানো হয় তাকে, ১৯৩৯-এর শীতকাল ও ১৯৪০-এর বসন্তকাল ট্রেনিংয়ে কেটে যায়: ফ্রান্স অভিযানে সহগামী ওয়াফেন এসএস ইউনিটের সদস্য হয়ে যায় সে। ডিসেম্বর ১৯৪০-এ ফ্রান্স থেকে আবার বার্লিনে বদলি ক'রে পাঠিয়ে দেয়া হয় – এইখানটায় মার্জিনে কেউ লিখে রেখেছে: 'কাপুরুষতা'? – ১৯৪১-এর জানুয়ারিতে এসডি'তে দায়িত্ব দেয়া হয়, আরএসএইচ-এর তিন নম্বর বিভগে।

১৯৪১-এর জুলাইতে রিগাতে প্রথম এসডি-এর শাখা স্থাপন করে, পরের মাসে রিগা শিবিরে কমান্ডান্ট নিযুক্ত হয়। ১৯৪৪-এর অক্টোবরে অবশিষ্ট ইহুদিগুলোকে ড্যানজিগের এসডি'কে সমর্পণ ক'রে জাহাজে ক'রে জার্মানিতে ফিরে আসে। বার্লিনে এসে রিপোর্ট করে। তারপর থেকে এসএস-এর বার্লিন হেডকোয়ার্টারের অফিসেই কাজ নিয়ে থাকে পরবর্তী নিয়োগরে অপেক্ষায়।

এসএস ফাইলে শেষ পৃষ্ঠাটা অসমাপ্ত। বোধহয় ১৯৪৫-এর মে মাসে বার্লিন এসএস হেডকোয়ার্টারে কেরানীটি তাড়াতাড়ি নিজের পুনর্নিয়োগ ক'রে নিয়েছিলো।

ফাইলের শেষে একটা কাগজ আটকানো। সম্ভবত যুদ্ধের শেষে আমেরিকানদের সংযোজনা এটি। একটিমাত্র পৃষ্ঠায় টাইপে শুধু এ কটি কথা লেখা:

'ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ এই ফাইল সম্বন্ধে বৃটিশ অধিকারী কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করেছিলেন।'

নিচে কোন জিআই কেরানীর দস্তখত, তারিখ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

মিলার ফাইল থেকে স্বলিখিত আত্মকাহিনী, ছবি দুটো এবং শেষ পৃষ্ঠাটা খুলে নিয়ে ঘরের কেরানীটির কাছে এগিয়ে গেলো।

"এগুলোর ফটো-কপি পেতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই।" লোকটা ফাইল ফেরত নিয়ে তার সামনে একটা ট্রে'তে রেখে দিলো, মূল কাগজগুলো কপি হয়ে ফিরে এলে ফাইল সম্পূর্ণ ক'রে দেওয়ার অপেক্ষায়। আরেকটা লোকও একটা ফাইল এবং দুটো কাগজ দিলো কপির জন্যে।

www.boiRboi.blogspot.com

কপি করবার জন্যে সব কাগজগুলোকে একটা ট্রে'তে রাখতেই সঙ্গে সঙ্গে একটা অদেখা হাত সেগুলো নিয়ে গেলো।

"অপেক্ষা করুন একটু, মিনিট দশেক লাগবে," কেরানীটি জানালো। ওরা দু'জন ফিরে গিয়ে আবার টেবিলে বসলো। মিলারের সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু উপায় নেই, এখানে ধূমপান নিষেধ। অন্য লোকটা তার কালচে ধূসর সুটে খুব পরিচ্ছন্নভাবে ব'সে রইলো, কোলের ওপর দুটো হাত গুঁজে।

দশ মিনিট পরে কেরানীটির পেছনে খস্‌খস্‌ আওয়াজ হলে ফুটোর ভেতর দিয়ে দুটো খাম বের হয়ে এলো। সে দুটোকে তুলে ধরতেই মিলার এবং ওই লোকটি দু'জনেই তার কাছে গিয়ে হাজির। কেরানীটি একটি খামে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "এডুয়ার্ড রশম্যানের ফাইল?"

"আমার," বলেই হাত বাড়িয়ে দিলো মিলার।

"তাহলে এটা আপনার," অন্য খামটা দ্বিতীয় লোকটাকে ধরিয়ে দিলো কেরানী।

দরজা পর্যন্ত ওরা দু'জনে পাশাপাশি এলো। বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে জাগুয়ারে চড়ে বসলো মিলার। শহরের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিলো সে।

এক ঘণ্টাপর সিগিকে টেলিফোন করলো। "ক্রিসমাসে বাড়িতে আসছি।"

দু'ঘণ্টাপরে, পশ্চিম বার্লিন থেকে বের হবার পথে ড্রেইলিন্ডেন চেকপোস্টে তার গাড়িটা এসে থামলো। ততোক্ষণে ধূসর কোট পরা লোকটা তার স্যাভিনি প্লাৎসের ছিমছাম ফ্ল্যাট থেকে পশ্চিম জার্মানির কোন একটা শহরে টেলিফোন করলো। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে সে বললো, "আমি আজ ডকুমেন্ট সেন্টারে গিয়েছিলাম। জানেনই তো, একটু-আধটু গবেষণা করি, সেই কাজে। ওখানে দেখলাম এক লোক এডুয়ার্ড রশম্যানের ফাইল পড়ছে। তারপর সে তিনটা কাগজের ফটোকপি নিলো। সম্প্রতি যে নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছে সেজন্যে ভাবলাম আপনাকে ঘটনাটা জানানো উচিত।"

অন্য পাশ থেকে অনেক প্রশ্ন করা হলো।

"না, নাম জানতে পরিনি। একটা কালো লম্বা স্পোর্টস কারে ক'রে চলে গেলো...হ্যা হ্যা, সেটা নিয়েছি, হাম্বুর্গের নম্বর, সেটা হলো..."

ধীরে ধীরে সংখ্যাগুলো ব'লে গেলে ওপাশের লোকটা লিখে নিলো।

"হ্যা, ভাবলাম দেখে রাখা উচিত। কখন কি হয়, কিছু বলা যায় না, চারদিকে কতো টিকটিকি...হ্যা, হ্যা, ধন্যবাদ...আপনার দয়া...আপনার দয়া...বেশ, আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম...শুভ ক্রিসমাস, কামেরোড।"

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ৭

ক্রিসমাস ছিলো বুধবারে। সেটা শেষ না হবার আগ পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানির লোকটা বার্লিন থেকে পাওয়া মিলারের সংবাদ কাউকে জানায়নি। তারপর খবরটা সে দিলো তার নিজের কর্তাকে।

টেলিফোনে খবরটা শুনে সংবাতদদাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্তাব্যক্তিটি তার চামড়া-মোড়া এক্সিকিউটিভ চেয়ারে আয়েশ ক'রে বসলো। জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে দেখলো পুরনো শহরের বাড়ির ছাদগুলো তুষারে ভরে গেছে।

বিড়বিড় ক'রে সে বললো, "কি বিশ্রী ব্যাপার! এখন কেন? এতো দিন গেলো, কিছু হলো না...এখন...উফ্!"

শহরের সবাই জানে যে লোকটা একজন নামি আইনজীবী, গণ্যমান্য ব্যক্তি। আবার পশ্চিম বার্লিনে তার যতো এক্সিকিউটিভ অফিসার আছে, তাদের কাছে তার পরিচয় জার্মানিতে ওডেসা সংগঠনের এক নম্বর ব্যক্তি হিসেবে – জার্মান-শাখার মহানির্দেশক। তার টেলিফোন নম্বার কোন ডিরেক্টরিতে থাকে না, সাংকেতিক নাম *ওয়েরউলফ*।

জার্মান ওয়েরউলফ কিন্তু সিনেমা বা গল্প-কথার দানব নয়, পূর্ণিমা রাতে যার হাতে এবং পিঠে লোম গজিয়ে নেকড়ে হয়ে যায়: বরং জার্মানির লোককাহিনী অনুসারে আক্রমণকারী বৈদেশিক সৈন্যের দাপটে যখন টিউনিক সমরনায়করা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো তখন দেশপ্রেমী ওয়েরউলফ দেশেই রয়ে গেলো, প্রতিরোধ গ'ড়ে তুললো ঘন বনজঙ্গলের ভেতর থেকে। চুপিচুপি রাতে এসে বিদেশীদের আক্রমণ ক'রে পালিয়ে যেতো, রেখে যেতো শুধু তুষারের ওপর নেকড়ের থাবার চিহ্ন।

যুদ্ধের পর একদল এসএস অফিসার কিছু উগ্রপন্থী কিশোর এবং তরুণদের ধ্বংসাত্মক কাজে দীক্ষিত ক'রে তুললো মিত্রশক্তির ওপর হামলা করবার জন্যে।

www.boiRboi.blogspot.com

মনে মনে ওদের বিশ্বাস ছিলো যে আক্রমণকারী মিত্রশক্তিদের ধ্বংস করা কেবল সময়ের ব্যাপার। বাভেরিয়ায় তারা ঘাঁটি গেড়েছিলো, সেই অঞ্চল তখন আমেরিকানদের অধীনে ছিলো। তারাই হলো আসল ওয়েরউলফ। ভাগ্য ভালো যে কিছু করেনি তারা, নইলে ডাচাউ-এর ঘটনার পর জিআই-রা অপেক্ষা করছিলো শুধু, কেউ কিছু শুরু করলেই হতো।

ওডেসা যখন চল্লিশ দশকের শেষে পশ্চিম জার্মানিতে আবার অনুপ্রবেশ করছিলো, তখন তাদের মহানির্দেশক পদে যে প্রথম বসেছিলো সে ছিলো ১৯৪৫-এর তরুণ ওয়েরউলফ'দের অন্যতম শিক্ষক। উপাধিটি সেই-ই নিয়েছিলো। সুবিধা হচ্ছে যে, এতে একদিকে যেমন বেনামে থাকা যায়, তেমনি অন্যদিকে নামটা বেশ রূপক এবং নাট্য-অনুরাগী জার্মান মানসে যথেষ্ট মনোগ্রাহী।

১৯৬৩-র শেষে যে ওয়েরউলফ হলো সে এই পদে অধিষ্ঠিত তৃতীয় ব্যক্তি, যেমন কঠোর তেমনি চরমপন্থী সে। আজেন্টিন'তে অবস্থিত উর্ধ্বতন মহলের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রেখে কাজ করে। তার প্রধান কাজ হলো পশ্চিম জার্মানির ভেতরে প্রাক্তন এসএস সদস্যদের, বিশেষ ক'রে যারা উচ্চ পদস্থ এবং যাদেরকে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে তাদের রক্ষা করা।

অফিসের জানালা দিয়ে লোকটি বাইরে তাকিয়ে রইলো। তার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো মাদ্রিদ হোটেলে পঁয়ত্রিশ দিন আগে এসএস জেনারেল গ্লুকস্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাটা। জেনারেল তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলো যে, যে করেই হোক ভালকান নাম নিয়ে রেডিও-কারখানা খুলেছে যে ব্যক্তি এবং যার কারখানাতে মিশরিয় রকেটের গাইডেন্স সিস্টেম তৈরি হচ্ছে, তার পরিচয় যেনো প্রকাশ না পায় এবং তার নিরাপত্তা যেনো বিঘ্নিত না হয়। জার্মানির মধ্যে একমাত্র সেই-ই জানে যে...ভালকানের আসল নাম হলো এডুয়ার্ড রশম্যান।

প্যাডের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়লো গাড়িটির নম্বর। টেবিলের ওপরে রাখা বেল বাজাতেই পাশের ঘর থেকে সেক্রেটারির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। "হিলডা, গত মাসের ওই ডিভোর্স কেসে আমরা কোন্ প্রাইভেট ডিটেকটিভকে লাগিয়েছিলাম?"

"এক মিনিট..." কাগজ ওল্টনোর শব্দ এলো কানে। "মেমার্স...হাইন্জ মেমার্স।"

"তার টেলিফোন নাম্বরটা দাও তো। রিং করতে হবে না, শুধু নম্বরটা দাও।"

মিলারের গাড়ির নাম্বরের নিচে ওই টেলিফোন নাম্বরটা লিখে ইন্টারকমের বোতাম থেকে হাতটা সরিয়ে নিলো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দেয়ালের দিকে গেলো সে। সিমেন্টে গাঁথা আছে একটা দেয়াল-সিন্দুক। তার মধ্যে থেকে মোটা একটা ভারি বই নিয়ে টেবিলে চ'লে এলো। পাতা উল্টে উল্টে যেখানটা দরকার সেখানটায় থামালো। দু'জন মেমার্স

www.boiRboi.blogspot.com

আছে – হাইনরিখ ও ওয়াল্টর। হাইনরিখকেই সাধারণত ছোট ক'রে বলা হয় হাইন্‌জ। বিপরীত পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে তার জন্ম তারিখ থেকে এখন কতো বয়স হিসাব ক'রে নিলো। বেসরকারী গোয়েন্দাটির মুখ মনে করার চেষ্টা করলো সে। বয়স মিলে যাচ্ছে। হাইন্‌জ মেমার্সের সামনে অন্য যে দুটো নম্বর আছে সেগুলো লিখে নিয়ে টেলিফোন তুলে হিলডাকে একটা লাইন দিতে বললো।

ডায়াল-টোন আসতেই হিলডার দেয়া নম্বর ঘোরালো সে। প্রায় বারো বার রিং হবার পর কেউ ধরলো, একটি নারীকণ্ঠ।

"মেমার্স প্রাইভেট ডিটেক্টিভ।"

"হের মেমার্সকে দিন," উকিল বললো।

"কে বলছেন," মধুর কণ্ঠে সেক্রেটারি জানতে চাইলো।

"সেটা তাকে বলার কোন দরকার নেই। লাইন দিন তাকে। এক্ষুণি।"

একটু বিরতি নেমে এলো। কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে কাজ হয়েছে।

ভারি একটা কণ্ঠ ভেসে এলো, "মেমার্স বলছি।"

"আপনিই হের হাইনেজ মেমার্স?"

"হ্যা, কে বলছেন?"

"আমার নামটা থাক, ওটা এমন জরুরি নয়। শুধু বলুন ২৪৫.৭১৮ এই সংখ্যাটা কোন অর্থ বহন করে আপনার কাছে?"

ফোনে নিরবতা নেমে এলো। শুধু শোনা গেলো একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। মেমার্স বুঝতে পেরেছে তার এসএস নাম্বরটা তাকেই কেউ ছুঁড়ে মারলো। ওয়েরউলফের টেবিলে রাখা ওই মোটা বইটার ভেতরে প্রত্যেক এসএস সদস্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মেমার্সের কণ্ঠস্বর ফিরে এলো, কণ্ঠে খুব সন্দেহ, "কি করা উচিত?"

"যদি আমি বলি যে আমার নিজস্ব সংখ্যাটিতে শুধু পাঁচটি অংক আছে, তাহলে সেটা কি কোন অর্থ বহন করবে আপনর কাছে...কামেরাড?"

বিদ্যুতের আঘাত লাগলো যেনো ওপাশে। পাঁচ অংক মানে খুবই উঁচু র‍্যাংক।

"হ্যা, স্যার," মেমার্সের কণ্ঠে সমীহ।

"বেশ," ওয়েরউলফ বললো, "ছোট্ট একটা কাজ ক'রে দিতে হবে আপনাকে। কোন একটি টিকটিকি কামেরাডেনদের একজনের সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে পড়েছে। লোকটার পরিচয় আমার জানা দরকার।"

"জু বেফে (আদেশ শিরোধার্য)" ফোনে ভেসে এলো।

"সুন্দর। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কামোরাড সম্ভাষণই যথেষ্ট। আমরা তো সবাই একই পথের পথিক, তাই না?"

মেমার্সের গলায় এবার সন্তুষ্টির ভাব, সে খুব খুশি। হ্যা, কামেরাড।"

www.boiRboi.blogspot.com

"দেখুন, লোকটার গাড়ির নাম্বর শুধু পেয়েছি। হাম্বুর্গের রেজিস্ট্রেশন করা।" নাম্বরটা ধীরে ধীরে প'ড়ে শোনায় ওয়েরউলফ। "লিখে নিয়েছেন?"

"হ্যা, কামেরাড।"

"আমার ইচ্ছে আপনি নিজে হাম্বুর্গে যাবেন। লোকটার নাম-ঠিকানা, জীবিকা, পরিবার-পরিজন, সামাজিক অবস্থা...বুঝলেন তো, সাধারণত যেসব খবর নেয়া হয়। কতো সময় লাগবে আপনার?"

"প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টার মতো।"

"বেশ। এখন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টাপর আমি আপনাকে ফোন করবো। হ্যা,একটা কথা, যার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে তাকে কোনরকম প্রশ্ন করা চলবে না। সম্ভব হলে এমনভাবে কাজ করবেন যাতে সে টের না পয়। পরিষ্কার?"

"নিশ্চয়ই, কোন সমস্যা হবে না।"

"কাজ হয়ে গেলে হিসাব ক'রে রাখবেন। যখন আমি ফোন করবো ব'লে দেবেন সেটা। ডাকে টাকা পাঠিয়ে দেবো।"

মেমার্স সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলো, "না না, কামেরাড, নিজেদের কাজে আবার টাকা কেন?"

"বেশ। তাহলে দু'দিন পর টেলিফোন করবো।" ওয়েরউলফ ফোন রেখে দিলো।

ঠিক সেইদিনই দুপুরে, মিলার হাম্বুর্গ ছেড়ে রওনা দিলো। এবারকার গন্তব্য বন, নদীর ধারে ছোট্ট একঘেয়ে একটি শহর, কনরাড অ্যাডেনয়ের যাকে ফেডারেল রিপাবলিকের রাজধানী বানিয়েছেন, কারণ তাঁর নিজের বাড়ি এখানেই।

ব্রেমেনের দক্ষিণে মহাসড়কের ওপরে বিপরীত দিক থেকে এসে তীব্র গতিতে মেমার্সের হাম্বুর্গগামী ওপেল তার জাগুয়ারটাকে অতিক্রম ক'রে গেলো। দুজনের কেউই জানতে পারলো না পরস্পরের কথা।

বনে যখন পৌছালো তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। শহরে একটি মাত্রই বড় লম্বা রাস্তা। ট্রাফিক পুলিশ তাকে দেখে তার পাশে এসে থামলো।

"বৃটিশ এ্যাম্বাসিটা কোথায় বলতো পারেন?"

"সেটা তো এক ঘন্টার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে," খাঁটি রাইনল্যান্ডের লোক পুলিশের লোকটা।

"তহলে তো দেরি করা যাবে না," মিলার বললো, "কোথায় সেটা?"

হাত দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে দিলো। "সোজা চ'লে যান। এই রাস্তাটাই সামনে গিয়ে ফ্রেডরিখ এর্বট অ্যালি হয়েছে। ট্রামলাইন ধ'রে যান, বন ছেড়ে যখন বাড গোটোসবার্গে ঢুকবেন বাম দিকে সেটা অবস্থিত। আলো জ্বলছে

www.boiRboi.blogspot.com

দেখবেন, বাইরে বৃটিশ ফ্ল্যাগ।"

মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানালো মিলার। পুলিশটার নির্দেশমতো ঠিক পেয়ে গেলো বৃটিশ দূতাবাস। কাঁচের দরজা দিয়ে ঢুকে দেখলো ডেস্কে একজন মধ্যবয়স্কা রিসেপশনিস্ট ব'সে আছে। পেছনে দিকে আর একটা ঘরে নীল সার্জের সুট পরা দু'জন লোক, যাদের দেখলেই বোঝা যায় যে আগে তারা সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট ছিলো।

মিলার ভাঙা ভাঙা স্কুলে শেখা ইংরেজিতে বললো, "প্রেস-অ্যাটাচির সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

শুনে রিসেপশনিস্টের দুশ্চিন্তা হলো। "বলতে পারছি না উনি আছেন কিনা...শুক্রবারের বিকেল তো।"

"একটু চেষ্টা ক'রে দেখুন না।" প্রেসকার্ডটা এগিয়ে দিয়ে মিলার বললো।

রিসেপশনিস্ট সেটার ওপর নজর বুলিয়ে ইন্টারকমের নাম্বর ঘোরালো। ভাগ্য ভালো ছিলো। তখনো ভদ্রলোক যাননি। মিলারকে তাঁর ঘরের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো প্রাক্তন সার্জেন্টদের একজন।

দেখে ভালো লাগলো যে ভদ্রলোকের বয়স মধ্য ত্রিশের কোঠায়, সাহায্য করতে উন্মুখ বলেই মনে হচ্ছে।

"বলুন, আপনার কি কাজে আসতে পারি আমি?"

একেবারে সরাসরিই বিষয়টা উত্থাপন করতে মনস্থ করলো মিলার।

ভূমিকার একটু মিথ্যার আশ্রয় অবশ্য নিতে হলো। "আমি একটা সংবাদপত্রের হয়ে খবর যাচাই ক'রে বেড়াচ্ছি। জনৈক ভূতপূর্ব এসএস ক্যাপ্টেনের কাহিনী। অত্যন্ত জঘন্য লোক, আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ তাকে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুনেছি জার্মানির এই অংশ যখন বৃটিশদের অধিকারে ছিলো তখন তাঁরাও তার নামে হুলিয়া বের করেছিলেন। আচ্ছা বলতে পারেন কিভাবে জানা যায় বৃটিশেরা তাকে কখনো ধরতে পেরিছিলো কিনা না, ধরলে তারপরে কি হয়েছিলো?"

ভদ্রলোক যেনো গভীর পানিতে পড়ে গেলেন।

"অ্যা...না, আমি ঠিক জানি না...বলতে পারবো না। সেই কবে ১৯৪৯ সালে আপনাদের সরকারের হাতে আমরা রেকর্ডপত্র দিয়ে দিয়েছিলাম। যে পর্যন্ত আমরা ক'রে গিয়েছিলাম তার পর থেকে তারাই শুরু করেছিলো। কাজেই তাদের কাছেই পাবেন।"

মিলার বলতে চাইলো না যে জার্মান কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন রকম সাহায্য করতে রাজি নয়। তার বদলে সে বললো, "হ্যা, তা সত্যি, ঠিক বলেছেন আপনি। তবে আমি অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি, ১৯৪৯ থেকে আজ পর্যন্ত ফেডারেল রিপাবলিক এই লোকটাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়নি। তার মানে ১৯৪৯-এর পর

www.boiRboi.blogspot.com

লোকটা কখনো ধরাই পড়েনি। তবু পশ্চিম বার্লিনে আমেরিকান ডকুমেন্ট সেন্টার থেকে জানতে পেরেছি যে তার ফাইল বৃটিশরা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে। নিশ্চয়ই তার একটা কোন কারণ আছে, তাই না?"

"তা তো বটেই," প্রেস অ্যাটাচি বললেন। পশ্চিম বার্লিনের আমেরিকান কর্তৃপক্ষ মিলারকে সাহায্য করেছে, তিনি যদি এখন কিছু না করেন সেটা খুব খারাপ দেখায়। চিন্তায় ভুরু কুচকে গেলো তাঁর।

"বৃটিশদের পক্ষে সে সময় তদন্তভার কাদের ওপর ছিলো? কোন্ বিভাগে?"

"সেটা? আর্মির প্রোভোস্ট-মার্শালের দপ্তরে। নুরেমবার্গ ছাড়া, যেখানে গুরুতর যুদ্ধ-অপরাধগুলোর বিচার হয়েছিলো, মিত্রশক্তিরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ক'রে যুদ্ধ-অপরাধীদের তদন্ত করেছিলো। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে চলেছিলো, অবশ্য রাশিয়ানরা ছাড়া। এই সব তদন্তের ফলেই তো আঞ্চলিক যুদ্ধ-অপরাধের বিচারগুলোর শুরু হয়েছিলো। বুঝতে পারলেন?"

"হ্যা।"

"তদন্ত চালাতো প্রোভাস্ট-মার্শালদের দপ্তর অর্থাৎ সামরিক পুলিশ আর বিচারের জন্যে দলিলপত্র তৈরি করতো আইন বিভাগে। কিন্তু দুটো বিভাগেরই সব ফাইল ১৯৪৯-এ দিয়ে দেয়া হয়েছিলো। বুঝলেন?"

"আচ্ছা," মিলার বললো, "কিন্তু এতোদিনে সেগুলো সেনাবাহিনীর আর্কাইভসে চলে গেছে।"

"সেগুলো দেখতে দেওয়া হয় না?"

অ্যাটাচি ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যেনো।

"না না, তা সম্ভব না...মনে তো হয় না। রিসার্চ-স্কলারেরা দরখাস্ত করলে হয়তো অনুমতি পেতে পারে, তবে সেটা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হয় না কোন রিপোর্টরকে অনুমতি দেয়া হবে, ক্ষমা করবেন, কথাটা অন্যভাবে নেবেন না... বুঝলেন?"

"হ্যা, বুঝেছি," মিলার বললো।"

মানে কথাটা হলো গিয়ে আপনি তো আর ঠিক সরকারী লোক নন, তাই না? আর জার্মান কর্তৃপক্ষকে নারাজ করাটাও উচিত হবে না?"

"না না, সে চিন্তা ভুলেও করবেন না," মিলার বললো।

"তবে বৃটিশ এ্যাম্ব্যাসি আর আপনাকে কি সাহায্য করতে পারে, বলুন?"

"বেশ...আচ্ছা একটা কথা শুধু বলুন, তখনকার দিনে কাজ করতেন এমন কেউ এখানে আছেন?"

"এ্যাম্ব্যাসির স্টাফদের মধ্যে? না, মিস্টার। কতোবার বদলি হয়ে গেলো সব।" দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন তিনি মিলারের সঙ্গে। "দাঁড়ান, ক্যাডবেরি

www.boiRboi.blogspot.com

নামের একজন আছেন। উনি তো সেই কবে থেকে এখানে রয়েছেন।"

"ক্যাডবেরি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"অ্যান্টনি ক্যাডবেরি, বৈদেশিক সংবাদদাতা। এখানে সাংবদিকদের মধ্যে যথেষ্ট সিনিয়র, বৃটিশ সাংবাদিক। জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছেন। ঠিক যুদ্ধের পরপরই এখানে এসেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

"বেশ ভালো। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু কোথায় পাবো তাঁকে?"

"আজ তো শুক্রবার," অ্যাটাচি বললেন, "কিছুক্ষণ পর তাঁকে তাঁর প্রিয় জায়গাটিতে পাবেন, সার্কেল ফ্রাঁসায়ের বারে। চেনেন সেটা?"

"না, আগে কখনো এখানে আসিনি।"

"ও! তা, ওটা হলো গিয়ে একটা রেঁস্তোরা, ফারাসিরা চালায়। সুন্দর খাবার, খুব জনপ্রিয়। এই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যান, বাড গোটেসবার্গে পাবেন।"

পেয়েও গেলো মিলার। প্রায় রাইন নদীর ওপরেই, তীর থেকে মাত্র একশো গজ দূরে, অ্যাম সিমবাড নামে একটা রাস্তার ওপর। বারম্যান ক্যাডবেরিকে খুব ভালো ক'রে চেনে, তবে আজ সন্ধ্যায় তাঁকে দেখেনি সে। তাহলেও চিন্তার কোন কারণ নেই, সন্ধ্যাবেলায় নাও যদি আসে, কাল নিশ্চয়ই লাঞ্চের আগে ড্রিংকসের জন্যে এসে যাবেন।

একটু এগিয়ে গিয়ে ড্রিসেন হোটেলে ঘর নিলো মিলার। পুরনো অভিজাত হোটেল, শতাব্দীর গোড়াতে যার জন্ম। অ্যাডলফ হিটলারের খুব প্রিয় ছিলো এই হোটেল, ১৯৩৮ সালে নেভিল চেম্বারলেনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের আয়োজন এইখানেই করেছিলেন। সার্কেল ফ্রাঁসাইতে নৈশভোজ সেরে কফি নিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলো যদি ক্যাডবেরি এসে যান। কিন্তু এগারোটা পর্যন্তও প্রৌঢ় ইংরেজটির দেখা পাওয়া গেলো না, তখন সে রাতের মতো আশা ত্যাগ ক'রে মিলার তার হোটেলে ফিরে এলো।

পরদিন দুপুর বারোটার কয়েক মিনিট আগে ক্যাডবেরি এসে ঢুকলেন সার্কেল ফ্রাঁসায়ের পানশালায়। পরিচিত ব্যক্তিদের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে কোণার দিকে নিজের প্রিয় জায়গাটায় গিয়ে টুলে বসলেন। রিকারের গ্লাসে প্রথম চুমুকটা দিতেই, মিলার জানালার পাশ থেকে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো।

"মিঃ ক্যাডবেরি?"

ইংরেজ ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে চাইলো। দেখেই বোঝা যায় বয়সকালে ভদ্রলোক অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। এখন অবশ্য চুলগুলো সব সাদা যদিও পরিপাটি ক'রে আচড়ানো। মুখের চামড়া অবশ্য কুঁচকে যায়নি। সাদা পুরু ভুরুজোড়ার নিচে চক্‌চকে নীল চোখ। মিলারের দিকে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

আছেন।

"হ্যা।"

"আমার নাম মিলার, পিটার মিলার। হাম্বুর্গের একজন রিপোর্টার আমি। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি?"

অ্যান্টনি ক্যাডবেরি হাত দিয়ে তাঁর পাশের টুলটা দেখিয়ে দিলেন। জার্মান ভাষাতেই বললেন, "জার্মানেই কথা বলা যাক, কি বলেন?"

মিলার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, তার ইংরেজিতেই বোধহয় টের পেয়ে গেছেন। ক্যাডবেরি হাসলেন। "বলুন, কি করতে পারি?"

তাঁর উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে মিলার মনস্থির ক'রে ফেললো। পুরো কাহিনীটাই বললো সে, টউবেরের মৃত্যু থেকে আরম্ভ ক'রে। ভদ্রলোক খুব ভালো শ্রোতা, একবারও বাঁধা দিলেন না। মিলারের বলা শেষ হয়ে গেলে বারম্যানকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁর রিকারের গ্লাস আরেকবার ভরে দিতে হবে এবং মিলারের জন্যে আরেকটা বিয়ার।

"স্প্যাটেনব্রাউ, চলবে?"

মিলার মাথা নেড়ে বললো, "হ্যা।" গ্লাস ভরতি ক'রে পানীয় দিলো।

"চিয়ার্স," ক্যাডবেরি বললেন। "হ্যা, সমস্যা বেশ গুরুতর দেখছি। তা সাহস আছে আপনার।"

"সাহস?"

"নয়তো কি? আপনার দেশবাসীদের বর্তমান যা মানসিক পরিস্থিতি তাতে এরকম একটা কাহিনী তো আর জনপ্রিয় হয়ে উঠবে না," ক্যাডবেরি বললেন, "বুঝবেনমিস্টার, সময়ে ঠিকই বুঝে যাবেন।"

"বুঝে গেছি এরই মধ্যেই," মিলার বললো।

"আচ্ছা! তাই ভাবছিলাম।" ইংরেজটি হেসে ফেললেন। একটু লাঞ্চ হয়ে যাক? বউ আজ বাইরে আছে।"

লাঞ্চ খেতে খেতে মিলার ক্যাডবেরিকে জিজ্ঞেস করলো যে তিনি কি যুদ্ধের শেষ দিকটায় জার্মানিতেই ছিলেন?"

"হ্যা...যুদ্ধের সংবাদদাতা ছিলাম আমি। বয়স অবশ্য তখন অনেক কম ছিলো, প্রায় আপনার বয়সীই হবো। মন্টগোমারির বাহিনীর সঙ্গে এসেছিলাম। বনে নয় অবশ্য, বনের কথা তখন আর কে শুনেছে? হেড-কোয়ার্টার ছিলো লুনবার্গে। তারপর আমি রয়েই গেলাম। যুদ্ধের সমাপ্তি দেখলাম...আত্মসমর্পণের ঘোষণা...কাগজে সেইসব বিবরণ পাঠালাম। তারপর কাগজ থেকেই আমাকে এখানে থাকতে বলা হলো।"

"আঞ্চলিক যুদ্ধ-অপরাধের বিচারগুলোতেও কি আপনি উপস্থিত ছিলেন?"

www.boiRboi.blogspot.com

মিলার প্রশ্ন করলো।

বড় একটা মাংসখণ্ড চিবুতে চিবুতে ক্যাডবেরি বললেন, "হ্যা, বৃটিশ অঞ্চলের সব কটাতেই। নুরেমবার্গ বিচারেরর সময় কাগজ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ পাঠানো হয়েছিলো, সেটা হয়েছিলো অবশ্য আমেরিকান অঞ্চলে। আমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে বড় অপরাধী ছিলো জোসেফ ক্রেমার আর ইরমা গ্রিজ। তাদের নাম শুনেছেন?"

"ভাসা-ভাসা," মিলার জবাব দিলো, "আমাদের যুগের লোকদের এই সব কথা তো বিশেষ জানানোই হয়নি, কেউ বলতেও চায় না।"

ভুরুর নিচ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যাডবেরি প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু এখন দেখছি আপনি জানতে চাইছেন?"

"কখনো না কখনো তো জানতেই হতো। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? জার্মানদের কি আপনি ঘৃণা করেন?"

কয়েক মিনিট ধ'রে মাংস চিবুতে চিবুতে ক্যাডবেরি প্রশ্নটাকে তাঁর মনের গভীরে ভালো ক'রে যাচাই ক'রে দেখলেন।

"বেলসেন আবিষ্কৃত হওয়ার পর বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকেরা সেখানে যায়। জীবনে আমি কোনদিন ওরকম মানসিক ভারসাম্য হারাইনি। রণাঙ্গনের কতো বিভীষিকাই তো আমি দেখেছি, কিন্তু ওরকম। উহু...তখন...হ্যা, মনে হয় সেই মুহূর্তে...ওদের সবাইকে ঘৃণা করেছিলাম।"

"আর এখন?"

"না, এখন আর নয়...মুখোমুখি হওয়া যাক তাহলে ব্যাপারটার সঙ্গে। দেখুন, ১৯৪৮ সালে আমি একটি জার্মান মেয়েকে বিয়ে করি, এখনো আমি এখানেই বাস করছি। ১৯৪৫-এ আমার মনে জার্মানদের বিরুদ্ধে যে বিতৃষ্ণার ভাব ফুটে উঠেছিলো তা যদি থাকতো তাহলে তো আমি কবে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতাম।"

"কিন্তু মনের ভাব পাল্টালো কি ক'রে?"

"সময়ে...বুঝতে পারলাম সব জার্মান মানুষই জোসেফ ক্রেমার নয়...বা এই যে কি যেনো নাম, রশম্যান? রশম্যানও নয়। তবু, শুনে রাখুন, আমার সমকালের জার্মানদের দেখলে এখনো আমার মনে দ্বিধা জাগে।"

"আর আমাদের যুগের?" হাতের ওয়াইন গ্লাসটাকে ঘুরিয়ে দেখছিলো মিলার, রক্তবর্ণ তরল পানীয়ের ভেতর দিয়ে আলোর ছটার কম্পমান প্রতিসরণ।

"তারা ভালো," ক্যাডবেরি বললেন, "ভালো হতেই হবে আপনাদের।"

"আপনি আমাকে সাহায্য করবেন রশম্যান তদন্তে? কেউ কিন্তু করছে না।"

"যদি আমার দ্বারা হয়, নিশ্চয়ই," ক্যাডবেরি বললেন, "কি জানতে চান আপনি?"

"বৃটিশ এলাকায় কি তার বিচার হয়েছিলো ব'লে আপনার মনে পড়ে?"

www.boiRboi.blogspot.com

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাডবেরি। "না। কিন্তু আপনিই বললেন যে জন্মসূত্রে লোকটা অস্ট্রিয়ান, সেই সময় অস্ট্রিয়াও তো চতু:শক্তির দখলে ছিলো। তবে আমি নিশ্চিত যে এখানে তার বিচার হয়নি, হলে নামটা আমার মনে থাকতো।"

"তাহলে বার্লিনের আমেরিকানদের কাছ থেকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কেন তার জীবনবৃত্তান্ত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে নিলেন ক্যাডবেরি। "রশম্যান হয়তো কোন কারণে বৃটিশদের নজরে এসে পড়েছিলো। সেই সময় রিগার কথা কেউ জানতোও না। চল্লিশের শেষ দিকে রাশিয়ানরা ছিলো ভীষণ ক্ষ্যাপা, অসম্ভব বদমেজাজ তাদের, পূর্ব-অঞ্চল থেকে কোন খবরই দিতো না। অথচ গণহত্যার জঘন্যতম সব অপরাধ ওই অঞ্চলেই ঘটেছিলো। অতএব, দেখুন, কী অদ্ভুত অবস্থা...এখন যেটাকে আমারা লৌহ-যবনিকা বলি তার পূর্বদিকে মানুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধগুলোর আশি শতাংশ ঘটেছিলো কিন্তু সেইসব অপরাধের জন্যে যারা দায়ি তাদের নব্বই শতাংশ রয়ে গেলো কারণ আমরা জানতেই পারলাম না হাজার মাইল পূর্বে তারা কী করেছিলো। অবশ্য ১৯৪৭-এ যদি রশম্যান সম্পর্কে কোনরকম তদন্ত হয়ে থাকে তবে তার নাম নিশ্চয়ই আমাদের নজরে এসেছে।"

"সেই কথাই তো বলছি," মিলার বললো, "কোন্‌খান থেকে শুরু করা যায় বলুন তো, বৃটিশ রেকর্ড দেখতে হলে কোথায় যেতে হবে?"

"আমার নিজস্ব ফাইলগুলো থেকেই আরম্ভ করা যাক। আমার বাড়িতেই আছে সেগুলো। আসুন, এখান থেকে বেশি দূরে নয়।"

তাঁর অফিস-ঘরে ঢুকে ক্যাডবেরি বললেন, "বাড়িতেই আমার অফিস। ফাইল সাজানোর কায়দাও আমার নিজস্ব, অন্য কেউ ধরতেও পারবে না। আসুন, আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

ফাইলিং ক্যাবিনেট দুটোর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "এই যে দেখছেন, এগুলোর একটাতে রয়েছে লোকজনদের নাম-অনুসারে বর্ণানুক্রমে সাজানো ফাইল, আর দ্বিতীয়টায় বিষয়সূচী অনুসারে। প্রথমটা থেকেই শুরু করা যাক। রশম্যানের নাম খুঁজে দেখি আগে।"

কিন্তু অনুসন্ধানে কোন্ লাভ হলো না। রশম্যান নামে কোন নথি নেই।

"আচ্ছা, এবারে বিষয়সূচি অনুসারে সাজানো ফাইলগুলো দেখা যাক," ক্যাডবেরি বললেন, "চারটা বিষয় আছে যেগুলো হয়তো কাজে আসতে পারে। প্রথমটা হলো 'নাৎসি', দ্বিতীয়টা 'এসএস'। তারপর খুব মোটা একটা ফাইল আছে – 'বিচার'। সেগুলোতে যতো বিচারকাহিনী সবগুলোর কাটিং জমানো রয়েছে, তবে বেশির ভাগই ১৯৪৯ থেকে অনুষ্ঠিত ফৌজদারি বিচারের বিবরণ। শেষেরটা হলো 'যুদ্ধ-অপরাধ', ওটা কাজে আসতে পারে বোধ হয়। দেখা যাক সবগুলো।"

www.boiRboi.blogspot.com

মিলারের চেয়ে ক্যাডবেরি পড়েন অনেক দ্রুত। তবু চারটা ফাইলের কয়েকশো কাটিং আর ক্লিপিং প'ড়ে দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেলো। শেষ ফাইলটা আলমারিতে তুলে রেখে ক্যাডবেরি বললেন, "আজ রাত্রে আমার একটা ডিনারের দাওয়াত আছে। এগুলো তো এখনো দেখাই হলো না।" বলেই দেওয়াল-সংলগ্ন দুটো তাক্ দেখিয়ে দিলেন, যেগুলোর ওপর কিছু বক্স ফাইল রাখা আছে।

"ওগুলো কি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"উনিশ বছর ধরে আমার কাগজে যতো বার্তা পাঠিয়েছি তার নকল আছে ওই ওপরের তাকে," ক্যাডবেরি বলেন, "আর নিচের তাকের ওগুলো হচ্ছে কাগজে এই উনিশ বছর ধ'রে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া ছাপা আছে দেখছেন, সেগুলোর আমার পাঠানো। কিন্তু দ্বিতীয়টায় অন্য সাংবাদিকের পাঠানো খবরও তো রয়েছে। আবার তেমনি আমার পাঠানো অনেক খবর কাগজে হয়তো ছাপেনি এমনও আছে। এক এক বছরের কাটিংয়ে প্রায় ছয়টা ক'রে বক্স-ফাইল আছে। কাজেই মাল-মশলা প্রচুর, খাটতে হবে বেশ। তবে সুখের বিষয় আগামীকাল রবিবার, পুরো দিনটাই পাওয়া যাবে।"

"আপনি যে আমার জন্যে এতো কষ্ট করছেন –"

"আরে না না, কাল আমার করার কিছুই নেই। তাছাড়া ডিসেম্বরের শেষে বন শহরে রোববারগুলো খুবই একঘেয়ে, ভীষণ নিরানন্দ। আমার বউও কাল সন্ধ্যার আগে ফিরছে না। কাল সাড়ে এগারোটা সার্কেল ফ্রাঁসাইতে চলে আসুন, তেষ্টা মিটিয়ে আমরা এখানে কাজে লেগে যাবো।"

রবিবার বিকেলের দিকে সন্ধান পাওয়া গেলো। নিজের পাঠানো ডেসপ্যাচগুলো নিয়ে বসেছিলেন ক্যাডবেরি। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৭-এর ফাইলটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চিৎকার ক'রে বললেন, "ইউরেকা," স্প্রিং-ক্লিপ খুলে সঙ্গে সঙ্গে একটা কাগজ বের ক'রে নিলেন, প্রায় বিবর্ণ হয়ে গেছে, বহুদিন আগে টাইপ করা, তারিখ দেয়া আছে ২৩ শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

"কাগজে যে এই লেখাটা ছাপায়নি তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই," বললেন তিনি, "ক্রিসমাসের আগে কে আর বন্দী এসএস-এর কাহিনী পড়তে যাচ্ছে, বলুন! তাছাড়া তখন কাগজ যা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিলো, ক্রিসমাস-ইভের সংস্করণও বোধহয় খুব ছোট ছিলো।"

লেখার টেবিলে কাগজটা রেখে টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে দিলেন। মিলার ঝুঁকে পড়ে দেখলো লেখা আছে:

"বৃটিশ সামরিক সরকার, হ্যানোভার, ২৩ শে ডিস – কুখ্যাত এসএস-এর একজন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন অস্ট্রিয়ান গ্রাৎসে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে বন্দী হয়েছেন। বৃটিশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ এখানে জানান

www.boiRboi.blogspot.com

যে বিশদ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ধরেই রাখা হবে।

"লোকটিকে এডুয়ার্ড রশম্যান নামে সনাক্ত করেছিলেন অষ্ট্রিয়ান শহরটির কোন এক প্রাক্তন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের অধিবাসী। তিনি অভিযোগ করেছেন যে রশম্যান লাটভিয়ার একটি ক্যাম্পের কম্যান্ডান্ট ছিলেন। প্রাক্তন ক্যাম্প অধিবাসীটি তাঁকে অনুসরণ ক'রে তার বাড়ি দেখে আবসার পর, গ্রাজের বৃটিশ ফিল্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের সদস্যেরা রশম্যানকে গ্রেপ্তার করে।"

"মুখপাত্রটি আরো জানান যে লাটভিয়ার রিগাতে অবস্থিত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পটির বিশদ খবরাখবরের জন্যে পটসডামের সোভিয়েত আঞ্চলিক সদর দপ্তরের কাছে অনুরোধ পাঠানো হয়েছে এবং অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্যে অনুসন্ধান চলছে। ইতিমধ্যে বার্লিনস্থ এসএস ইনডেক্স থেকে আমেরিকান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের ভিত্তিতে ধৃত ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে এডুয়ার্ড রশম্যান ব'লে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সংবাদ সমাপ্ত। ক্যাডবেরি।"

এই ছোট্ট খবরটুকু চার-পাঁচবার ক'রে পড়লো মিলার।

"হায় ঈশ্বর!," জোরে জোরে দম ফেলে বললো, "পেয়েছিলেন তাহলে ওকে।"

"তবে ড্রিঙ্কস হয়ে যাক এখন," ক্যাডবেরি বললেন।

শুক্রবার সকালে যখন মেমার্সকে টেলিফোন করেছিলো, তখন ওয়েরউলফের মনেও ছিলো না যে আটচল্লিশ ঘণ্টাবাদে রবিবার পড়ে যাবে তা সত্ত্বেও, সেদিন বাড়ি থেকে মেমার্সকে যখন ফোন করলো, ঠিক সেই সময়েই বাড গোটেসবার্গে তারা দু'জনে রশম্যানের পুরনো খবর খুঁজে বের করেছে। টেলিফোনে কোন সাড়া পাওয়া গেলো না।

পরের দিন বেলা সাড়ে ন'টায় অফিসে টেলিফোন এলো।

মেমার্স বললো, "কি যে আনন্দিত হলাম কামেরাড, আপনি টেলিফোন করেছেন ব'লে। কাল হাম্বুর্গ থেকে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিলো।"

"খবর পেয়েছেন?" ওয়েরউলফ জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা। যদি লিখে নিতে চান..."

"বলুন।" প্রায় ধমক দেয়ার মতো কণ্ঠস্বও তার।

মেমার্স কণ্ঠটা পরিস্কার ক'রে নিজের নোটবই থেকে পড়তে আরম্ভ করলো:

"গাড়িটার মালিক জনৈক ফ্রল্যান্স সাংবাদিক, নাম পিটার মিলার। চেহারার বিবরণ : বয়স ঊনত্রিশ, উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট, বাদামী চুল, বাদামী চোখ। বিধবা মা আছে, হাম্বুগ শহরের অডর্ফে থাকে। সে নিজে হাম্বুর্গ শহরের মাঝখানে স্টাইন্ড্যামের কাছে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে।"

মিলারের ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বরও পড়ে শোনালো।

www.boiRboi.blogspot.com

"মিস সিগ্রিড নামে একটি মেয়েকে নিয়ে সে থাকে, পেশায় মেয়েটি স্ট্রিপ-টিজ নাচিয়ে। মিলার মূলত সচিত্র পত্রিকাগুলোর হয়ে কাজ করে। উপার্জন, মনে হয়, বেশ ভালো। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হচ্ছে তার বিশেষত্ব। মানে, যা বলেছিলেন, কামেরাড, পাকা টিকটিকি একটা।"

"কে তাকে এই কাজটার ভার দিয়েছে সে বিষয়ে কোন খোঁজ পেলেন?" ওয়েরউলফ জিজ্ঞেস করলো।

"না, সেটাই বরং একটা রহস্য। সে যে এখন কাদের হয়ে কাজ করছে তা কেউই জানে না। আমি মেয়েটাকে টেলিফোন করেছিলাম, এমন ভাব দেখিয়েছিলাম যেনো বড় কোন পত্রিক-অফিস থেকে বলছি। মেয়েটি বললো মিলার কোথায় আছে সে জানে না, তবে বিকেলের দিকে ওর টেলিফোন পাবে ব'লে আশা করছে।

"আর কিছু?"

"ওর গাড়িটা, যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে সেটার। কালো জাগুয়ার, বৃটিশ মডেলের, পাশ দিয়ে লম্বালম্বি একটা হলুদ দাগ। দুই সিটের স্পোর্টসকার, তবে ছাদ খোলা যায় না। মডেলের নাম এক্সকে-১৫০। তার গ্যারাজে গিয়ে সন্ধান নিয়েছি।"

ওয়েরউলফ মন দিয়ে খবরটা শুনে নিয়ে বললো, "দেখুন সে এখন কোথায় আছে আমি সেটা জানতে চাই।"

"হাম্বুর্গে নেই," চটপট জবাব দিলো মেমার্স, "শুক্রবার মধ্যাহ্নভোজের সময় চলে গিয়েছিলো, মানে আমি যখন ওখানে যাচ্ছিলাম। ক্রিসমাস ওখানেই কাটিয়েছিলো, তার আগে অন্য কোথাও ছিলো।"

"সে আমি জানি," ওয়েরউলফ বললো।

"কোন্ কাহিনী নিয়ে অনুসন্ধান ক'রে ফিরছে তা বের করতে পারবো," ভরসা দিলো মেমার্স, "খুব বেশি তো অনুসন্ধান করতে পারিনি কারণ আপনিই ব'লে দিয়েছিলেন যেনো কেউ বুঝতে না পারে তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে।"

"আমি জানি কোন কাহিনী নিয়ে সে কাজ করছে। আমাদেরই কোন সতীর্থকে ফাঁসাতে চায়।" এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে আবার ওয়েরউলফ বললো, "কোথায় আছে এখন, বের করতে পারবেন?"

"হ্যা, মনে তো হয়। বিকেলে আবার ওই মেয়েটাকে ফোন করবো, বলবো যে বড় কোন পত্রিকা থেকে বলছি, মিলারকে এক্ষুণি দরকার। তখন টেলিফোনে মনে হলো মেয়েটা বেশ সহজ-সরল।"

"তাই করুন তাহলে," ওয়েউলফ বললো, "বিকেল চারটার সময় আবার আমি টেলিফোন করবো।"

সেই সোমবারের সাকালবেলায় ক্যাডবেরি এলেন বনে। মন্ত্রীদের একটা সাংবাদিক সম্মেলন আছে। সাড়ে দশটায় ড্রিসেন হোটেলে মিলারকে ফোন

www.boiRboi.blogspot.com

করলেন। "আরে, তাহলে আপনাকে পেলাম... মিস্টার! শুনুন, চারটার দিকে সার্কেল ফ্রাঁস্যায়ে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

মধ্যাহ্নভোজের আগে সিগিকে টেলিফোন ক'রে মিলার জানিয়ে দিলো যে সে ড্রিসেনে আছে। দেখা হতেই ক্যাডবেরি চায়ের অর্ডার দিলেন।

"সকালের ঐ সংবাদ সম্মেলনটায় ব'সে ব'সে একটা কথা মনে প'ড়ে গেলো," মিলারকে বললেন তিনি, "বুঝলেন, রশম্যান যদি তখন গ্রেপ্তার হয়ে থাকে এবং ফেরারী আসামী হিসাবে যদি তার সনাক্তকরণ হয়ে থাকে তবে জার্মানির তৎকালীন বৃটিশ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের গোচরে আসবেই সে কথা, কেননা তখন জার্মানি এবং অস্ট্রিয়াতে এইসব ব্যাপারে সব ফাইল তিন কপি হয়ে বৃটিশ, আমেরিকান আর ফরাসি কর্তৃপক্ষের কাছে চলে যেতো। লিভারপুলের লর্ড রাসেলের নাম শুনেছেন?"

"না তো," মিলার জানালো।

"সেই সময় যুদ্ধ-অপরাধের সমস্ত মামলাতেই তিনি ছিলেন বৃটিশ ফিল্ডমার্শালের আইন-উপদেষ্টা। পরে তিনি একটা বই লিখেছিলেন, *স্বস্তিকার ওপর আঘাত*। বুঝতেই তো পারছেন কি নিয়ে লেখা। জার্মানিতে সেজন্যে অবশ্য তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেননি, তবে যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক রচনা ছিলো সেটা। নৃশংসতার ওপরে।"

"উনি আইনজীবী?"

"ছিলেন," ক্যাডবেরি বললেন, "খুব ভালো উকিল...দারুণই বলা যায়। সেই জন্যেই তো ওই পদে তাঁকে নেয়া হয়েছিলো। এখন অবসর নিয়ে উইম্বলডনে থাকেন। আমাকে তাঁর এখনো মনে আছে কিনা বলতে পারবো না, তবে একটা পরিচয়পত্র লিখে দিতে পারি আপনাকে।"

"অতোদিন আগের ঘটনা মনে থাকবে তাঁর?"

"থাকতে পারে। এখন অবশ্য বুড়ো হয়ে গেছেন, তবে বয়সকালে তাঁর খ্যাতি ছিলো যে তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডার তো নয় যেনো ফাইলিং ক্যাবিনেট। রশম্যানের মামলা যদি কখনো তাঁর কাছে এসে থাকে অভিযোগপত্র তৈরি করবার জন্যে তো আমি নিশ্চিত যে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি এখনো তাঁর স্মরণে আছে।"

মাথা নেড়ে মিলার চায়ে চুমুক দিলো।

"আমি লন্ডনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি।"

পকেট হাত্ড়ে ক্যাডবেরি একটা খাম বের ক'রে আনলেন।

"চিঠিটা আমি লিখেই রেখেছি।" পরিচয়পত্র মিলারের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "আচ্ছা, তাহলে, আসি। গুডলাক্।" এই বলে ক্যাডবেরি চলে গেলেন। ঠিক চারটার সময় ওয়েরউলফ একটা ঠিকানার খাতা বের ক'রে কী যেনো খুঁজলো। নামটা পেয়ে যেতেই আবার টেলিফোন তুলে বন/বাড গোটেসবার্গ অঞ্চলের একটা

www.boiRboi.blogspot.com

নাম্বার ঘোরালো।

হোটেলে ফিরে এসেই মিলার কোলোন এ্যায়ারপোর্টে টেলিফোন ক'রে পরের দিন অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বরের ফ্লাইটে লন্ডন যাবার জন্যে একটা সিট বুক করলো। ফোন ক'রে আপ্যায়ন ডেস্কের কাছে এসে পৌছাতেই মেয়েটির উজ্জ্বল হাসি হেসে ওয়েটিংরুমের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, "হের মিলার, আপনার অপেক্ষায় একজন ভদ্রলোক ব'সে আছেন।"

জানলার পাশে কুশনে ঢাকা অনেকগুলো চেয়ার। চারটা ক'রে চেয়ার গোল গোল টেবিলের চারপাশে বৃত্তাকারে সাজানো। জানালার কাঁচের ওপাশে বহমান রাইন নদী।

মিলার দেখলো একজন মধ্যবয়সী লোক, কালো গরম কোট পরে, এক হাতে একটা কালো হোমবার্গ আর অন্য হাতে সযত্নে গুটনো ছাতা নিয়ে চেয়ারে ব'সে অপেক্ষা করছে। অবাক হয়ে গেলো সে, এখানে যে আছে সে খবর পেলো কী ক'রে।

"আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?" প্রশ্ন করতেই লোকটা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো।

"হের মিলার?"

"হ্যা,"

"হের পিটার মিলার?"

"হ্যা।"

লোকটা পুরনো আমলের জার্মানদের মতো সামান্য মাথা নাচিয়ে অভিবাদন করলো। "আমার নাম স্মিডট...ডা: স্মিডট।"

"কী করতে পারি বলুন?" মিলার জানতে চাইলো।

একটু কষ্টের হাসি হেসে লোকটা জানালার বাইরে তাকালো। নির্জন চত্বরের উজ্জ্বল আলোকমালার নিচে রাইনের কালো জলরাশি যেনো শোকের মাতম করছে।

"শুনেছি আপনি একজন সাংবাদিক? তাই না? স্বাধীন সাংবাদিক, অত্যন্ত সুদক্ষ।" এবার লোকটা হাসলো, "শুনেছি আপনি নাকি ধৈর্য হারান না কিছুতেই, একবার ধরলে আর ছাড়েন না।"

মিলার নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো লোকটা কখন আসল কথা বলবে।

"আমার কোন কোন বন্ধুবান্ধব বলছিলো আপনি নাকি এখন পুরনো ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করছেন...মানে, বহুদিন আগে যেগুলো ঘটে গেছে। অনেক দিন আগের কথা।"

শক্ত হয়ে গেলো মিলার। মনের মধ্যে ভাবনাগুলো খেলে যাচ্ছে...কে হতে পারে তার সেই বন্ধুবান্ধব যারা তার কাজের কথা জানে? কিন্তু তক্ষুণি মনেও

পড়লো এ আর এমন কি কথা, দেশের সর্বত্রই তো সে রশম্যানের সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে সে।

"হ্যা, কোন এক এডুয়ার্ড রশম্যানের সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি। কি হয়েছে তাতে?" গলার স্বর শক্ত ক'রে তুললো মিলার।

"আচ্ছা...এডুয়ার্ড রশম্যান, বটে! তা আমি ভাবলাম, আমি বোধহয় আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি।" নদী থেকে চোখ দুটো সরিয়ে এনে মিলারের ওপর রাখলো, ঘন কোমল দৃষ্টি। বললো, "রশম্যান মারা গেছেন।"

"তাই নাকি? জানতাম না তো?"

ডাঃ স্মিড্‌ট খুশি হলো। "জানবেন কি ক'রে, আপনার তো জানার কোন প্রশ্নই নেই। কথাটা কিন্তু সত্য। খামোখাই সময় নষ্ট করছেন আপনি।"

মিলার যেনো হতাশ হয়ে পড়লো। "কবে মরেছে বলুন তো?"

লোকটা প্রশ্ন করলো, "তাঁর মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলো জানতে পারেন নি?"

"না। আমি তার সম্বন্ধে শেষ যা জানতে পেরেছি তা হলো এপ্রিল ১৯৪৫-এর ঘটনা। তখনও বেঁচে ছিলো।"

"হ্যা, হ্যা, তখন তো বেঁচেই ছিলো," খবরগুলো জানতে পেরে কৃতার্থ হয়ে গেলো যেনো ডাঃ স্মিড্‌ট, "তার কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান। স্বদেশে অস্ট্রিয়াতে ফিরে যান এবং সেখানেই আমেরিকানদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ১৯৪৫-এরই প্রথমার্ধে মারা যান। তাঁর মৃতদেহ সনাক্তও করেছিলেন তাঁরই পরিচিত কয়েকজন।

"আচ্ছা...অসাধারণ ব্যক্তি তো!" মিলার বললো।

ডাঃ স্মিড্‌ট মাথাটাতা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো। "তো...সত্যি বলতে কী, কেউ কেউ তাই ভাবতো...আমাদের মধ্যে কিছু লোকেরও সেই ধারণা, বুঝলেন?"

"মানে," মিলার এমনভাবে বললো যেনো তার কথার মাঝখানে কোন ছেদ পড়েনি। "যিশুখৃস্টের পর মৃত্যু থেকে জীবন লাভ আর অন্য কারো ভাগ্যে ঘটেনি তো, অতএব অসাধারণ তো বটেই। অস্ট্রিয়ার গ্রাৎসে বৃটিশরা তাকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করেছিলো ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সালে।"

জানালার বাইরে স্তম্ভগুলোর ওপরে তুষার পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছিলো। সেইদিকে তাকিয়ে রইলো ডাক্তার ভদ্রলোক।

"মিলার, ভীষণ বোকামি করছেন আপনি...একেবারেই বোকামি। আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আপনার চেয়ে অনেক বড়, একটু উপদেশ দিচ্ছি আপনাকে, কিছু মনে করবেন না...এই অনুসন্ধানটা ছেড়ে দিন।"

পূর্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় মিলার বললো, "আপনাকে

www.boiRboi.blogspot.com

বোধহয় ধন্যবাদ দেয়া উচিত আমার।"

"উপদেশ যদি গ্রহণ করেন তো দিতে পারেন," ডাক্তার বললো।

"না, আবার আপনি ভুল বুঝছেন," মিলার বললো, "এই বছর অক্টোবরের মাঝামাঝি হামুর্গে নাকি রশম্যানকে দেখা গিয়েছিলো, খবরটা আমি প্রমাণিত ব'লে ধরে নিতে পারিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আপনার কথাই তার প্রমাণ।"

"আবার আমি বলছি, এই অনুসন্ধান যদি আপনি ছেড়ে না দেন তো আপনার পক্ষে সেটা নিতান্তই মূর্খামি হবে।" ডাক্তারের দৃষ্টি আগের মতোই শীতল, তবু তাতে যেনো একটু সামান্য উদ্বেগের ছায়া।

মিলার রেগে গেলো, রাগের উত্তাপ তার মুখে ছড়িয়ে পড়লো।

"হের ডক্টর, আপনাকে দেখে আমি অসুস্থ বোধ করতে আরম্ভ করেছি। আপনি এবং আপনার দলের শয়তানগুলো...আপনারা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছেন! ভদ্রলোকের লোকের মুখোশ পড়ে থাকেন, অথচ আমার দেশের সর্বাঙ্গে শুধু নোংরা কাঁদা ছেটান আপনারা! যতো দিন না আমি তাকে খুঁজে পাই, অনুসন্ধান আমি চালিয়েই যাবো, এ ব্যাপাওে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।"

চলে যেতে উদ্যত হলে বয়স্ক লোকটি তার হাত ধরে থামিয়ে দিলো। মুখোমুখি, দু ইঞ্চিরও কম ব্যবধানে, তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো।

"আপনি তো ইহুদি নন, ঈশ্বরের দোহাই নিয়ে বলুন, আমরা কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি?"

এক ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলো মিলার।

"যদি এখনো তা না জেনে থাকেন, হের ডক্টর, কোনদিনও বুঝতে পরবেন না।"

"হ্যা, আজকালকার ছেলেপেলেরা সবাই একরকম। যা করতে বলা নিষেধ করা হয় তারা তাই করে। কেন বলতে পারেন?"

"কারণ এই যুগের ছেলেরা অমনই হয়, অন্তত আমি তো সেরকমই।"

দৃষ্টি সংকুচিত ক'রে ডাক্তার তাকে দেখলো। "আপনি তো মূর্খ নন মিলার, কিন্তু বোকার মতোই কাজ করছেন। যেনো আপনি ওই সব হাস্যকর জীবদেরই অন্যতম যারা সব কাজে বিবেক নামে কোন একটা অদ্ভূত জিনিসের দোহাই দেয়। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে এরকম হওয়াটা...আমার সন্দেহ আছে, মনে হচ্ছে যেনো এই বিষয়টায় আপনার কোন ব্যক্তিগত কারণ আছে।"

মিলার যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

"হয়তো আছে," বলেই লবি দিয়ে গট্‌গট্ ক'রে হেঁটে ভেতরে চলে গেলো।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ৮

লন্ডনের উইম্বলডন এলাকার একটা নিরিবিলি রাস্তার পাশেই বাড়িটাকে পেয়ে গেলো মিলার। ঠিকানা খুঁজতে বেগ পেতে হয়নি। লর্ড রাসেল নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধ, গায়ে পশমী সোয়েটার, গলায় বো-টাই।

মিলার নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, "আমি কাল বনে যখন মি: অ্যান্টনি ক্যাডবেরির সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছিলাম তখন তিনি আমাকে আপনার নাম জানালেন এবং একটা পরিচয়পত্র দিলেন। আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে, স্যার।"

সিঁড়ির ওপর থেকেই তিনি মিলারের দিকে চেয়ে রইলেন, মুখে স্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাপ। "ক্যাডবেরি? উফ্, মনে করতে পারছি না তো..."

" তিনি একজন বৃটিশ সাংবদিক," মিলার জানালো, "যুদ্ধের পরপরই জার্মানিতে এসেছিলেন। আপনি যখন ডেপুটি জজ-অ্যাডভোকেট ছিলেন, তখন তিনি যুদ্ধ-অপরাধের বিচারগুলোতে তাঁর পত্রিকার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন। জোসেফ ক্রেমার এবং অন্যান্যরা, বেলসেনের ঘটনা...মনে আছে আপনার সেইসব বিচারের কথা..."

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, মনে পড়েছে। হ্যা হ্যা, ক্যাডবেরি, খবরের কাগজের সেই ছেলেটা তো? মনে পড়েছে তাকে। ওহ্, কতোদিন আগের কথা! আরে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ভেতরে আসুন। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা, আমি তো আর আগের মতো যুবক নই। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।"

১৯৬৪-র নববর্ষের দিন। লর্ড রাসেলের পেছনে পেছনে বসার ঘরে চলে এলো মিলার, আসবার পথে হলঘরের হুকে কোটটা ঝুলিয়ে আসলো। ফায়ারপ্লেসে মৃদু আগুন জ্বলছে।

ভুরু উচিয়ে বললেন, "হুম্...একজন নাৎসিকে খুঁজে দিতে সাহায্য করতে হবে? সেইজন্যেই আপনি এসেছেন, অ্যা?" মিলার কিছু বলতে পারবার আগেই লর্ড

www.boiRboi.blogspot.com

রাসেল আবার বললেন, "আরে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন, দাঁড়িয়ে কি কোন কথা হয়?"

আগুনের দু'পাশে দুটো চেয়ারে ওরা ব'সে পড়লো।

কোনরকম ভূমিকা না ক'রে লর্ড রাসেল বললেন, "কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো? তরুণ একজন জার্মান সাংবাদিক নাৎসিদের খুঁজে বেড়াচ্ছে?" এমন সরাসরি প্রশ্ন শুনে মিলার অপ্রস্তুত হয়ে গেলো।

"আমি বরং শুরু থেকে আপনাকে বলি," মিলার বললো।

"হ্যা, তাই বলুন।" আগুনের কাছে রাখা পাইপটা ঠুকে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তামাক ভরলেন, তারপর, মিলার যখন তার কাহিনী শেষ করলো তখন আয়েশ ক'রে তিনি ধুঁয়া ছাড়লেন।

কাহিনীর শেষে লর্ডের কোনরকম প্রতিক্রিয়াই দেখা গেলো না, তাই দেখে মিলার বললো, "আমার ইংরেজি বোধহয় তেমন ভালো নয় –"

লর্ড রাসেল যেনো হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠলেন, "না না, আমার জার্মানের চেয়ে অনেক ভালো। এতোগুলো বছর তো...ভুলে যাই, বুঝলেন।"

"রশম্যানের ব্যাপারটা...?"

"হ্যা, বেশ আকর্ষণীয়। তা আপনি ওকে খুঁজে বের করতে চান, তাই না?"

শেষের প্রশ্নটা আচমকা ছুঁড়ে দিলেন মিলারের দিকে। মিলার দেখলো ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ।

"কারণ আছে অবশ্য," শক্ত গলায় বললো মিলার, "আমার বিশ্বাস তাকে খুঁজে বের ক'রে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে আসা যাবে।"

"আচ্ছা...আমাদের সবারই ওরকমই বিশ্বাস। কিন্তু প্রশ্ন হলো সেটা করা যাবে কি? কখনো কি তা হবে?"

মিলার সোজা জবাব দিলো, যথেষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গেই। "খুঁজে যদি বের করতে পারি, নিশ্চয়ই তার বিচার হবে। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

মিলারের আশ্বাস কিন্তু বৃটিশ লর্ডটির মনে কোন রেখাপাত করলো না। পাইপ থেকে ক্রমান্বয়ে ধুঁয়ার কুণ্ডলী উঠে শুধু ছাদের দিকে চলে যাচ্ছে। নীরব রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। বিরতিটা দীর্ঘায়িত হতে দেখে মিলার জিজ্ঞেস করলো, "প্রশ্ন হচ্ছে, মাই লর্ড, তার কথা কি আপনার মনে আছে?"

চমকে উঠলেন যেনো লর্ড রাসেল।

"মনে আছে?...হ্যা, মনে আছে, অন্তত নামটা। কিন্তু যদি নামটাতে একটা চেহারা বসাতে পারতাম, কিংবা একটা মুখ! বুড়ো মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়, জানেনই তো। আর সে সময় এরকম কতশত লোক ছিলো।"

"আপনাদের সামরিক পুলিশ তাকে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে গ্রাৎসে

www.boiRboi.blogspot.com

বন্দী করেছিলো," মিলার জানালো।

বুকপকেট থেকে রশম্যানের দুটো ছবি বের ক'রে তাঁর হাতে দিলো – একটা সামনাসামনি ছবি, অন্যটা পাশ থেকে তোলা। ছবি দুটো দেখে লর্ড রাসেল চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু ক'রে দিলেন, গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন তিনি।

"হ্যা," অবশেষে বললেন, "চিনতে পেরেছি এতোক্ষণে, মনে পড়েছে। ফাইলটা আমাকে হ্যানোভারে পাঠানো হয়েছিলো কয়েকদিন পরে গ্রাৎস ফিল্ড সিকিউরিটি থেকে। ওখান থেকেই ক্যাডবেরি তার সংবাদ আহরণ করেছিলো, হ্যানোভারে আমাদের অফিস থেকে।"

থমকে দাঁড়িয়ে মিলারের দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, "বললেন যে টউবের তাকে শেষ দেখেছিলো ৩রা এপ্রিল ১৯৪৫-এ, অন্য কয়েকজনের সঙ্গে গাড়ি ক'রে ম্যাগডেবুর্গের ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিকে যেতে?"

"হ্যা, ডায়রিতে তাই লিখেছে।"

"আচ্ছা। তারও আড়াই বছর আগে তাকে ধরেছিলাম। জানেন তখন ও কোথায় ছিলো?"

"না," মিলার বললো।

"একটা বৃটিশ যুদ্ধবন্দী শিবিরে। কি আস্পর্ধা! আচ্ছা, ঠিক আছে মিস্টার, আমি যতোটুকু জানি আপনাকে বলছি..."

এডুয়ার্ড রশম্যান এবং তার অন্যান্য এসএস সহকর্মীদের নিয়ে গাড়িটা ম্যাগডেবুর্গের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসেই দক্ষিণমুখে বাঁক নিয়েছিলো, বাভারিয়া এবং অস্ট্রিয়ার দিকে। এপ্রিল মাস শেষ হবার আগে তারা সবাই কোনরকমে মিউনিখ পর্যন্ত একসঙ্গে আসতে পেরেছিলো। তারপর দলটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। রশম্যানের পরনে ততোদিনে এসে গেছে জার্মান সেনাবাহিনীর জনৈক কোরপোরালের উর্দি, পরিচয়পত্রটা যদিও নিজের নামে, তবুও বিবরণের জায়গায় লেখা ছিলো সে সৈন্যবাহিনীর লোক।

মিউনিখের দক্ষিণে মার্কিনী সৈন্যরা ব্রাভেরিয়ার সর্বত্র তখন জোর টহল দিচ্ছে। বেসামরিক অধিবাসীদের নিয়ে তাদের কোন মাতাব্যথাই নেই, কারণ: গুজব রটেছিলো নাৎসিরা নাকি হিটলারের বার্কটেসগ্যাডেনের বাড়ির আশেপাশে ব্যাভেরিয়-আল্পসের একটি পার্বত্য দুর্গে আশ্রয় নেবে এবং সেখান থেকে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যাবে। প্যাটনের বাহিনীরা তাই ব্যাভেরিয়ায় তখন তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছে, অথচ শ'য়ে শ'য়ে নিরস্ত্র জার্মান সৈনিক যারা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের দিকে তাদের মোটেই লক্ষ্য নেই।

নিশাচরের মতো শুধু রাতে ভ্রমণ ক'রে, দিনের বেলায় কাঠুরিয়াদের কুটিরে বা

www.boiRboi.blogspot.com

খড়ের গাদায় লুকিয়ে থেকে, রশম্যান অবশেষে অস্ট্রিয়ায় এসে পৌছালো। সীমান্তের কোন বালাই নেই; সেই ১৯৩৮ সালে অস্ট্রিয়া অধিকার ক'রে নেবার পর থেকে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সীমারেখা বিলুপ্ত। দক্ষিণের পথ ধরে রশম্যান তার নিজস্ব শহর গ্রাৎসের দিকে চললো। অনেক পরিচিত ব্যক্তি আছে সেখানে, বিপদে যারা আশ্রয় দিতে পারবে তাকে।

ভিয়েনাকে পাশ কাটিয়ে প্রায় পৌছে গিয়েছিলো গ্রাৎসে, কিন্তু পড়বি তো পড় একেবারে বৃটিশ টহল দলের সামনে, ৬ই মে তারিখে। বোকার মতো ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো। রাস্তার পাশে ঝোপের মধ্যে গিয়ে লুকাতেই একঝাক গুলি এসে পড়লো সেখানে। তার মধ্যে একটা সোজা এসে তার বুকে, এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে বেরিয়ে গেলো একটা ফুসফুস ফুটো ক'রে দিয়ে। অন্ধকারে এদিকে-ওদিক কিছুটা খুঁজে বৃটিশ টমিরা দ্রুত এগিয়ে গেলো, ঝোপের মধ্যে কিন্তু আহত রশম্যান পড়েই রইলো, তাকে তারা দেখতেও পেলো না। সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে চলে এলো একটা চাষীর কুটিরে, আধ মাইল দূরে।

তার জ্ঞান তখনো ছিলো। গ্রাৎসের এক পরিচিত ডাক্তারের নাম বললো চাষীটিকে। অন্ধকার রাত আর কারফিউ সত্ত্বেও চাষী চললো সাইকেল ক'রে ডাক্তারকে ডেকে আনতে। তিন মাস ধ'রে বন্ধুবান্ধবেরা তার সেবা করলো, প্রথমে ওই চাষীর কুটিরে তারপর গ্রাৎস শহরেরই একটা বাড়িতে। উঠে হেঁটে চলবার মতো যখন অবস্থা হলো তখন তিন মাস হলো যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেছে, অস্ট্রিয়া এসে পড়েছে চতুঃশক্তির অধিকারে। গ্রাৎস বৃটিশ এলাকার একেবারে মাঝখানে।

প্রত্যেকটি জার্মান সৈন্যকে বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধবন্দী শিবিরে দু'মাস থাকতে হোতো। রশম্যান ভাবলো যে এটাই সুযোগ, এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর নেই। অতএব সে ধরা দিলো। দু'বছর থাকলো ক্যাম্পে – ১৯৪৫-এর আগস্ট পর্যন্ত, অথচ সেই সময়টাতেই বড় বড় এসএস হত্যাকারীর জন্যে তুমুল অনুসন্ধান চলছিলো চারদিকে। রশম্যান কিন্তু পরম নিশ্চিন্তে আছে তখন, যুদ্ধবন্দীর শিবিরে তার অন্য নামঃ ধরা দেয়ার সময়ে সেনাবাহিনীর জনৈক বন্ধুর নাম নিয়েছিলো, যে বেচারা কবেই উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে মারা গেছে। কিন্তু সে খবর আর কে রাখে! হাজার হাজার জার্মান সৈনিক তখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনরকম পরিচয়পত্রও তাদের কাছে নেই, অতএব যে নাম বলছে মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে তাই মেনে নেয়া হচ্ছে। নইলে উপায়ই বা কি! অতো সময় কার...ব্যাপক অনুসন্ধান ক'রে যে দেখবে আর্মি-কোরপোরালটি তার সত্যিকারের নাম দিয়েছে কিনা। তেমন প্রশাসনিক ব্যবস্থাই বা কোথায়? ১৯৪৭-এর গ্রীষ্মে রশম্যান ছাড়া পেয়ে গেলো, ভাবলো বাইরে আর বোধহয় তেমন বিপদ নেই। কিন্তু ভুল করলো সেটাই।

রিগা ক্যাম্প থেকে বেঁচে ফিরে এসেছিলো সে। ভিয়েনার জনৈক অধিবাসীঃ

www.boiRboi.blogspot.com

রশম্যানের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সে নেবেই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিলো সে। লোকটা গ্রাৎসের পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, একবার রশম্যান ফিরে আসুক। আসতেই হবে: কারণ তার বাপ-মা গ্রাৎসে রয়েছে, ছুটিতে এসে ১৯৪৩ সালে যাকে বিয়ে করেছিলো, সেই বৌ হেলা রশম্যানও গ্রাৎসে আছে। রশম্যানের বাড়ি আর তার শ্বশুরবাড়ির ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখলো লোকটা, কখন ফেরে সেই এসএস দুর্বৃত্ত।

মুক্তি পাবার পর গ্রাৎসে শহরের বাইরে গ্রমাঞ্চলেই রয়ে গেলো রশম্যান কিছুদিন, ক্ষেতে দিনমজুরের কাজ করতো। বাড়ি ফিরলো ১৯৪৭-এর ২০শে ডিসেম্বর, ইচ্ছে ছিলো যে বড়দিন কাটাবে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে। বুড়ো লোকটা কিন্তু ওৎ পেতেই ছিলো। যেই দেখলো রশম্যান এদিক-ওদিক দু-একবার তাকিয়ে কড়া নেড়ে টুপ ক'রে ঢুকে গেলো তার বৌয়ের বাড়িতে অমনি লোকটা খবর দেবার জন্য চলে গেলো।

এক ঘন্টার মধ্যে বুড়ো ফিরে এলো, সঙ্গে ফিল্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের দু'জন বৃটিশ সার্জেন্ট। সাজেন্টরা বোধহয় তখনো ঠিক বিশ্বাস করেনি, সন্দেহ ছিলো তাদের। বাড়িটা সার্চ ক'রে রশম্যানকে পাওয়া গেলো খাটের তলায়। ওটাই তার ভুল হয়েছিলো। যদি সাহস ক'রে সমানে এসে দাঁড়াতো, বুক উঁচিয়ে বলতো আমি রশম্যান নই, তবে সার্জেন্টরা হয়তো ভাবতো বুড়োর ভুল হয়েছে। কিন্তু খাটের তলায় লুকোনোতেই সব সন্দেহ প্রমাণিত হলো। ধরে নিয়ে গেলো তাকে। এসএস-এর মেজর হার্ডি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে তাকে সেলে ঢুকিয়ে দিলো। অনুরোধ পাঠানো হলো বার্লিনে: এসএস-এর আমেরিকান ইনডেক্সের জন্যে।

আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে খবর এসে গেলো। সনাক্তকরণ হয়েছে, ছদ্মবেশের বেলুন গেলো ফেঁটে। পটসডামে অনুরোধ গেলো রাশিয়ানদের কাছে, রিগার কীর্তিকলাপ সপ্রমাণ করবার জন্যে তাদের সাহায্য লাগবে। কিন্তু তার আগেই আমেরিকানরা রশম্যানকে কিছুদিনের জন্যে মিউনিখে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করলো, যাতে ডাচাউয়ে গিয়ে সে রিগার আশপাশের অন্যান্য ক্যাম্পগুলোর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারে, যেখানে তখন কিছু এসএস বন্দীর বিচার চলছিলো। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রাজি হয়ে গেলো।

১৯৪৮-এর ৮ই জানুয়ারি ভোর ছটায় গ্রাৎস স্টেশনে রশম্যানকে সালজবুর্গ এবং মিউনিখ গামী ট্রেনে চড়িয়ে দেওয়া হলো। পাহারায় দু'জন সার্জেন্ট – একজনর রয়্যাল মিলিটারি পুলিশের আর একজন ফিল্ড সিকিউরিটির।

লর্ড রাসেল পায়চারি থামিয়ে অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে পাইপ ঠুকতে লাগলেন।

"তারপর কি হলো?" মিলার উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

"পালিয়ে গেলো।"

www.boiRboi.blogspot.com

"কি?"

"পালিয়ে গেলো। চলন্ত ট্রেনের পায়খানার জানালা থেকে লাফ মেরেছিলো। ট্রেনে উঠেই ব'লে দিয়েছিলো যে জেলের খাবার খেয়ে খেয়ে তার পেটের অসুখ হয়ে গেছে। পাহারাদার দু'জন যখন বুঝতে পেরেছে ততোক্ষণে তুষারের ভেতরে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে কে জানে। খুঁজে আর পায়নি তাকে। অনুসন্ধান করা হয়েছিলো অবশ্য, সেনাবাহিনীও পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু ওই পর্যন্ত – পাওয়া আর গেলো না। তুষারে ঢাকা মাঠপ্রান্তর পেরিয়ে নিশ্চয়ই চ'লে গিয়েছিলো নাৎসিদের যারা গোপনে গোপনে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে তাদের সন্ধানে। তার এক বছর চার মাস পরে, ১৯৪৯-এর মে-তে, আপনাদের নতুন প্রজাতন্ত্র কায়েম হলো, আমরাও আমাদের সব ফাইলপত্র বন-এর কাছে দিয়ে দিলাম।"

লেখা শেষ ক'রে মিলার নোটবই নামিয়ে রাখলো।

"আচ্ছা, পরের ঘটনাগুলো কোত্থেকে জানা যায় বলুন তো?"

লর্ড রাসেল গাল ফুলিয়ে সশব্দে হাওয়া ছাড়ালেন।

"আপনাদের দেশেই, আপনাদের লোকদের কাছ থেকেই বোধহয়। রশম্যানের জীবনী আপনি পেলেন, জন্ম থেকে ৮ই জানুয়ারি ১৯৪৮ পর্যন্ত, বাকিটুকু জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে আছে?"

"কোন কর্তৃপক্ষ?" প্রশ্ন করেই কিন্তু মিলার ভড়কে গেলো, না জানি কী শুনতে হয়।

"রিগার ব্যাপার যখন, তখন হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস বলেই মনে হয়।"

"আমি সেখানে গিয়েছিলাম।"

"বিশেষ কোন সাহায্য পাননি?"

"বিন্দুমাত্রও না।"

লর্ড রাসেল হাসলেন। "বটে! অবাক হচ্ছি না কিন্তু...তা আপনি লুডভিগসবুর্গে গিয়েছিলেন?"

"হ্যা, যথেষ্ট সৌজন্য দেখালো, কিন্তু সাহায্য পেলাম না মোটেই। রীতিবিরুদ্ধ কাজ তো," মিলার বললো।

"ও! তাহলে অনুসন্ধানের সরকারী সুত্রগুলো তো শেষ। হ্যা, তা আর একজন রয়েছে, ওই একজন মাত্রই। সিমন উইজেনথালের নাম শুনেছেন?"

"উইজেনথাল? চেনা-চেনা মনে হচ্ছে কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারছি না।"

ভিয়েনায় থাকেন তিনি। ইহুদি: গোড়াতে পোলিশ গ্রালিসিয়া থেকে এসেছিলেন। চার বছর কাটিয়েছেন নানা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, সব নিয়ে বারোটাতে। ফেরারী নাৎসি অপরাধীদের খুঁজে বের করাই তাঁর এখন সাধনা হয়ে

দাঁড়িয়েছে। মারদাঙ্গাটাঙ্গা নয় অবশ্য। শুধু খবর আহরণ ক'রে বেড়ান, যতোখানি সাধ্য। তারপর যখন নিশ্চিত হয় যে, একজন ফেরারীকে পাওয়া গেছে, অন্য নামের অন্তরালে, পুলিশকে খবর দেন তারা। যদি কিছু না করে, সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সব জানিয়ে দেন। সুতরাং জার্মানি বা অস্ট্রিয়া কোন দেশেরই আমলাতন্ত্র তাঁকে বিশেষ সুনজরে দেখে না। উনি তো বলেনই যে নাৎসি হত্যাকারীদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট ঢিলেমি হচ্ছে, খুঁজে বের করা তো দুরের কথা। প্রাক্তন এসএস তাঁর সাহসে ভীত হয়ে অন্তত বার দুয়েক তাঁকে খুন করবার চেষ্টা করেছে; সরকারী আমলারা তাঁর ওপর বিরক্ত, শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না তাদেরকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁকে যথেষ্ট মান্য করে, যতোদূর সম্ভব সাহায্য ক'রে থাকে তারা।"

"হ্যা, এখন মনে পড়েছে। অ্যাডলফ আইখম্যানকে উনিই খুঁজে বের করেছিলেন, তাই না?"

ঘাড় নাড়লেন লর্ড রাসেল। "হ্যা, উনিই সনাক্ত করেছিলেন বুয়েনোস আইরিসে রিকার্ডো ক্লেমেন্ট নামে যে বাস করছে সেই আইখম্যান। তারপর ইস্রায়েলিরা তাকে তাদের কব্জায় নিয়ে নিলো। আরো বহু, প্রায় কয়েক শো নাৎসি অপরাধীকে তিনি খুঁজে বের করেছেন। আপনার এডুয়ার্ড রশম্যান সম্বন্ধে যদি আরো কিছু জানার থাকে তো তিনিই জানবেন।"

"আপনি চেনেন তাঁকে," মিলার প্রশ্ন করলো।

"হ্যা," লর্ড রাসেল ঘাড় নাড়লেন, "আপনাকে একটা চিঠি দিচ্ছি আমি। বহু লোক আসে তাঁর কাছে খবরের প্রত্যাশায়, তাই চিঠি দিলে সুবিধা হবে।"

লেখার টেবিলে গিয়ে নিজের প্যাডের একটা কাগজ নিয়ে খস্‌খস্ ক'রে চিঠি লিখলেন। নিঁপুণভাবে সেটা ভাঁজ ক'রে খামে পুরে বন্ধ ক'রে দিলেন।

"আচ্ছা, গুড লাক; আপনার সৌভাগ্যের দরকার হবে মিস্টার। গুডবাই!"

মিলার তাঁর সাথে করমর্দন ক'রে বেরিয়ে এলো।

পরদিন সকালে মিলার বিই-এর ফ্লাইটে ক'রে কোলোনে ফিরে এলো। নিজের গাড়িটাকে পার্কিং প্লেস থেকে তুলে প্রধান সড়ক ধ'রে চললো স্টুটার্ট-মিউনিখ-সালজবুর্গ-লিনৎস হয়ে ভিয়েনার দিকে। ভিয়েনায় এসে যখন পৌছালো বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। তারিখ ৪ঠা জানুয়ারি। হোটেল-টোটেলে না ওঠে সোজা শহরের মাঝখানে এসে রুডলফ স্কয়ারের খোঁজ করলো।

সাত নম্বর বাড়িটা অনায়াসেই পেয়ে গেলো। ভাড়াটেদের নাম তালিকায় দেখলো তিন তলার 'ডকুমেন্টেশান সেন্টার'। সিড়ি বেয়ে উঠে রঙচটা একটা দরজাটায় করাঘাত করলো। দরজা খুলে দেবার আগে মনে হলো কে যেনো ছিদ্র দিয়ে চোখ রেখে তবে তালা খুলেছে। স্বর্ণকেশী এক সুন্দরী এসে দাঁড়ালো তার সামনে।

www.boiRboi.blogspot.com

"বলুন?"

"আমার নাম মিলার। হের উইজেনথালের সঙ্গে দেখা করতে চাই, সঙ্গে ক'রে একটা পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছি।"

চিঠিটা বের ক'রে মেয়েটির হাতে দিলো। মেয়েটি একটু মুচ্‌কি হেসে তাকে অপেক্ষা করতে ব'লে ভেতরে চলে গেলো।

কয়েক মিনিট পরে ফিরে এসে তাকে ভেতরে আসতে বললো। দরজা পেরিয়ে একটা হলওয়ে। মেয়েটির পেছনে পেছনে সেই হলওয়ের শেষ মোড় ঘুরে ফ্ল্যাটটার পেছনের অংশে এসে পড়লো। ডানদিকে একটা খোলা দরজা। ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিমন উইজেনথাল অভ্যর্থনা জানালেন, "আসুন।"

মিলার মনে মনে তাঁর যে ছবি এঁকে রেখেছিলো, দেখলো বাস্তবে তার চেয়ে মানুষটা বৃহদাকারের। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, বলিষ্ঠ দেহ, মোটা টুইডের কোট পরা। একটুখানি ঝুঁকে রয়েছেন, যেনো সব সময়েই কোন না কোন কাগজ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। লর্ড রাসেলের চিঠিটা তাঁর হাতে ধরা ছিলো।

অপরিসর অফিস-ঘরটি কাগজপত্রে প্রায় ঠাঁসা। একটা দেয়াল জুড়ে, ছাদ পর্যন্ত উঁচু, অনেকগুলো তাক। প্রত্যেকটা তাকই বইয়ে ভরতি। সামনের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে নানারকম প্রশংসাপত্র – এসএস কর্তৃক নির্যাতিত মানুষদের একাধিক প্রতিষ্ঠানের কৃতজ্ঞতা-চিহ্ন। পেছনে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো আছে একটা লম্বা সোফা, সেটাও বইয়ে বোঝাই। দরজার বাম পাশে ছোট্ট জানালা, সেটা দিয়ে নিচের প্রাঙ্গণ দেখা যায়। জানালার অন্য পাশে রয়েছে ডেস্ক, তার সামনে অভ্যাগতদের চেয়ারে বসলো মিলার। ভিয়েনার নাৎসি-শিকারীটি ডেস্কের পেছনের চেয়ারে ব'সে লর্ড রাসেলের চিঠিটা আরেকবার পড়লেন।

"লর্ড রাসেল লিখেছেন আপনি নাকি একজন ভুতপূর্ব এসএস হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?" কোন ভনিতা না করেই শুরু করলেন তিনি।

"হ্যা।"

"নামটা জানতে পারি কি?"

"রশম্যান, ক্যাপ্টেন এডুয়ার্ড রশম্যান।"

সিমন উইজেনথাল ভুরু উচিয়ে শিসের মতো শব্দ ক'রে শ্বাস ছাড়লেন।

"তার নাম শুনেছেন নাকি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"রিগার কশাই? আমার প্রথম পঞ্চাশজন দাগী লোকদের মধ্যে অন্যতম সে," উইজেনথাল বললেন, "কিন্তু তার সম্বন্ধে আপানার আগ্রহ কেন জানতে পারি কি?"

মিলার সংক্ষেপে বলতে চাইলো কিন্তু শ্রোতা আরো বেশি জানতে চায়।

"উহু, শুরু থেকে বলুন," উইজেনথাল বললেন, "এই ডায়রিটার ব্যাপার কি?"

অগত্যা পুরো কাহিনী বলতে হলো মিলারকে। লুডভিগসবুর্গ, ক্যাডবেরি এবং

www.boiRboi.blogspot.com

লর্ড রাসেলের পর এ নিয়ে চতুর্থবার হলো। প্রত্যেকবারই দীর্ঘতর হয়ে যাচ্ছে। লর্ড রাসেলের দেয়া খবরটুকু জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমি জানতে চাই তারপর কি হলো? ট্রেন থেকে লাফিয়ে প'ড়ে কোথায় গেলো লোকটা?"

জানালা দিয়ে দূরের ফ্ল্যাটগুলোর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন উইজেনথাল। তুলোর মতো নরম তুষারকণাগুলো গিয়ে জমছে তিন তলার নিচে আঙিনার ওপর।

কিছুক্ষণ পর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "ডায়রিটা আছে আপনার কাছে?" নিচু হয়ে বৃফকেস খুলে মিলার সেটা বের করলো। টেবিলের রাখতে রাখতে দেখলো খাতাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উইজেনথাল। "অপূর্ব, অদ্ভুত!" যেনো শব্দ দুটো তাঁর অজান্তেই বেরিয়ে এলো কণ্ঠ থেকে। পরক্ষণেই মিলারের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন, "ঠিক আছে, আপনার কাহিনী সত্যি ব'লে মেনে নিলাম।"

"কেন? সন্দেহ ছিলো নাকি?"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে সিমন উইজেনথাল জানালেন, "সন্দেহ তো থাকতেই পারে, হের মিলার। আপনার কাহিনী যে খুবই আশ্চর্যের। এখনো তো আমি বুঝতে পারছি না রশম্যানকে খুঁজে বের করবার পেছনে আপনার উদ্দেশ্যটা কি।"

শূন্যে দু হাত ছুঁড়ে মিলার বললো, "আমি সাংবাদিক আর...কাহিনীটায় আকর্ষণ রয়েছে।"

"কিন্তুএ-কাহিনী কোনদিনই প্রেসের কাছে বেঁচতে পারবেন না। তার জন্যে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় নষ্ট করবেন কেন!...উহু!...আপনি কি নিশ্চিত ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ নেই এর পেছনে?"

মিলার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো। "আপনি দেখছি *কমেট* পত্রিকার হফম্যানের মতো কথা বলছেন। সেও ঠিক এই একই প্রশ্ন করেছিলো। কিন্তু থাকবে কেন বলুন? আমার বয়স মাত্র উনত্রিশ; এসব ঘটনা তো আমাদের অনেক আগেই ঘটে গেছে।"

"তা বটে।" উইজেনথাল ঘড়িতে চোখ বুলিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। "ওহ্, পাঁচটা বেজে গেছে। শীতের সন্ধ্যাগুলোতে আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই বুঝলেন, বৌ একা থাকে। ডায়রিটা নিয়ে যাচ্ছি, রাতে প'ড়ে দেখবো।"

"বেশ তো নিয়ে যান।"

"আচ্ছা, তাহলে আপনি সোমবার সকালে আসুন। রশম্যান সম্বন্ধে যতোটুকু জানি আপনাকে জানাবো।"

সোমবার বেলা দশটায় এসে মিলার দেখলো সিমন উইজেনথাল তাঁর দপ্তরে

www.boiRboi.blogspot.com

একগাদা চিঠি নিয়ে বসে আছেন। মিলার আসতেই বসার চেয়ারটা দেখিয়ে একমনে খামগুলোর প্রান্ত সযত্নে কেটে কেটে চিঠিগুলো বের করতে লাগলেন।

"আমি ডাকটিকিট জমাই তো তাই খামগুলো নষ্ট করি না।" এই ব'লে আবার কাজে মন দিলেন।

কয়েক মিনিট পরে সব চিঠিটিঠি খোলা হয়ে গেলে, মিলারের দিকে চেয়ে বললেন, "কাল রাতে বাড়িতে ডায়েরিখানা পড়লাম...অদ্ভুত।"

"অবাক হয়ে গেছেন?" মিলার জানতে চাইলো।

"না, অবাক হইনি। আমরা প্রায় সবাই ওই একই ভোগান্তি ভুগেছি, একটু-আধটু ব্যতিক্রম ছাড়া। তবে কাহিনীর বর্ণনা অত্যন্ত নিঁপুণ, টউবের খুব ভালো সাক্ষী হতে পারতো। আনুপূর্বিক সবকিছু লক্ষ্য করেছিলো, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি। লিখেও রেখেছিলো সব – সেই সময়েই। জার্মান বা অস্ট্রিয়ান আদালতে দণ্ড পাবার পক্ষে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে তো এখন মৃত।"

কয়েক মুহূর্ত ধরে বিষয়টার অনুধাবন করলো মিলার। তারপর চোখ তুলে তাকালো।

"দেখুন, হের উইজেনথাল, আমি আজ পর্যন্ত কোন নির্যাতিত ইহুদির সঙ্গে এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পাইনি, আপনিই প্রথম। তাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাই – টউবেরের ডায়রিতে লেখা একটা কথা আমাকে খুব আশ্চর্য করেছে, সে বলছে যে যৌথ অপরাধ ব'লে কোন জিনিস নেই। কিন্তু আমাদের, প্রতিটা জার্মানকে, বিশ বছর ধ'রে বোঝানো হয়েছে যে আমরা সবাই অপরাধী। আপনার কি মত এই বিষয়ে?"

"টউবের ঠিক কথাই বলেছে," নাৎসি শিকারীটির কণ্ঠ নিরুত্তাপ।

"তা কি ক'রে বলছেন, যখন আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছি?"

"এই কারণে যে, ব্যক্তিগতভাবে আপনি সেখানে ছিলেন না, আপনি নিজে কাউকে হত্যা করেননি। টউবের ঠিক কথাই বলেছে, সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হলো আসল অপরাধীদেরকে বিচারের জন্যেও আনা হয়নি।"

"তাহলে," উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মিলার, "এতোগুলো মানুষকে হত্যা করবার জন্যে কে আসলে দায়ি?"

সিমন উইজেনথাল তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। "এসএস-এর বিভিন্ন শাখাগুলোর কথা আপনি জানেন? তাদের সেইসব বিভাগের কথা যাদের ওপর লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করার ভার ছিলো?"

"না।"

"তবে শুনুন। রাইখের অর্থনৈতিক প্রশাসনের সদর দপ্তরের নাম শুনেছেন? যাদের ওপর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ওইসব হত্যভাগ্যকে যতোরকমভাবে সম্ভব হয়

শোষণ করবার দায়িত্ব দেয়া ছিলো?"

"হ্যা, ও রকম কিছু তো পড়েছি।"

হের উইজেনথাল বললেন, "তাদের কাজটা ছিলো গোটা প্রকল্পটার মাঝখানের কাজ।

"বাকি কাজগুলোর মধ্যে ছিলো দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে থেকে বাছাই করা, হত্যার জন্যে যারা চিহ্নিত তাদের জড়ো করা, তাদের পরিবহণ এবং তাদের অর্থনৈতিক শোষণের পর একেবারে শেষ ক'রে ফেলা। এই কাজগুলো ভার ছিলো আরএসএইচ-এর ওপর – রাইখের নিরাপত্তার সদর দপ্তর। এরাই আসলে ওই লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিলো। দপ্তরটার নামের মধ্যে 'নিরাপত্তা' কথাটার ব্যবহার হয়েছিলো নাৎসিদের এক অদ্ভুত ধারণা থেকে যে ওই হতভাগ্য মানুষগুলো রাইখের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে, অতএব ওদের কাছ থেকে রাষ্ট্রকে সাবধানে থাকতে হবে। আরএসএইচ-এর অন্যান্য কাজের মধ্যে ছিলো ওদের একসঙ্গে জড়ো করা, জিজ্ঞাসাবাদ করানো, কনসেনট্রেশন শিবিরগুলোতে রাইখের অন্যান্য শত্রুদের অবরুদ্ধ ক'রে রাখা, যেমন কম্যুনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট, লিবারেল কোয়েকার বা সেইসব সাংবাদিক বা যাজক যারা সন্দেহজনক কথা-টথা বলতো, দখলে-আনা দেশগুলোর প্রতিরোধ যোদ্ধাদের, এবং পরে সেনাবাহনীর কিছু অফিসারকেও, যেমন ফিল্ড-মার্শাল এরউইন রোমেল এবং অ্যাডমিরাল উইলহেলম ক্যানারিস – এই দু'জনকেই তো হিটলার-বিরোধী মনোভাবের জন্য হত্যা করা হয়েছিলো।

"আরএসএইচ-এর ছয়টা বিভাগ ছিলো, প্রত্যেকটাকে বলা হোতো অ্যামট্। এক নম্বর অ্যামটের কাজ ছিলো প্রশাসন এবং কর্মসংস্থান; দু'নম্বরের, অর্থ ও প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা। তিন নম্বর অ্যামট্ ছিলো ভয়াবহ – নিরাপত্তা ফৌজ এবং নিরপত্তা পুলিশ। নেতৃত্ব ছিলো রাইনহার্ড হেইড্রিখের ওপর; ১৯৪২ সালে প্রাগে আততায়ীর হাতে সে নিহত হলে তিন নম্বর অ্যামটের ভার পড়ছিলো আর্নস্ট কালটেন ব্রুনারের ওপর, পরে মিত্রশক্তি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এই দল দুটোই যতোরকম যন্ত্রণা দেবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলো যাতে সন্দেহভাজন ব্যক্তি মুখ খোলে; জার্মানির ভেতরে বা দখল ক'রে নেয়া দেশগুলোতে যথেচ্ছ প্রয়োগ হোতো ওইসব উদ্ভাবনের।

"চার নম্বর অ্যামট ছিলো গেস্টাপো, যার নেতা ছিলো অ্যাডলফ আইখম্যান, যাকে আর্জেন্টিনা থেকে অপহরণ ক'রে এনে ইস্রায়েলিরা জেরুজালেমে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো। অ্যামট পাঁচ হলো অপরাধীদের পুলিশ আর অ্যামট ছয় বিদেশে ইনটেলিজেন্সের কাজকর্ম করতো।

"তিন নম্বর অ্যামটের প্রধান হেইড্রিখ এবং পরে তার উত্তরাধিকারী কালটেন ব্রনারের হাতে সামগ্রিকভাবে আরএসএইচ-এর নেতৃত্ব ছিলো। এদের দু'জনের

www.boiRboi.blogspot.com

সময়েই সহকারী নেতা ছিলো এক নম্বর অ্যামটের প্রধান এসএস-এর তিন-তারকাখচিত জেনারেল ব্রুনো স্ট্রেখেনবাখ। হাম্বুর্গে সে এখন একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে খুব উঁচু বতনের চাকরি করে, ফোগেলউইডে থাকে সে।

"কাজেই অপরাধ যদি নির্ধারিত করতে হয়, তবে বেশির ভাগ দায়িত্বই এসএস-এর এই দুটি বিভাগের ওপর এসে পড়ে; তার সংখ্যাও কয়েক হাজারেই সীমাবদ্ধ। বর্তমান জার্মানির লক্ষ-কোটি মানুষের ওপর দায়িত্ব মোটেও বর্তায় না। জার্মানির সমগ্র ছয় কোটি মানুষের ওপর এই অপরাধের যৌথ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রথমে এসেছিলো মিত্রশক্তির কাছ থেকেই, তবে এসএস-এর প্রাক্তন সদস্যদের পক্ষে খুব সুবিধা হয়ে গেলো তাতে। কেননা যতোদিন যৌথ-দায়িত্বের কলঙ্ক নিয়ে জার্মানিরা বেঁচে থাকবে, ততোদিন কেউ আর স্বতন্ত্রভাবে আসল অপরাধীদের খুজে বেড়াবে না, বেড়ালেও তেমন কিছু চেষ্টা করবে না। কাজেই এসএস-এর আসল খুনিরা আজও যৌথ-অপরাধের তত্ত্বের নিচে অনায়াসে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।"

মিলার ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু মাথা ঘুরে যায় ওর, এতো লোক! প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ। তাদের প্রত্যেককে একক ব্যক্তি হিসাবে ভেবে নেয়া কঠিন। তার চেয়ে বরং হাম্বুর্গ শহরের বৃষ্টিভেজা রাস্তায় স্ট্রেচারে শায়িত মৃতদেহটার সম্বন্ধে চিন্তা করা অনেক সহজ।

"টউবের আত্মহত্যার কারণ যা দর্শিয়েছে," মিলার প্রশ্ন করলো, "তা বিশ্বাস করেন আপনি?"

দুটো সুন্দর আফ্রিকান স্ট্যাম্প নিবিষ্ট হয়ে দেখতে দেখতে হের উইজেনথাল বললেন, "হ্যা...অপেরার সিঁড়িতে সে রশম্যানকে দেখেছে একথা কেউই বিশ্বাস করবে না বলে যে ভেবেছিলো তা সত্যি।"

"কিন্তু পুলিশের কাছেও তো যায়নি," মিলার বললো।

আরেকটা খাম উল্টেপাল্টে দেখতে থাকেন সিমন উইজেনথাল। একটু পরে বলে উঠলেন, "না, যায়নি। আইন অনুসারে অবশ্য যাওয়াই উচিত ছিলো। তবে তাতে যে কিছু লাভ হোতো তা আমি মনে করি না। অন্তত হাম্বুর্গে নয়।"

"কেন, হাম্বুর্গ কি দোষ করলো?"

"আপনি সেখানকার প্রাদেশিক অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিসে গিয়েছিলেন না?" মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইলেন উইজেনথাল।

"হ্যা, তারা এমন কিছু সাহায্য করেনি।"

উইজেনথাল চোখ তুলে চাইলেন।

"হাম্বুর্গের অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস সম্বন্ধে আমাদের কিছু নিজস্ব ধারণা আছে। ধরুন, টউবেরের ডায়রিতে যার নাম আছে এবং আমিও যার নাম একটু

www.boiRboi.blogspot.com

আগেই করলাম...গেস্টাপো প্রধান এবং এসএস জেনারেল ব্রুনো স্ট্রেখেনবাগ, মনে পড়ছে নামটা?"

"নিশ্চয়ই! কি হয়েছে তার?"

জবাব দিতে গিয়ে ডেস্কের ওপরে একগাদা কাগজ থেকে খুঁজে একটা কাগজ বের ক'রে আনলেন উইজেনথাল। কাগজটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তার পরিচয় হলো নথি নং ১৪১ জেএস-৭৪৭/৬১। শুনতে চান তার কথা?"

"বলুন, আমার সময় আছে," মিলার জানালো।

"আচ্ছা। তবে শুনুন। যুদ্ধের আগে হাম্বুর্গে গেস্টাপো-প্রধান। ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছিলো এসডি এবং এসপি-তে, অর্থাৎ আরএসএইচ-এর নিরাপত্তা বাহিনী এবং নিরাপত্তা পুলিশ বিভাগে। ১৯৩৯ সালে নাৎসি-অধিকৃত পোল্যান্ডে নির্মূল-বাহিনী সংগঠন করে। ১৯৪০-এ সমগ্র পোল্যান্ডের মধ্যে এসএস-এর এসডি এবং এসপি বিভাগের অধিকর্তা হয়; তথাকথিত সাধারণ সরকারের নেতা হয়ে ক্র্যাকাউ-এ দপ্তর খোলে। সেই সময়ে পোল্যান্ডে এসডি-এ এসপি বিভাগ থেকে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিলো, বিশেষত তাদের 'এবি অভিযান' দ্বারা।

"১৯৪১-এর গোড়ায় বার্লিনে ফিরে আসে; পদোন্নতি হয়ে এসডি'র কর্মীসংস্থানে প্রধান হয়। সেইটা হলো আরএসএইচ-এ তিন নম্বর অ্যামট। তার ওপরওলা ছিলো রাইনহার্ড হেইড্রিখ, সে ছিলো সহকারী। রুশ আক্রমণের অল্প কয়েকদিন আগেই সেনাবাহিনীর পেছনে পেছনে যাবার জন্যে নির্মূল-বাহিনী গড়ে তুললো। স্টাফের কর্তা হিসাবে নিজেই কর্মী বাছাই করলো এসডি শাখা থেকে।

"আবার পদোন্নতি হলো। এবারে আরএসএইচ-এ বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে দ্বিতীয়, ঠিক নেতার নিচেই। প্রথমে কিছুদিন তার ওপরওলা ছিলো হেইড্রিখ; ১৯৪২ সালে যখন প্রাগে চেক প্রতিরোধ সংগ্রামীদের গুপ্তঘাতকের হাতে সে নিহত হলো তখন লিদিসে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে প্রতিশোধ নেয়া হয়। তারপর নেতা হলো আর্নস্ট কালটেনব্রুনার। তার নিচেও সহকারী হয়ে রইলো সে। অতএব যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত নাৎসি অধিকৃত পূর্বাঞ্চলে এসডি বিভাগগুলোর সংগঠন এবং সমস্ত ভ্রাম্যমান নির্মূল-বাহিনী গড়ে তোলার সার্বিক দায়িত্ব ছিলো তারই ওপর।"

"এখন সে কোথায়?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"হাম্বুর্গে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, বাতাসের মতোই মুক্ত," উইজেনথাল জানালেন।

মিলার হতবাক হলো। "কি বলেন! তাকে গ্রেপ্তার করেনি?"

"কে করবে?"

"কেন হাম্বুর্গের পুলিশ?"

উত্তর না দিয়ে উইজেনথাল তাঁর সেক্রেটারিকে মোটা একটা ফাইল আনতে

www.boiRboi.blogspot.com

বললেন যার ওপরে লেখা 'বিচার-বিভাগ–হাম্বুর্গ'। ফাইল থেকে একট কাগজ বের ক'রে সেটাকে ঠিক মাঝ বরাবর লম্বালম্বি ভাঁজ ক'রে মিলারের সামনে ধরলেন। মিলার দেখলো লেখার দিকটাই ওপরে আছে।

"এই নামগুলো চেনেন?" উইজেনথাল বললেন।

ভুরু কুঁচকে দশটা নাম পড়ে নিলো মিলার।

"নিশ্চয়ই," সে বললো, "আমি কয়েক বছর ধরে হাম্বুর্গে পুলিশ রিপোর্টারের কাজ করেছি। এরা তো সবাই হাম্বুর্গের বড় বড় পুলিশ অফিসার। কেন?"

"কাগজটা ভাঁজ খুলে দেখুন," উইজেনথাল বললেন।

খুলতেই মিলার দেখে লেখা রয়েছে :

নাম	নাৎসি পার্টি নং	এসএস নং	র‍্যাংক	পদোন্নতির তারিখ
ক	—	৪,৫৫,৩৩৬	ক্যাপ্টেন	১. ৩ . ৪৩
খ	৫৪,৫১,১৯৫	৪,২৯,৩৩৯	প্র. লেফট	৯. ১১. ৪২
গ	—	৩,৫৩,০০৪	প্র. লেফট	১. ১১. ৪১
ঘ	৭০,৩৯,৫৬৪	৪,২১,১৭৬	ক্যাপ্টেন	২১. ৬. ৪৪
ঙ	—	৪,২১,৪৪৫	প্র. লেফট	৯. ১১. ৪২
চ	৭০,৪০,৩০৮	১,৭৪,৯০২	মেজর	২১. ৬. ৪৪
ছ	—	৪,২৬,৫৫৩	ক্যাপ্টেন	১. ৯. ৪২
জ	৩১,৩৮,৭৯৮	৩,১১.৮৭০	ক্যাপ্টেন	৩০. ১. ৪২
ঝ	১৮.৬৭.৯৭৬	৪,২৪.৩৬১	প্র. লেফট	২০. ৪. ৪৪
ঞ	৫০,৬৩,৩৩১	৩,০৯,৮২৫	মেজর	৯. ১১. ৪৩

চোখ তুলেই আর্তনাদ ক'রে ওঠে মিলার, "হায় যিশু!"

"এখন বুঝলেন তো হাম্বুর্গের রাস্তায় কেন আজো একজন এসএস লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবাধে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে?"

মিলার আবার তালিকাটির দিকে তাকিয়ে দেখলো, বিশ্বাস করতে যেনো কষ্ট হচ্ছে।

"সেইজন্যেই ব্রান্ডট বলেছিলো যে প্রাক্তন এসএস-দের সম্বন্ধে খোঁজখবর নেয়ার কাজে হাম্বুর্গের পুলিশদের বিশেষ উৎসাহ নেই।"

"স্বাভাবিক," উইজেনথাল বললন, "অ্যাটর্নি-জেনারেলের দপ্তরও তেমন উৎসাহী নয়। তাদের অফিসে একজন উকিল আছে যারা এ বিষয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ, কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল থেকে তাকে বরখাস্ত করবার অনেক চেষ্টা হয়েছে।"

সুন্দরী সেক্রেটারি দরজা কাছে এসে জানালো, "চা, না কফি?"

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর মিলার আবার ফিরে এলো। সিমন উইজেনথাল টেবিলে তাঁর সামনে অনেকগুলো কাগজটাগজ ছড়িয়ে ব'সে ছিলেন। মিলার তার চেয়ারটায় ব'সে, নোটবই বের ক'রে অপেক্ষা করতে থাকলো।

সিমন উইজেনথাল তারপর বলতে শুরু করলেন রশম্যানের কাহিনী, ৮ই জানুয়ারি ১৯৪৮ থেকে।

বৃটিশ ও আমেরিকান কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিলো যে ডাচাই-এ সাক্ষ্যদানের পর রশম্যানকে জার্মানির বৃটিশ এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে, সম্ভবত হ্যানোভারে। যতোদিন না তার বিচার সেখানে শেষ হয় ততোদিন সে সেখানে থাকবে; বিচারে তার ফাঁসি ছিলো অবধারিত। গ্রাৎসের কয়েদখানায় থাকবার সময়েই সে পালিয়ে যাবার মতলব করছিলো।

অস্ট্রিয়ায় তখন নাৎসিদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্যে একটা প্রতিষ্ঠান কাজ করতো, তাদের নাম ছিলো 'ছয়মাথা তারা'। ইহুদিদের প্রতীক ষষ্ঠশীর্ষ-তারকার সঙ্গে এর কোন মিল ছিলো না। নামটা দেয়া হয়েছিলো শুধুই এই কারণে যে অস্ট্রিয়ার দুটি বড় শহরে ছিলো এদের প্রভাব। রশম্যান তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলো।

৮তারিখে ভোরে রশম্যানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে গ্রাৎস স্টেশনে নিয়ে গিয়ে একটা অপেক্ষমান ট্রেনে তুলে দেয়া হলো। কামরায় ওঠার পর মিলিটারি পুলিশ সার্জেন্ট এবং ফিল্ড সিকিউরিটি সার্জেন্টের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়েছিলো। সামরিক পুলিশের লোকটা বলেছিলো যে রশম্যানের হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে রাখা হোক, কিন্তু অন্য লোকটা সেটা খুলে দেবার পক্ষে ছিলো।

রশম্যান যখন বললো যে জেলের খাবার খেয়ে তার পেটের অসুখ হয়েছে, পায়খানায় যেতে হবে তাকে, তখন হাতকড়ি খুলে ফেলতেই হলো। সার্জেন্টদের মধ্যে একজন দরজার বাইরের অপেক্ষা করলো যতোক্ষণ না শেষ হয়। দু'পাশে তুষারঢাকা মাঠ-ঘাট, তারই মাঝে ঝক্‌ঝক্ ক'রে ট্রেন চললো। তিন-তিনবার রশম্যান গেলো পায়খানায়। নিশ্চয়ই সেসময় সে পায়খানার জানালাটা জোর ক'রে খুলে ফেলেছিলো যাতে ওপরে নিচে ওঠানামা করতে পারে কামরার অন্যান্য জানালাগুলোর মতো।

রশম্যান জানতো মোটরে ক'রে যে সালজবুর্গে ওকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেয়া হবে, তারপর মোটরে ক'রে আমেরিকানরা মিউনিখে তাদের কয়েদখানায় নিয়ে যাবে তাকে। অতএব, সালজবুর্গের আগেই তাকে পালাতে হবে। অথচ স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে, গাড়ির গতিবেগের কমতি নেই। হ্যাল্লিনে এসে ট্রেন থামলো; সার্জেন্টদের একজন প্ল্যাটফর্মে নেমে গেলো কিছু খাবার কিনতে। রশম্যান

www.boiRboi.blogspot.com

বললো যে ও আবার পায়খানায় যাবে। এফএসএস-এর ভালোমানুষ সার্জেন্টটিও সঙ্গে সঙ্গে চললো শৌচাগারের দরজা পর্যন্ত। হ্যাল্লিন থেকে যখন ট্রেনটা ধীরে ধীরে রাওনা দিলো, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো তুষারাবৃত প্রান্তরে। দশ মিনিট পরে সার্জেন্টরা দরজা ভেঙেছিলো, কিন্তু ততোক্ষণে ট্রেন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে খুব জোরে ছুটে চলেছে সালজবুর্গের উদ্দেশ্যে।

পুলিশি অনুসন্ধানে পরে জানা গিয়েছিলো যে তুষারের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রশম্যান এসে পৌছেছিলো এক কৃষকের কুটিরে। সেখানেই সে আশ্রয় নিয়েছিলো সেদিনটার মতো। পরদিন উত্তর অস্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে সালজবুর্গ প্রদেশে আসে; সেখানে এসে 'ছয় মাথা তারা'র দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা তাকে একটা ইঁটের ভাটিতে মজুরের কাজে লাগিয়ে দেয়। তারপর ওডেসার সঙ্গে যোগাযোগ করে, ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

সেই সময় ফরাসি সেনাবাহিনীর রঙরুট দপ্তরের সঙ্গে ওডেসার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো, ফলে বহু ভূতপূর্ব এসএস সৈন্য সেখানে গিয়ে পালিয়েছিলো। ওদের সঙ্গে দেখা করবার চারদিন পর ফরাসি নাম্বার প্লেটওলা একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো অস্টার মিয়েটিং গ্রামের বাইরে। রশম্যান এবং অন্য পাঁচ জন পলাতক নাৎসি এসে সেই গাড়িতে চড়লো। সেনাবাহিনীর ড্রাইভারের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছিলো যা দিয়ে বিনা তল্লাশীতে গাড়িটা সীমান্তঘাঁটি পেরিয়ে যেতে পারে। সেই ছয় জন এসএস ইতালির সীমানা দিয়ে ঢুকে মেরানোতে পৌছালো। সেখানকার ওডেসার প্রতিনিধিটি ড্রাইভারটাকে যাত্রি-পিছু বেশ ভালো টাকা দিয়ে ছিলো।

মেরানো থেকে রশম্যানকে নিয়ে আসা হলো রিমিনির অন্তরীণ শিবিরে। এইখানে শিবিরের হাসপাতালে তার ডান পয়ের পাঁচটা আঙুলই অ্যাম্প্যুট করা হয়, কারণ ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবার পর তুষারের ভেতর দিয়ে হাটতে হাটতে ওগুলো ফ্রস্ট-বাইটে পচে গিয়েছিলো। তখন থেকেই ও ডান পায়ে অর্থোপেডিক জুতো প'রে থাকে। রিমিনি শিবির থেকে তার বৌ তার একটা চিঠি পায় অক্টোবর ১৯৪৮-এ। সেই প্রথমবার সে তার নতুন নেয়া নামটা ব্যবহার করে – ফ্রিৎজ বার্নড ওয়েনগার।

তার কিছুদিন পরেই তাকে রোমে ফ্রান্সিস্কান মোনাস্টোরিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কাগজপত্র ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর নেপল্‌স বন্দর থেকে সে জহাজে চড়ে বুয়েনোস আইরিসে রওনা হয়ে যায়। ভায়া সিসিলিয়ার মোনাস্টোরিতে যতোদিন ছিলো, বেশ সুখেই ছিলো। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলো অনেক কমরেডদের, এসএস এবং নাৎসি পার্টির। বিশপ আলোয়া উদাল নিজে তাদের খাতির-যত্ন করতেন, দেখতেন যেনো তাদের কোন কিছুর অভাব না ঘটে।

আর্জেন্টিনার রাজধানীতে এসে পৌছালে ওডেসার পক্ষ থেকে রশম্যানকে

অভ্যর্থনা জানানো হয়। তারাই ক্যালে ইপ্পোলিতো ইরিগয়েনে জনৈক জার্মান পরিবারের সঙ্গে তার থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দেয়। জার্মানটির নাম ছিলো ভিডমার। কয়েক মাস সেখানেই সে একটা সুসজ্জিত কক্ষে বসবাস করলো। ১৯৪৯-এর গোড়ার দিকে বর্ম্যান-তহবিল থেকে তাকে ৫০,০০০ আমেরিকান ডলার ধার দেয়া হলো। সেই অর্থে সে রপ্তানি ব্যবসা খুললো, দক্ষিণ আমেরিকার কাঠ পাঠাবে পশ্চিম ইউরোপে। ফার্মের নাম হলো 'স্টেমলার এ্যান্ড ওয়েগনার', কারণ রোমের ভ্যাটিকান থেকে আনা ভূয়া কাগজপত্রের জন্যে পাকাপাকিভাবে তার নাম তখন হয়ে গেছে ফ্রিৎজ বার্নড ওয়েগনার, জন্ম ইতালির দক্ষিণ তাইরল প্রদেশে।

সেক্রেটারি হিসেবে রাখলো একটি জার্মান মেয়েকে, ইমট্রিউড সিগ্রিড মুলার। ১৯৫৫-র প্রারম্ভে তাকে বিয়ে করলো, যদিও প্রথম বৌ হেলা তখনো জীবিত এবং গ্রাৎসে থাকতো। ১৯৫৫-র বসন্তকালে আর্জেন্টিনার ডিক্টেটরের স্ত্রী এবং সিংহাসনের মূল অধীশ্বর, ইভা পেরন ক্যান্সারে মারা গেলেন। পেরনের দিন ঘনিয়ে এসেছে, রশম্যান তা বুঝলো। এবং পেরন গেলেই যে সে দেশে প্রাক্তন-নাৎসিদের পাট চুকে যাবে তাও বুঝলো। নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে রশম্যান মিশরে চলে গেলো।

সেই বছরের গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটিয়ে শরৎকালে চলে এলো পশ্চিম জার্মানিতে। কেউ কিছু জানতে পারতো না যদি তার পরিত্যক্তা স্ত্রীর ক্রোধ এসে না পড়তো তার ওপর। তার প্রথমা স্ত্রী হেলা রশম্যান গ্রাৎস থেকে তাকে একটা চিঠি লিখেছিলো বুয়েনোস আইরিসে ভিডমার পরিবারের ঠিকানায়। ততোদিনে রশম্যান চলে গেছে, ভিডমারের কাছেও কোন ঠিকানা রেখে যায়নি। ভিডমার চিঠিটা খুলেছিলো। উত্তরে গ্রাৎসে হেলা রশম্যানকে জানিয়ে দিলো যে তার স্বামী জার্মানি ফিরে গেছে এবং তার সেক্রেটারিকে বিয়ে করেছে।

তার বৌ তখন স্বামীর নতুন পরিচয় পুলিশকে জানালো। ফলে পুলিশ রশম্যানের খোঁজখবর শুরু ক'রে দিলো, একাধিক বিবাহের অপরাধে। পশ্চিম জার্মানির সর্বত্র ফ্রিৎজ বার্নড ওয়েগনার নামের জনৈক ব্যক্তির সন্ধানে তৎপর হলো তারা।

"পেয়েছিলো তাকে," মিলার জানতে চাইলো।

উইজেনথাল মুখ তুলে চাইলেন। "না, আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো সে। নিশ্চয়ই আরেক দফা জাল পরিচয়পত্র যোগাড় করেছিলো, এই জার্মানিতে। সেইজন্যেই আমি বিশ্বাস করি টউবের তাকে দেখেও থাকতে পারে। আমাদের জানা তথ্যের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে।"

"প্রথম বৌ কোথায়, হেলা রশম্যান?"

মাথা ঝাঁকালেন উইজেনথাল।

www.boiRboi.blogspot.com

"উহু, মনে হয় না। একবার ফাঁস হয়ে গিয়েছে, অতএব রশম্যান তার ঠিকানা তাকে জানাবে না, নতুন নামও না। ওয়েগনার নামটা ফেঁসে যাওয়ায় নিশ্চয়ই প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলো, ভীষণ তাড়াতাড়ি নতুন ক'রে আবার ভূয়া পরিচয় বানিয়ে নিতে হয়েছে।"

"সেই কাগজপত্র তাকে কে বানিয়ে দিয়েছে?" মিলার জিজ্ঞেস করলো।

"ওডেসা নিশ্চয়ই।"

"আচ্ছা, ওডেসা কি? রশম্যানের কাহিনী বলতে গিয়ে আপনি কয়েকবার এই নামটা নিলেন।"

"শোনেননি কোনোদিন?" উইজেনথাল প্রশ্ন করলেন।

"না, আজ পর্যন্ত শুনিনি।"

চট ক'রে ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিলেন উইজেনথাল।

"আচ্ছা, কাল সকালে আসুন, তাদের সব কথা আমি আপনাকে জানাবো।"

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ৯

পরদিন সকালে পিটার মিলার আবার সিমন উইজেনথালের অফিসে এলো।

"বলেছিলেন যে আজ ওডেসা সম্বন্ধে বলবেন। দেখুন একটা কথা কিন্তু আপনাকে আমি আগেই জানাবো ভেবেছিলাম, কাল ভুলে গিয়েছিলাম একেবারে।"

ড্রিসেন হোটেলের ঘটনাটা সে বললো। ডাঃ স্মিডটের আগমন...রশম্যানের অনুসন্ধান ছেড়ে দিতে বলা...তাকে সাবধান ক'রে দেয়া...সব সবিস্তারে জানালো।

ঠোঁট কামড়ে নীরবে শুনে গেলেন উইজেনথাল। শেষ হলে, ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "হুঁ! ওদের টনক নড়েছে দেখছি। কিন্তু সাধারণত তো ওরা এরকম করে না ...সাংবাদিকদের এভাবে সর্তক ক'রে দেয়া...আর এতো শীগগিরই...উঁহুঁ!...রশম্যান তাহলে তদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ...কি করছে সে, জানতে পারলে ভালো হোতো!"

তারপর দু'ঘণ্টা ধরে নাৎসি-শিকারীটি মিলারকে ওডেসা সম্বন্ধে ব'লে গেলেন। প্রতিষ্ঠানটার শুরু কিভাবে হয়েছিলো...চিহ্নিত এসএস অপরাধীদের নিরাপদ স্থানে গোপনে চলে যেতে সাহায্য করা থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশ সেটা প্রাক্তন এসএস সদস্যদের এবং তাদের সাহায্যকারী ও সমর্থকদের একটা দুনিয়াজোড়া ভ্রাতৃত্ব ও সখ্যতার প্রতিষ্ঠানে কিভাবে পরিণত হলো।

মিত্রশক্তি যখন ১৯৪৫ সালে ঝড়ের বেগে জার্মানিতে ধেয়ে এলো, তখন তাদের নজরে পড়লো একটার পর একটার কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, আর তাদের নানাবিধ পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের চিহ্ন। স্বভাবতই তারা জার্মান নাগরিকদের কাছ থেকে জানতে চাইলো কারা এইসব পাশবিকতা চালিয়েছিলো। সব জায়গা থেকে একই উত্তর এলো – এসএস। কিন্তু কোথায় এসএস কোথাও তাদের চিহ্ন নেই। গেলো কোথায় তারা? তখন হয় ডুব দিয়েছে জার্মানি বা অস্ট্রিয়ার বিভিন্ন স্থানে, নয়তো বিদেশে পালিয়ে গেছে। যেখানেই যাক, তাদের আত্মগোপন কিন্তু মূহুর্তের

www.boiRboi.blogspot.com

ঘটনা ছিলো না। মিত্রশক্তিরা তখন বুঝতে পারেনি (অনেক পরে বুঝেছিলো অবশ্য) যে প্রত্যেকটি লোক তাদের নিজের আত্মগোপনের পন্থা বহু আগে থেকেই অতি সযত্নে ক'রে রেখে গিয়েছিলো।

এসএস-এর তথাকথিত স্বাদেশিকতার এটা আরো একটা অদ্ভুত নিদর্শন যে তারা প্রত্যেকেই, হাইনরিখ হিমলার থেকে শুরু করে সবাই, নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নিখুঁত সব পরিকল্পনা ক'রে রেখেছিলো; বাকি কোটি কোটি জার্মান মানুষ শত্রুদের হাতে মরুক বা বাঁচুক, কিছু এসে যায় না। আগে থাকতে সেই নভেম্বর ১৯৪৪-এরই হাইনরিখ হিমলার সুইডিস রেডক্রশের কাউন্ট বার্নাদোতের মারফত নিজের নিরাপদ অবস্থানের চেষ্টা চালিয়েছিলো, কিন্তু মিত্রশক্তি তাকে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে দিতে অস্বীকার করেছিলো। জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে যখন নাৎসি আর এসএস গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলে যাচ্ছিলো যে চালিয়ে যাও, যুদ্ধ চালিয়ে যাও, অলৌকিক এক আশ্চর্য অস্ত্র এসে গেলো বলে, তখনই কিন্তু তারা দূর বিদেশে কোথাও আরামপ্রদ জীবনের সন্ধানে সবকিছু পরিকল্পনা ক'রে ফেলেছিলো। তারা তো জানতো আশ্চর্য অস্ত্রটস্ত্র ব'লে কিছু নেই; রাইখের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং হিটলার যদি কিছু করতে যায় তো সমগ্র জার্মান জাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

পূর্ব রণাঙ্গণে রুশদের বিরুদ্ধে জার্মান সেনাবাহিনীকে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও লড়াই চালিয়ে যেতে প্ররোচিত করা হয়েছিলো – জয়ের গৌরব অর্জন করবার জন্যে নয়, সময় পাবার জন্যে, যাতে এসএস-রা তাদের নিজেদের পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা গড়ে নিতে পারে। সেনাবাহিনীর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়েছিলো এসএস-রা, কেউ এক পা পিছিয়ে এলেই গুলি করতো বা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতো; অথচ সামরিকবাহিনী তখন এমনভাবে পর্যুদস্ত হচ্ছিলো সমর-ইতিহাসে যা অকল্পনীয়। হাজার হাজার জার্মান সৈন্য এইভাবে এসএস-এর হাতে প্রাণ হারিয়েছিলো।

এসএ-এর পাণ্ডারা যখন জানতে পেরেছিলো যে পরাজয় অবধারিত, তখন থেকে লোকক্ষয় ক'রে ক'রে অযথা বিলম্ব ঘটিয়ে ছয় মাস কাটিয়ে দিয়েছিলো; কাজেই পরাজয় যখন এলো তখন তারা অদৃশ্য। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সব এসএস নায়কেরা তাদের পদ থেকে নীরবে স'রে এসে বেসামরিক পোশাক পরে নিলো, নিখুঁতভাবে জাল-করা (সরকারি সূত্রেই) কাগজপত্র পকেটে ভরে জনস্রোতে ভেসে পড়লো। ১৯৪৫-এর মে মাসে জার্মানি জনসাধারণ বলতে যাদের ছেড়ে এলো তারা হচ্ছে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলোর দরজায় দরজায় কিছু বৃদ্ধ হোমগার্ড, যুদ্ধবন্দীর শিবিরে কিছু অবসন্ন ওয়েরম্যাখট (জার্মান সৈন্য) এবং ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয়া জার্মান শিশু আর নারী।

কুখ্যাতজনেরা বিদেশে পাড়ি জমালো; কারণ তারা জানতো যে তারা এতো সুপরিচিত যে বেশিদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না। ওডেসার কাজ শুরু হলো

www.boiRboi.blogspot.com

তখন। যুদ্ধ সমাপ্তির ঠিক পূর্বেই এই প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছিলো, এদের কাজ ছিলো তখন ফেরারী এসএস নেতাদের জার্মানির বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া। ইতিমধ্যেই হুয়ান পেরনের আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাদের গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো; সাত হাজার সাদা পাসপোর্টও সেই দেশ থেকে ইসু ক'রে দেয়া হয়েছে, শুধু শরণার্থী যে কোন একটা মিথ্যা নাম তাতে লিখে নিজের ফটোগ্রাফ সেঁটে দেবে; আর্জেন্টিন কন্সাল চোখ বুঝে সেটাতে সিল মেরে দেবার জন্যে সদাপ্রস্তুত, তারপরেই জাহাজে উঠে চলে যাও বুয়েনোস আইরিসে বা মধ্যপ্রাচ্যে।

হাজার হাজার এসএস ঘাতক অস্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে ইতালির দক্ষিণ তাইরল প্রদেশে এসে পড়লো। রাস্তা জুড়ে বহু নিরাপদ আস্তানা; একের পর এক সেগুলো বদল ক'রে ক'রে ইতালির জেনোয়ার বন্দরে নইলে আরো দক্ষিণে রিমিনি কিংবা রোমে আনা হলো তাদের। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান, যারা সত্যিই অনাথ-এতিমদের সেবায় নিয়োজিত ছিলো, তারাও কিন্তু তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলো। কারণ যে কি তা তারাই জানে, তবে মনে হয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কল্পনা করতে ভালোবাসতো যে এসএস শরণার্থীদের সঙ্গে মিত্রশক্তি অযথাই খুব বেশি কঠোরতা অবলম্বন করেছে।

রোমে 'রক্তপুষ্প' নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা হাজার হাজার পলাতক এসএস-কে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রোমের জার্মান বিশপ আলোয়া উদাল। এসএস হত্যাকারীদের লুকিয়ে রাখবার প্রধান জায়গা ছিলো রোমের ফ্রান্সিস্কান মোনাস্টেরি। যতোদিন না কাগজপত্র ঠিকঠাক হয়ে উঠতো, ততোদিন তাদের সেখানেই গোপনে রাখা হোতো, তারপর তারা রওনা দিতো দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশ্যে। কোন কোন ক্ষেত্রে চার্চের হস্ত ক্ষেপে রেডক্রস থেকে দেয়া ছাড়পত্রেও এসএস-রা ভ্রমণ করেছে, এবং সেই জাতীয় বহুক্ষেত্রেই টিকেট ভাড়াও দিয়ে দিয়েছে 'ক্যারিটাস' নামক একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান।

ওডেসার প্রথম কর্তব্য ছিলো এটাই, সহস্র এসএস হত্যাকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে দেয়া। যথেষ্ট কৃতকার্যও হয়েছিলো সে কাজে। কতো হত্যাকারীকে যে তারা এরকমভাবে বিপদমুক্ত করেছিলো তার সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও নির্ভুল অনুমান হলো যে অন্তত আশি শতাংশ মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধীদের তারা নিরাপত্তার মধুর শরণে রেখে এসেছিলো।

অর্থের অভাব ছিলো না ওডেসার। গণহত্যার স্ফীত তহবিল তাদের নামে সুইস ব্যাংকে। ফোর্থ রাইখ প্রতিষ্ঠা হলো, তখন তারা নিজেদের জন্যে পাঁচটা কাজের নতুন কর্মসূচী রাখলো।

প্রথমত, নব জার্মানির জনজীবনে প্রতিটি স্তরে প্রাক্তন নাৎসিদের অনুপ্রবেশ

www.boi-boi.blogspot.com

ঘটাতে হবে। চল্লিশ দশকের শেষের দিকে এবং পঞ্চাশ দশকের নাৎসিরা সাধারণ অসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে আবার প্রবেশ করলো, আইনজীবীর ব্যবসায় ফিরে এলো, বিচারকের পদে এসে বসলো, পুলিশে ঢুকলো, স্থানীয় প্রশাসনে বা ডাক্তারদের সার্জারিতেও এলো। যতোই নিচু পদ হোক, সেখান থেকেও নিপুণভাবে তা ঠেকিয়ে রাখতো এবং বিশেষ ক'রে প্রত্যেকেই ভ্রাতৃসঙ্ঘের যে কোন সদস্যের (নিজেদের ওরা 'কামেরাড' ব'লে সম্বোধন করে) বিরুদ্ধে কোন অনুসন্ধান বা অভিযোড়ের পালা শুরু হলে সেটাকে যতোদুর সম্ভব শ্লথগতি বা দমিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় রত হোতো।

দ্বিতীয় কর্তব্য হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে গিয়ে কোন রকমে লিপ্ত হওয়া। উঁচুমহলগুলো এড়িয়ে প্রাক্তন নাৎসিরা সরকারী দলের একেবারে নিম্নস্তরে গিয়ে যোগ দিলো...ওয়ার্ড বা কনস্টিট্যুয়েন্সির পর্যায়ে। প্রাক্তন নাৎসি হলে যে রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারবে না, এমন কোন আইন নেই। অতএব, কোন বাঁধা ছিলো না। অবাক ব্যাপার এই যে, দেখা গেছে আজ পর্যন্ত কোন লোক যে নাৎসি অপরাধীদের অনুসন্ধান বা বিচার নিয়ে পরম আগ্রহী, সে সংসদে কখনো নির্বাচিত হয়নি – কেন্দ্রেও নয়, প্রদেশেও নয়। ব্যাপারটা হয়তো নিছক কাকতালীয়, কিন্তু তা তো মনে হয় না। কোন কোন রাজনীতিক তো খুব সহজ ভাষায় এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "ব্যাপারটা হলো স্রেফ অংক। ষাট লক্ষ মৃত ইহুদি ভোট দেয় না, কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ প্রাক্তন নাৎসিরা ভোট দিতে পারে এবং প্রতি নির্বাচনে দিয়েও থাকে।"

দুটো কাজেরই উদ্দেশ্য ছিলো অত্যন্ত সরল: প্রাক্তন নাৎসিদের সম্পর্কে তদন্ত বা অভিযুক্ত হলে থামিয়ে দেয়া, নয়তো ধীরগতি ক'রে দেয়া। এই ব্যাপারে ওডেসার সুহৃদ ছিলো লক্ষ লক্ষ সাধারণ জার্মান মানুষের মনের বিবেকদংশন। অল্পবিস্তর সবাই ভাবতো আমরাও তো প্রকারান্তরে দায়ি। হয়তো কিছু সাহায্য করেছি, তা যতো সামান্যই হোক, নইলে ঘটনাগুলো ঘটছে জেনেও তো চুপ করেছিলাম, সেটাও তো এক ধরনের সহযোগীতা! বহুদিন, বহু বছর পরেও নাৎসি অপরাধগুলোর জোরদার তদন্তের কথা শুনলে তাদের অনীহা জাগতো, ভয় – পাছে অনেক দূর দেশে কোন আদালতে যেখানে কোন নাৎসির বিচার হচ্ছে সেখানে হয়তো নাম উঠবে অথচ এখন তো সে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, কতো গণ্যমান্য!

ওডেসার তৃতীয় কর্তব্য ছিলো যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের অনুপ্রবেশ। পঞ্চাশের গোড়ার দিকে কিছু প্রাক্তন নাৎসিকে নিজের ব্যবসা খুলে বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো, টাকা এসেছিলো জুরিখ তহবিল থেকে। পঞ্চাশ দশকের প্রারম্ভে ব্যবসার বাজার ছিলো তেজী, যে কোন ব্যবসাই উন্নতি করতে পারতো। পঞ্চাশ এবং ষাট দশকের অর্থনৈতিক ইন্দ্রজালের ছোঁয়ায় সেগুলো ফুলে-ফুলে বিকশিত হয়ে বিরাট বাণিজ্যগৃহে পরিণত হলো। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো লাভের অংক

থেকে বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন কিনে নিয়ে নাৎসি-অপরাধ সম্বন্ধে সংবাদপত্রগুলোর মতামত প্রভাবান্বিত করা। যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে যে সব এসএস প্রশিক্ষিত প্রচার-পুস্তিকা বের হতো সেগুলোকে চালানো, অথবা কিছু গোঁড়া দক্ষিণপন্থী প্রকাশনা-ভবন খুলে রাখা, এবং সর্বোপরি ছিলো দুঃস্থ কামেরাডদের চাকরি-বাকরি দেয়া।

চতুর্থ কর্তব্য ছিলো যদি কোন নাৎসির অভিযুক্ত কোনমতে রোধ না করা যায়, তবে বিচারচলাকালীন সময় তার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট আইনজীবী নিয়োগ করা। পরের দিকে তারা অবশ্য চমৎকার ফন্দি বের করেছিলো; প্রথমদিকে খুব সুদক্ষ এবং দামি উকিল নিযুক্ত করতো আসামীপক্ষে, তারপর কয়েকটা শুনানির পর জানিয়ে দিতো যে উকিলকে দেয়ার মতো টাকা নেই, তখন আদালত থেকে আইন অনুসারে সেই উকিলকেই আসামী পক্ষে কৌসুলি নিযুক্ত করা হতো। পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় এবং মাঝখানে যখন লাখ লাখ জার্মান যুদ্ধবন্দী রাশিয়া থেকে দেশে ফিরে এসেছিলো, তখন অ্যামনেস্টি-বহির্ভূত এসএস অপরাধীদের বেছে বেছে ফ্রিয়েডল্যান্ড শিবিরে নিয়ে রাখা হয়েছিলো। সেখানে শিবিরে তাদের মধ্যে সুন্দরীদের ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো, যাদের প্রত্যেকেরই হাতে একটা ক'রে ছোট্ট সাদা কার্ড। সেগুলোতে লেখা ছিলো আসামীদের প্রত্যেকের জন্যে নির্বাচিত উকিলের নাম।

পঞ্চম কর্মসূচী ছিলো প্রচার। নানারকম তার ধরন। দক্ষিণপন্থী পুস্তিকা বিতরণে উৎসাহ জোগানো থেকে শুরু ক'রে 'স্ট্যাটুট অব লিমিটেশনস'-এর অন্তিম অনুমোদনের সপক্ষে জনমত তৈরি করা পর্যন্ত। শেষের কাজটা করতে পারলে নাৎসিরা আইনের চোখে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে, অপরাধগুলোর বিচার করবার সময়সীমা শেষ, সব তামাদি হয়ে যাবে। আজকের জার্মানদের বোঝানো প্রবল চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে মৃত ইহুদি বা রাশিয়ান বা পোল বা অন্যান্যদের সংখ্যা মিত্রশক্তি ব্যবহৃত সংখ্যার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র – ইহুদি মরেছে মোটে এক লাখ, এটাই বলা হয়ে থাকে। একথাও প্রচার করা হয় যে পশ্চিমী দুনিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ হচ্ছে সেটাই তো প্রমাণিত করে যে হিটলারই ঠিক ছিলেন।

তবে ওডেসা প্রচারযন্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো আজকের পশ্চিম জার্মানির ছয় কোটি জার্মানকে বোঝানো (বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছে) যে এসএস-রাও ওয়েরম্যাখটের মতোই দেশপ্রেমিক সৈনিক এবং প্রাক্তন কামেরাডদের মধ্যে ঐক্যসূত্র বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এটাই হলো ওদের সবচেয়ে অদ্ভুত পরিকল্পনা, অত্যন্ত কূটকৌশল।

যুদ্ধের সময় ওয়েরম্যাখট কখনো এসএস-দের সঙ্গে মাখামাখি করতো না, দূরে দূরেই থাকতো বরং। এসএস-দের সম্বন্ধে তাদের ছিলো যথেষ্ট বিরূপ মনোভাব, আবার এসএস-রাও ওয়েরম্যাখটের সঙ্গে ঘৃণিত ব্যবহার করতো। লক্ষ লক্ষ

www.boiRboi.blogspot.com

ওয়েরফোর্সের লোকেরা এসএস-দের কামেরাড বলে গণ্য করতে পারে? বা তাদের তদন্ত বা বিচারের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে? অথচ, সেরকমই ঘটেছিলো, ওডেসার সেই সাফল্যের তুলনা নেই।

মোট কথা হলো যে, এসএস ঘাতকদের পশ্চিম জার্মানির পক্ষ থেকে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে আসবার প্রচেষ্টা যাতে সার্থক না হয় ওডেসার সেই চেষ্টা যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছে। সাফল্য লাভের কারণ তাদের সাংগঠনিক দৃঢ়তা, প্রয়োজনবোধে নিজেদের লোকদের ওপরেও নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ, ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত মিত্রশক্তির কিছু ভুলভ্রান্তি, ঠাণ্ডা লড়াই, এবং জার্মানজাতির অদ্ভুত মানসিকতা যার ফলে সামরিক কর্ম বা অন্যান্য যে কোন বিশিষ্ট কর্তব্যে যেমন যুদ্ধোত্তর জার্মানির পুনর্গঠনে তারা প্রচণ্ড সাহসের অধিকারী হয়, কিন্তু নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই তারা সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেলে কাপুরুষ হয়ে যায়।

সিমন উইজেনথাল তাঁর বিবরণ শেষ করতেই মিলার নোটবই নামিয়ে রাখলো। অনেক লিখেছে সে। চেয়ারে একটু হেলান দিয়ে ব'সে বললো, "বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলো না আমার।"

"খুব কম জার্মানেরই আছে," উইজেনথাল বললেন, "ওডেসার নাম শুনেছেই বা ক'জন? জার্মানিতে তো ওই নাম নেয়াই হয় না। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু কিছু লোক আন্ডারওয়ার্ল্ডে মাফিয়া ব'লে যে কিছু আছে সেই কথা স্বীকার করতে চায় না, তেমনি যে কোন প্রাক্তন এসএস ওডেসার অস্তিত্ব অস্বীকার করবে। নামটা অবশ্য এখন আগের মতো ব্যবহারও করা হয় না। এখন শুধু বলা হয় 'দি কমরেডশিপ', যেমন আমেরিকায় মাফিয়াদের এখন বলা হয় *কোসা নস্ত্রা*। কিন্তু নামে কি এসে যায়? ওডেসা এখনো আছে, এবং থাকবেও – যতোদিন পূর্বতন কোন এসএস অপরাধী বেঁচে আছে।"

"এদের বিরুদ্ধেই কি আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে?" মিলার বললো।

"নিশ্চয়ই, কোন সন্দেহ নেই। বাড গোটেসবার্গে আপনাকে যে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছিলো সেটা ওদেরই কাজ। সাবধানে থাকবেন, এরা খুব বিপজ্জনক।"

মিলারের মন কিন্তু তখন অন্য কোথাও। "আচ্ছা, রশম্যান যখন ১৯৫৫-তে উধাও হয়ে গেলো, আপনি যে তখন বললেন তার নতুন একটি পাসপোর্টের দরকার হয়েছিলো?"

"নিশ্চয়ই।"

"কেন, পাসপোর্ট কেন?"

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে সিমন উইজেনথাল বললেন, "আপনার বিভ্রান্তির কারণটা আমি বুঝতে পারছি। দাঁড়ান, আমি আপনাকে বলছি। যুদ্ধের পর জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায় হাজার হাজার লোক পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, কোনরকম

www.boiRboi.blogspot.com

সনাক্তপত্র তাদের ছিলো না। কেউ কেউ হয়তো সত্যিই সেগুলো খুইয়েছিলো, আবার কেউ বা সেগুলো কোন কারণবশত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। নতুন ক'রে বানাতে গেলে বার্থসার্টিফিকেটের দরকার হতো, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক তখন চলে এসেছে জার্মানির সেই অঞ্চলে থেকে যা রাশিয়ানদের অধীনে চলে গেছে। অতএব কে বলবে দরখাস্তকারী সত্যি সত্যি পূর্ব প্রুশিয়ার সেই গণ্ড গ্রামে, যা সে দাবি করছে, সেখানে আদৌ জন্মেছিলো কি না? সে অঞ্চল তো পূর্ব-জার্মানির অনেক ভেতরে। অন্যান্য ক্ষেত্রে জন্ম-খতিয়ানগুলো আবার যে দালানে গচ্ছিত ছিলো সেই দালান কবে বোমার ঘায়ে ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং পদ্ধতি খুব সহজ। শুধু দুজন সাক্ষীর দরকার; যারা বলবে, হ্যা, লোকটা তার নাম যা বলছে, আসলে সে তাই। ব্যস্, নতুন ব্যক্তিগত সনাক্তপত্র ইসু হয়ে যাবে। যুদ্ধবন্দীদের কাছেও কোন কাগজপত্র থাকতো না। শিবির থেকে ছাড়া পাবার সময়, মার্কিনরা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কাছে, তারা তখন ওই নামে সনাক্তপত্র লিখে দিতো। কিন্তু অনেক সময়েই লোকটা আদিতে মিত্রশক্তির কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের নাম না বলে অন্য নাম বলেছে। জোহান শুম্যান হয়তো জোহান শুম্যান নয়, অন্য কেউ, কেউ তো পরখ ক'রে দেখেনি। লোকটা পেয়ে গেলো নতুন এক পরিচয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এরকমটাই চলছিলো। অতএব, তার প্রয়োজন একটা পাসপোর্টের।"

"এই পর্যন্ত তো বুঝলাম," মিলার বললো, "কিন্তু পাসপোর্ট কেন? ড্রাইভিং লাইসেন্স নয় কেন বা একটা সনাক্তপত্র?"

"কারণ গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পরেই জার্মান কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলো বহু লোক, হয়তো কয়েক হাজার, মিথ্যা পরিচয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা তখন ভেবে দেখলো যে ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে, তদন্ত ক'রে, একটা পাকা পরিচয়পত্র যদি একবার দেয়া যায় তাহলে সেটার ভিত্তিতে অন্যগুলো দিতে কোন অসুবিধা নেই। পাসপোর্টের পরিকল্পনা হলো এইভাবে। জার্মানিতে পাসপোর্ট বের করতে হলে, আগে আপনাকে বার্থসার্টিফিকেট পেশ করতে হবে, কতগুলো পরিচিত ব্যক্তির নাম দিতে হবে, আরো কিছু দলিলপত্র। সবগুলো পরখ ক'রে তবে পাসপোর্ট দেয়া হয়। অন্যদিকে আপনার যদি একবার পাসপোর্ট হয়ে থাকে, তার ভিত্তিতে যা খুশি তাই পেতে পারেন। আমলারা যখন সবকিছু পরীক্ষা ক'রে পাসপোর্ট ইসু করেছিলেন, তখন সব ঠিক আছে, আবার নতুন ক'রে পরখ করার দরকার নেই। নতুন পাসপোর্ট হাতে আসামাত্র রশম্যনে নিশ্চয়ই বাকি সব কাগজপত্র তৈরি করিয়ে নিয়েছিলো – ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ক্রেডিট কার্ড। এখনকার জার্মানিতে সবরকম দলিলপত্র অনায়াসে পাবার যন্ত্র হচ্ছে আপনার নিজের পাসপোর্ট।"

"কিন্তু পাসপোর্টটা তার আসবে কোত্থেকে?"

www.boiRboi.blogspot.com

"ওডেসা থেকে। নিশ্চয়ই তাদের কাছে কোন জালিয়াত আছে যে বানিয়ে দেয় ওসব।" হের উইজেনথালের কণ্ঠটা শুনে মনে হলো তাঁর কোনই সন্দেহ নেই এই বিষয়ে।

মিলার একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে বললো, "আচ্ছা, পাসপোর্ট জাল করে যে লোকটা, তাকে যদি কোনমতে খুঁজে বের করা যায়, তাহলে তো রশম্যানের এখনকার পরিচয়টা জানা যাবে।"

উইজেনথাল কাঁধ ঝাঁকালেন। "যেতে পারে, কিন্তু সে তো বহু দূরের ব্যাপার। আর তা করতে হলে, ওডেসার ভেতরে গিয়ে ঢুকতে হবে। এসএস না হলে তো তা হবে না।"

"তাহলে? এখন কি করা যায়?"

"এক কাজ করতে পারেন, রিগা ক্যাম্প থেকে যদি কেউ ফিরে এসে থাকে তাকে ধরতে পারেন। জানি না আপনাকে সে সাহায্য করতে পারবে কি না, তবে সাহায্য করতে অস্বীকার করবে না। আমরা সবাই তো রশম্যানকে খুঁজে বেড়াচ্ছি...দাঁড়ান –"

ডেস্কের ওপরে রাখা ডায়রিটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

"অলি অ্যাডলার নামে একটা মেয়ের কথা লেখা আছে, দেখুন। রশম্যানের সঙ্গে সে যুদ্ধের সময় ছিলো। মিউনিখের মেয়ে, হয়তো বেঁচে গিয়ে ফিরে এসেছে দেশে।"

মিলার জিজ্ঞেস করলো, "এসে থাকলে কোথায় নাম রেজিস্ট্রি করবে?"

"ইহুদি কম্যুনিটি সেন্টারে। এখনো আছে সেটা। মিউনিখের ইহুদি সম্প্রদায়ের যাবতীয় তথ্য রয়েছে সেখানে, মানে যুদ্ধের সময় থেকে। বাকি সব ধ্বস হয়ে গেছে...সেখানে চেষ্টা করতে পারেন।"

ঠিকানার খাতাটা ওলটাতে ওলটাতে সিমন উইজেনথাল বললেন, "হ্যা, এই যে লিখে নিন...রাইখেনবাখ স্ট্রাস, ২৭ নম্বর মিউনিখ।"

মিলার ঠিকানাটা লিখে নেয়ার পর উইজেনথাল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সলোমন টউবেরের ডায়রিটা বোধ হয় ফেরত চান?"

"হ্যা...নিয়ে যেতে চাই।"

"ইস্! রাখতে পারলে ভালো হোতো। কী অদ্ভুত ডায়রি!"

উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দরজা পর্যন্ত মিলারের সঙ্গে সঙ্গে এলেন, "আচ্ছা, গুড লাক...জানাবেন কতো দূর কি করলেন।"

সে রাতে মিলার গোল্ডেন ড্রাগনে গিয়ে ডিনার খেলো। অভিজাত হোটেল, সেই ১৫৬৬ সালে থেকে চলছে। মনে সন্দেহ জাগে রিগা-প্রত্যাগত কাউকে পাবে কিনা,

পেলেও রশম্যানের অনুসন্ধানে কতোটুকু সাহায্য করতে পারবে। তবু চেষ্টা করতে হবে, আশা ব'লে কথা।

পরদিন সকালে মিউনিখের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো মিলার।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১০

মিউনিখে এসে পৌছালো ৮ই জানুয়ারির সকাল বেলা। শহরে ঢোকার মুখে খবরের কাগজের দোকান থেকে মিউনিখের রাস্তার একটা ম্যাপ কিনে নিয়েছিলো। সেই ম্যাপ দেখে দেখে অনায়াসে ২৭ নম্বর রাইখেনবাখ স্ট্রাসে এসে পৌছালো। গাড়ি রেখে ইহুদি কম্যুনিটি সেন্টারের দিকে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। পাঁচ তলা বাড়ি, সামনের দিকটা চ্যাপ্টা ধরনের। নিচ তলার বাইরেটা শুধু সিমেন্টের পলেস্তারা লাগানো, কোনরকম চুনকাম বা রঙ করানো নেই। দালানের ভেতরে নিচ তলায় আছে একটা সনাতনী ইহুদি কাবাবের দোকান, মিউনিখ শহরে এ ধরনের রেস্তোঁরা আর দ্বিতীয়টি নেই। দোতলায় বৃদ্ধদের আড্ডাখানা, তিন তলায় অফিস, চার তলা আর পাঁচ তলায় অতিথিদের ঘর আর যেসব বৃদ্ধ এখানে থাকে সেই অসহায় বৃদ্ধদের শয়নকক্ষ। পেছনদিকে আছে একটা সিনাগগ।

পুরো দালানটা ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭০-এ ছাদ থেকে পেট্রোল-বোমা ফেলে একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়েছিলো। ধোঁয়াতে দম বন্ধ হয়ে সাত জন মারা গিয়েছিলো তখন। সিনাগগে স্বস্তিকা-চিহ্ন এঁকে দেয়া হয়েছিলো।

তিন তলায় উঠে মিলার এনকোয়ারি-ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

অপেক্ষ করতে করতে ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। সারি সারি বই, সব ঝকঝকে নতুন। পুরনো লাইব্রেরিটা তো সেই কবে নাৎসিরা পুড়িয়ে ফেলেছে। লাইব্রেরির তাকগুলোর মাঝখানে, দেয়ালের ফাঁকে, ফাঁকে, ইহুদি সম্প্রদায়ের গুরু ও যাজকদের ছবি ঝুলছে। ঘন দাড়ি-গোঁফের ওপর দিয়ে তাঁদের চোখগুলো জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছে ফ্রেমের মধ্যে থেকে। চেহারাগুলো ঠিক পাঠ্যবইয়ে ছাপা ধর্মগুরুদের ছবির মতো। কারো কারো কপালে আবার কবচ বাঁধা, সবার মাথায়ই হ্যাট।

একটা তাক ভরতি খবরে কাগজ, কিছু জার্মান বাকি সব হিব্রু ভাষায়। ইস্রায়েল

www.boiRboi.blogspot.com

থেকে আসে বলেই মনে হচ্ছে। একজন বেঁটে কালো মানুষ একটা হিব্রু কাগজের প্রথম পাতাটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে।

"আপনার জন্যে কিছু করতে পারি?"

প্রশ্নটা শুনেই চোখ ফিরিয়ে মিলার তাকালো এনকোয়ারি-ডেস্কের দিকে। এতোক্ষণ যে আসনটা খালি ছিলো, সেখানে এখন এসে বসেছে চল্লিশোর্ধ্ব একজন মহিলা, ঘন কালো চোখের তারা তার। চোখের ওপরে ক্ষণেক্ষণেই তার একগোছা চুল এসে পড়ছে, মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে সেটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে দেয়।

মিলার তার অনুরোধটা জানালো: অলি অ্যাডলার কি যুদ্ধের পরে মিউনিখ ফিরেছিলো, তার কোন খোঁজখবর কি সম্ভব?

"কোত্থেকে তার ফেরার কথা?" জিজ্ঞেস করলো মহিলা।

"ম্যাগডেবুর্গ থেকে। তার আগে স্টুটহফ, তার আগে রিগা'তে ছিলো।"

"ও মা, রিগা!" মহিলা যেনো আর্তনাদ ক'রে উঠলো। "না রিগা থেকে ফিরেছে এমন কারো নাম আমাদের তালিকায় আছে ব'লে মনে হয় না। তারা সবাই...মারা গেছে...জানেন তো। তবু আমি দেখছি, দাঁড়ান।"

পেছনের ঘরে চলে গেলো। মিলার ওখানে থেকেই দেখতে পেলো যে নামের সূচীটা খুঁজে খুঁজে দেখছে সে। তালিকাটা খুব বড় নয়, পাঁচ মিনিটেই ফিরে এলো মহিলা। বললো, "না, পেলাম না। এ নামের কেউ নেই তালিকায়।"

"ও!" মিলার বললো, "কি আর করা যাবে তাহলে! আচ্ছা...দুঃখিত, শুধু-শুধু আপনাকে কষ্ট দিলাম।"

"না না, তাতে কি। আপনি এক কাজ করুন বরং," মহিলা জানালো, "আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান সংঘে খোঁজ নিন, নিরুদ্দিষ্ট লোকদের খোঁজখবর নেয়া আসলে ওদেরই কাজ। পুরো জার্মানির সব জায়গার লোকদের তালিকা আছে ওদের কাছে, আর আমাদের কাছে তো আছে শুধু যারা মিউনিখ থেকে চলে গিয়েছিলো, পরে ফিরে এসেছে।"

"কোথায় সেটা?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"আরোলসেন-ইন-ওয়ালডেকে। হ্যানোভারের ঠিক বাইরে, লোয়ার স্যাক্সনিতে। রেডক্রশ থেকে চালানো হয়।"

মিলার একমুহূর্ত ভাবলো।

"আচ্ছা, মিউনিখে কি এমন কেউই আসেনি যে রিগাতে ছিলো? আমি আসলে তখনকার কমান্ড্যান্টের খোঁজখবরের চেষ্টা করছি।"

ঘরে নীরবতা নেমে এলো। মিলার বুঝতে পারলো খবরের কাগজ পড়ছিলো যে লোকটা সে চোখ তুলে তার দিকে তাকাচ্ছে এখন। মহিলাও যেনো দমে গেলো।

"থাকতে পারে, বলতে পারছি না। যুদ্ধের আগে, এখানে এই মিউনিখে প্রায়

www.boiRboi.blogspot.com

২৫,০০০ ইহুদি ছিলো। তার মাত্র দশ ভাগের একভাগ ফিরে এসেছিলো। এখন আবার আমাদের মোট সংখ্যা প্রায় ৫০০০ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার অর্ধেকই ১৯৪৫-এর পরে জন্মেছে। রিগাতে ছিলো এমন কাউকে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাহলে আমাকে আবার প্রথম থেকে পুরো তালিকা দেখতে হবে, যারা ফিরে এসেছে তাদের সবার নামধাম, প্রত্যেকের নামে নামে তাদের শিবিরগুলোর নামও তো দেয়া আছে...কাল আসতে পারবেন আপনি?"

মিলার উত্তর দিতে দেরি করলো। বুনো হাঁসের পেছনে অনর্থক ছোটাছুটি ক'রে বোধহয় লাভ নেই। তবু বললো, "বেশ, কাল আসবো আমি। ধন্যবাদ আপনাকে।"

রাস্তায় বেরিয়ে পকেট হাতড়ে গাড়ির চাবি খুঁজছিলো, পেছনে শুনলো কারোর পায়ের শব্দ।

"মাফ করবেন..."

ঘুরে তাকালো মিলার। সেই লোকটা যে খবরের কাগজ পড়ছিলো।

"আপনি, শুনলাম রিগার খোঁজখবর নিচ্ছেন...সেখানকার কমান্ড্যান্টের? কার সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন রশম্যান?"

"হ্যা তাই," মিলার বললো,"কেন?"

"আমি রিগাতে ছিলাম, রশম্যানকেও চিনি। হয়তো আমি আপনার কাজে আসতে পরি।"

লোকটা বেঁটে মতোন, গিটপাকানো চেহারা। বয়স প্রায় মধ্যচল্লিশ, চক্‌চকে বোতামের মতো বাদামী দুটো চোখ। তাকে দেখে মনে হয় যেনো ভেঁজা চড়ুই পাখির মতো বিপর্যস্ত।

বললো "আমার নাম মর্ডেচাই, কিন্তু লোকে ডাকে মোট্টি ব'লে। আসুন না, কফি খেতে খেতে একটু আলোচনা করি।"

কাছাকাছি একটা কফিহাউজে এসে ওরা ঢুকলো। লোকটার অনর্গল বকবকানিতে মিলার একটু পটে গেলো। পুরো কাহিনীটা তাকে বলে দিলো; আলটনার গলি থেকে আরম্ভ ক'রে মিউনিখের কম্যুনিটি সেন্টার পর্যন্ত সবটাই। লোকটা নীরবে শুনে গেলো শুধু, মাঝেমাঝে কখনো কখনো ঘাড় নাড়ালো, কিন্তু ওই পর্যন্তই, কোন কথা বললো না।

মিলারের কথা শেষ হলে বললো, "বাব্বা! বিরাট অভিযান দেখি। কিন্তু আপনি জার্মান হয়ে রশম্যানকে কেন খুঁজে বের করতে চান?"

"কিছু এসে যায় তাতে? দেখুন মিস্টার এই প্রশ্নটা এতোবার আমাকে করা হয়েছে যে এখন এটা আমার স্নায়ুর ওপরে গিয়ে আঘাত করে। কয়েক বছর আগে যেসব কাণ্ড হয়েছিলো তাতে কি কোন জার্মান আপত্তিও করতে পারে না?"

শূন্যে দু'হাত ছুঁড়লো মোট্টি। "না, তা নয়। তবে একটু অসাধারণ লাগছে।

www.boiRboi.blogspot.com

যাক্‌গে, রশম্যান যে ১৯৫৫-তে আবার গায়েব হয়ে গেলো, তা আপনার কি ধারণা তার ভুয়া পাসপোর্টটা ওডেসা বানিয়ে দিয়েছিলো?"

"তাই তো আমাকে বলা হলো," মিলার বললো, "আর শুনলাম সেইসব কাগজ জাল হয় কোথায় সে খবর নাকি ওডেসার ভেতরে না ঢুকলে জানা যাবে না।"

জার্মান যুবকটির দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মোট্টি। অবশেষে বললো, "কোন্ হোটেলে উঠেছেন আপনি?"

কোন হোটেলে ওঠেনি সে এখনো, বিকেল তো হয়নি। তবে গতবার এসে একটা হোটেলে উঠেছিলো, সেখানে খোঁজ করবে ভাবছে। মোট্টির অনুরোধে কফিহাউজের টেলিফোন থেকে সেই হোটেলের খবর নিয়ে টেবিলে ফিরে এসে দেখে মোট্টি চলে গেছে। কফির কাপের তলায় একটা ছোট্ট চিঠি চাপা দিয়ে রেখে গেছে সে। পড়ে দেখলো তাতে লেখা আছে: 'ঘর পান কি না পান, ওই হোটেলের লাউঞ্জে আজ রাত আটটার সময় থাকবেন।'

কফির দাম মিটিয়ে মিলার বেরিয়ে পড়লো।

সেই বিকেলেই ওয়েরউলফ তার চেম্বারে ব'সে বন থেকে পাঠানো তার সতীর্থের বার্তাটা আরেকবার পড়লো। সতীর্থ লোকটি এক সপ্তাহ আগে ডা: স্মিড্‌ট নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিলো মিলারের কাছে।

বার্তাটি এসেছিলো পাঁচ দিন আগে কিন্তু ওয়েরউলফ স্বাভাবতই খুব সাবধানী, তাই অপেক্ষা করেছিলো এই কয়েকদিন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে আবার বিবেচনা ক'রে দেখতে চেয়েছিলো।

গত নভেম্বরে মাদ্রিদে তার ঊর্ধ্বতন কর্তা জেনারেল গ্লুক্‌স শেষ কটি কথা তাকে ব'লে গিয়েছিলো তাতে তার সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা আর রইলো কোথায়? তবু অধিকাংশ কলমবাজের মতো তারও সেই একই স্বভাব – অবধারিতকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখা যাক...এতো তাড়া কিসের? শেষ আদেশের ভাষা ছিলো – 'স্থায়ী সমাধান'; তার অর্থ খুব পরিষ্কার, সন্দেহের অবকাশ নেই তাতে। ডা: স্মিড্‌টের পাঠানো বিবরণের ভাষাও অত্যন্ত স্পষ্ট, অন্য কোন প্রশ্নই জাগে না। সেই বার্তার ভাষা অনুসারে...যুবকটি ভীষণ জেদী, একরোখা, হয়তো তেমনি গোঁয়ার। ওই বিশেষ কামেরাডটির প্রতি, অর্থাৎ এডুয়ার্ড রশম্যানের ওপরে তার ভয়ানক আক্রোশ – প্রায় ব্যক্তিগত ক্রোধ; কিন্তু কেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। যুক্তি শুনতে চায় না মোটেই, নিজের ক্ষতি হলেও পরোয়া নেই...'

ডাক্তারের বক্তব্য আরো একবার পড়ে দেখলো ওয়েরউলফ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টেলিফোনটা তুলে নিলো। সেক্রেটারি হিলডার কাছ থেকে বাইরের একটা লাইন চেয়ে নিয়ে ডুসেলডর্ফের নম্বর ঘোরালো।কয়েকবার রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "হ্যা।"

www.boiRboi.blogspot.com

ওয়েরউলফ বললো, "হের ম্যাকেনসেনের জন্যে ফোন।"

প্রশ্ন করা হলো, "কে চায় তাকে?"

সরাসরি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ওয়েরউলফ তার পরিচয়-সংকেতের প্রথমাংশ জানিয়ে দিলো, "মহান ফ্রেডরিকের চেয়ে বড় কে?"

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, "বার্বারোসা।" সামান্য বিরতি দিয়ে কণ্ঠস্বরটা ব'লে উঠলো, "আমিই ম্যাকেনসেন।"

"ওয়েরউলফ," ওডেসার নেতা জানালো। "ছুটি শেষ হয়ে গেলো বোধহয়। কাজ করবার আছে। কাল সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসো।"

"কখন?"

"দশটায় এসো। আমার সেক্রেটারিকে বোলো যে তোমার নাম কেলার। ওই নামে কারো সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার আগে থেকেই লেখা থাকবে।" ফোন নামিয়ে রাখলো ওয়েরউলফ।

ডুসেলডর্ফে তার ফ্ল্যাটবাড়িতে ফোন রেখে দিয়ে ম্যাকেনসেন উঠে স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলো। বিশাল দৈত্যের মতো চেহারা, আগে এসএস-এর ডাসরাইখ ডিভিশনের সার্জেন্ট ছিলো। তুলে এবং লিমোগেতে, সেই ১৯৪৪ সালে, ফরাসি বন্দীদের ধ'রে ধ'রে ফাঁসিতে লটকিয়ে মানুষ খুনে হাত পাকিয়েছে সে।

যুদ্ধের পর ওডেসার হয়ে ট্রাক চালিয়ে মানুষ নিয়ে যেতো জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ইতালির দক্ষিণ তাইরলে। ১৯৪৬ সালে একবার এক মার্কিনী নিরাপত্তাবাহিনী সন্দেহবশত তার গাড়ি থামায়। তখন সে একা জিপের চার জন আরোহীকে খতম ক'রে ফেলেছিলো, দু'জনকে তো শুধু খালি হাতে। তারপর থেকেই সে ফেরারী। তারপর ওডেসা থেকে উঁচুমহলের কর্তাব্যক্তিদের জন্যে তাকে দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। মুখে মুখে তার ডাকনাম ছড়িয়ে গেলো, *ম্যাক-চাকু*। অদ্ভুত, কোনদিন সে কিন্তু চাকু চালায়নি; তার লোহার মতো হাত দুটোই যথেষ্ট শিকারের ঘাড় ভেঙে ফেলতে অথবা টুটি টিপে মারার জন্যে।

কর্মকর্তারা ধীরে ধীরে খুব খুশি হয়ে উঠলো, ম্যাক থাকতে ভয় কি; পঞ্চাশের দশকে মাঝামাঝিতে ওডেসার প্রধান-ঘাতক হয়ে দাঁড়ালো সে। বাইরের লোকই হোক বা ভেতরের কোন অন্তর্ঘাতীই হোক, ম্যাক নিঃশব্দে বিনা বিচারে কাজ সেরে ফেলতো। ১৯৬৪-র জানুয়ারি পর্যন্ত এই ধরনের অন্তত বারোটা কাজ সে নির্বিঘ্নে সমাধা করেছিলো।

কাঁটায় কাঁটায় আটটার সময় ডাক এলো। আপ্যায়নের কেরানীটি ফোন ধরেছিলো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো আবাসিকদের লাউঞ্জের দিকে, যেখানে মিলার ব'সে ব'সে টেলিভিশন দেখছিলো।

ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো মিলার।

www.boiRboi.blogspot.com

"হের মিলার? আমি মোট্টি বলছি। আপনাকে হয়তো সাহায্য করতে পারবো ব'লে মনে হচ্ছে। মানে, আমার কিছু বন্ধু আছে যারা পারবে। দেখা করবেন তাদের সঙ্গে?"

মিলার একটু বিরক্তই হলো, এতো ষড়যন্ত্র আর কৌশল মোটেই তার ভালো লাগে না। তবু বললো, "আমাকে যে সাহায্য করতে পারবে তার সঙ্গে দেখা করতে রাজি আছি।"

"বেশ। তাহলে হোটেল থেকে বেরিয়ে বাম দিকে ঘুরে শিলার স্ট্রাস ধ'রে আসুন। দুটো দালান পেরিয়ে ওই পাশেই দেখবেন দেখবেন একটা কফি-কেকের দোকান -- নাম লিগুম্যান। ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করুন।"

"কখন, এক্ষুনি?" মিলার জানতে চাইলো।

"হ্যা, এক্ষুনি। আপনার হোটেলেই আসতাম আমি কিন্তু সঙ্গে বন্ধুবান্ধব রয়েছে। এক্ষুণি চলে আসুন।"

ফোনটার লাইন কেটে গেলো। মিলার তার কোটটা তুলে নিয়ে হোটেলের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলো। বাম দিকের রাস্তার ফুটপাত ধ'রে চললো সে। হোটেল থেকে অল্প খানিকটা আসতেই পেছন থেকে হঠাৎ শক্ত মতো কি একটা এসে তার বুকে ধাক্কা মারলো। একটা গাড়ি এসে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। কানের কাছে ফিস্‌ফিসয়ে কেউ বললো, "ওঠেন, পেছনের সিটে গিয়ে বসুন, হের মিলার।"

হুট ক'রে গাড়ির দরজা খুলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে পেছনের লোকটা আবার খোঁচা মারলো মিলারের বুকে। মাথা নামিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো মিলার। সামনে শুধু ড্রাইভার ব'সে আছে। পেছনের সিটে আরো একজন লোক ছিলো। সে স'রে ব'সে মিলারের জন্যে জায়গা ক'রে দিলো। বুঝতে পারলো যে ফুটপাতে যে লোকটা পেছন থেকে এসে দাঁড়িয়েছিলো, সেও এসে এই গাড়িতে বসলো। সশব্দে দরজা বন্ধ হতেই গাড়ি চলতে শুরু করলো।

মিলারের বুক তখন ধুকধুক করছে। গাড়ির লোক তিন জনের দিকে তাকিয়ে দেখলো কিন্তু কাউকেই চিনতে পারলো না। তার ডান পাশের লোকটা বলে ওঠলো, "চোখ বেঁধে দিচ্ছি আপনার, কেথায় যাচ্ছেন তা বুঝতে দিতে চাই না।"

হঠাৎ মিলারের পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেলো। বুঝতে পারলো মাথার ওপর দিয়ে নাক পর্যন্ত একটা কালো মোজা সেঁটে দেয়া হয়েছে। ড্রিসেন হোটেলের লোকটার ঠাণ্ডা সরীসৃপ চোখ দুটো মনে পড়ে গেলো। অজান্তেই ভিয়েনার সেই সতর্কবাণীটাও মনে পড়লো, 'সাবধানে থাকবেন, ওডেসার লোকেরা খুব বিপজ্জনক।' তারপর মোট্টির মুখটাও মূহুর্তের জন্য ভেসে উঠলো। অবাক হয়ে ভাবলো, ওদেরই একজন কি ক'রে ইহুদি কম্যুনিটি সেন্টারে গিয়ে হিব্রু কাগজ

www.boiRboi.blogspot.com

পড়ে!

পঁচিশ মিনিট ধরে গাড়িটা চললো। তারপর গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে থেমে গেলে কতোগুলো গেট খোলার আওয়াজ হলো। আবার গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে থামলো। পেছনের সিট থেকে ওকে সাবধানে নামিয়ে দেয়া হলো। দু'জন লোক দুপাশ থেকে তাকে ধরে ধরে আঙিনাটা পার করিয়ে দিলো। মুহূর্তের জন্যে মুখের ওপর খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগলো কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মিলিয়ে গেলো সেটা। পেছনের একটা দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। ধরে ধরে তাকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে চললো বোধহয় কোন ভূতল-কক্ষে। কিন্তু বাতাস বেশ গরম, তাকে বসিয়ে দেয়া হলো যে চেয়ারে সেটাতে নরম গদি।

শুনলো কে যেনো বলছে, "ব্যান্ডেজটা খুলে দাও।" মাথা থেকে মোজাটাকে টেনে খুলে নেয়া হলো। দু-চারবার চোখ পিটপিট ক'রে আলোতে দৃষ্টিটা সইয়ে নিলো মিলার।

ঘরটা মাটির নিচে তা বোঝা যায়, কারণ জানালা-টানালা নেই। দেয়ালে একটা উঁচু জায়গা থেকে এক্সজস্টারের একটানা গোঁ-গোঁ-গোঁ শব্দ হচ্ছে। বেশ সুসজ্জিত কক্ষ, আরামদায়কও বটে। মনে হয় সভা-টভা বসে এখানে, কারণ ওদিককার দেয়ালের কাছে একটা লম্বা টেবিল, আটটা গোল কার্পেট আর একটা কফি-টেবিল আছে।

লম্বা টেবিলের পাশে মোট্টি দাঁড়িয়ে আছে; মুখে তার শান্ত হাসি, যেনো ক্ষমা চাইবার বিনীত ভঙ্গি সেটা। যে দুটো লোক তাকে নিয়ে এসেছিলো তারা তার চেয়ারের দু'হাতলের ওপর বসেছে, দু'জনেই বেশ সবল, মধ্যবয়সী। ঠিক তার সামনে, কফি-টেবিল ছাড়িয়ে, একটা চেয়ারে ব'সে আছে চতুর্থ ব্যক্তিটি। মিলার ভাবলো গাড়িচালক বোধহয় ওপরেই রয়ে গেছে।

বোঝা যাচ্ছে চতুর্থ ব্যক্তিই নেতা। অনায়াস ভঙ্গীতে সে চেয়ারে ব'সে আছে। বয়স মনে হয় ষাটের কোঠায়; একহারা গড়ন, বিশাল লম্বা নাক, গাল দুটো তোবড়ানো। কিন্তু চোখ দুটো দেখে অস্বস্তি জাগলো মিলারের। গভীর গর্তে বসানো দুটো বাদামী চোখ, কিন্তু কী উজ্জ্বল, যেনো দুটো তীক্ষ্ণ শাণিত ফলা, একেবারে উন্মত্ত খ্যাপাটে দৃষ্টি। সেই লোকটিই প্রথম নিরবতা ভাঙলো।

"স্বাগতম, হের মিলার। আমার বাড়িতে আপনাকে এমন অদ্ভুত উপায়ে নিয়ে আসা হলো ব'লে ক্ষমা চাইছি। অবশ্য এর কারণ হলো, আমি যে প্রস্তাব করবো সেটাতে যদি আপনি রাজি হন, তবে আপনাকে আবার আপনার হোটেলে আমরা ফিরিয়ে দিয়ে আসবো, জীবনে আর কোনদিন আমাদের সাক্ষাৎ পাবেন না।"

মোট্টির দিকে দেখিয়ে আবার বলতে শুরু করলো, "আমার এই বন্ধুটি আমাকে জানিয়েছে, কোনো কারণে আপনি জনৈক এডুয়ার্ড রশম্যানের অনুসন্ধান ক'রে

www.boiRboi.blogspot.com

বেড়াচ্ছেন। এবং তার আরো কাছে আসবার জন্যে আপনি ওডেসার অভ্যন্তরেও ঢুকে পড়তে রাজি আছেন। কিন্তু সেরকম কিছু করতে হলে আপনার পক্ষে অন্যের সাহায্য দরকার। অনেক সাহায্য। তবে আপনাকে ওডেসার ভেতরে ঢোকাতে পারলে আমাদেরও কিছু লাভ আছে। সেইজন্যে আমরা হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারি। বুঝলেন আমার কথাটা?"

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মিলার। "মানে? বলতে চাচ্ছেন, আপনারা ওডেসার লোক নন?"

কপালে ভূরু তুললো লোকটা। "সে কি! হায় ঈশ্বর! আপনি তো দেখেছি লাঠির উল্টোদিকটা ধ'রে ব'সে আছেন।"

সামনে ঝুঁকে বাম হাতের আস্তিন তুলে দেখালো। কনুইয়ের পাশে নিলচে উল্কি দিয়ে দগদগে একটা নম্বর খোদাই করা আছে।

সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, "অউসউইৎস।" মিলারের দু'পাশের লোক দুটোকে দেখিয়ে বললো, "বুখেনওয়াল্ড আর ডাচাউ।" মোট্টিকে দেখিয়ে বললো, "রিগা ও ত্রেব্লিঙ্কা।"

আস্তিন নামিয়ে বললো, "হের মিলার, কেউ কেউ ভাবে যে আমাদের লোকদের যারা হত্যা করেছে তাদের বিচার হওয়াই উচিত। আমরা কিন্তু তাদের সঙ্গে একমত নই। যুদ্ধের ঠিক পরে পরে আমি একজন বৃটিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তা থেকেই আমার জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তিনি আমাকে বলেছিরেন, 'আমার জাতের ষাট লক্ষ লোককে যদি ওরা হত্যা করতো তো আমিও মাথার খুলি দিয়ে স্তম্ভ বানিয়ে ফেলতাম।' কনসেনট্রেশন শিবিরে যারা মরেছে তাদের মাথার খুলি দিয়ে নয়, যারা তাদের সেখানে রেখেছিলো তাদের। সরল যুক্তি, হের মিলার, কিন্তু অকাট্য। আমি ও আমার দলের লোকেরা তখন, সেই ১৯৪৫ সালে মনস্থির ক'রে ফেললাম যে জার্মানির ভেতরেই থাকবো – উদ্দেশ্য আমাদের একটিই, প্রতিহিংসা; সরল নির্ভেজাল প্রতিহিংসা। আমরা তাদের গ্রেপ্তার করি না, হের মিলার, আমরা তাদের কীটের মতো পিষে মারি। আমার নাম লিও।"

চার ঘণ্টা ধ'রে মিলারকে জেরা ক'রে তবে লিও সন্তুষ্ট হলো যে, না, রিপোর্টারটির উদ্দেশ্য খাঁটি। অন্যদের মতো তারও মনে প্রথমে খট্‌কা লেগেছিলো। কিন্তু পরে মিলারের বক্তব্য শুনে ভেবে দেখলো যে হতেও পারে, যুদ্ধের সময় এসএস'রা যেসব অমানুষিক কাণ্ড করেছে তাতে ঘৃণা জাগা অস্বাভাবিক নয়। মিলারের কথা শেষ হয়ে গেলে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে লিও তাকে অনেকক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলো। তারপর একসময় প্রশ্ন করলো, "ওডেসার ভেতরে ঢুকতে গেলে কতোখানি বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে আপনি জানেন, হের মিলার?"

www.boiRboi.blogspot.com

"অনুমান করতে পারি। তবে আমার বয়স যে অনেক কম –"

"আপনার নিজের নামে এসএস সাজবার কল্পনাও করবেন না। কারণ প্রত্যেকটা ভূতপূর্ব এসএস-এর বিবরণ আছে ওদের কাছে এবং তাতে কোন পিটার মিলারের উল্লেখ নেই। তাছাড়া অন্ততপক্ষে দশ বছর বয়স বাড়িয়ে ফেলতে হবে আপনাকে। করা যায় অবশ্য, তবে নতুন ক'রে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা পরিচয় আপনাকে নিতে হবে। এবং কাল্পনিক নয়, সত্যিকারের পরিচয়, এমন একজন লোকের পরিচয় যার অস্তিত্ব ছিলো এবং যে এসএস-এর সদস্যই ছিলো কোনদিন। সেটা করতেই রীতিমতো গবেষণা করতে হবে আমাদের; বহু পরিশ্রম এবং সময়ও লাগবে তার পেছনে।"

"কি মনে হয়ে আপনার? পাওয়া যাবে তেমন কোন লোকের সন্ধান?" মিলার জানতে চাইলো।

লিও কাঁধ ঝাঁকায়। "কে জানে! তাকে আবার এমন একজন লোক হতে হবে যার মৃত্যু সংবাদ যাচাই করেও জানা যাবে না। ওডেসা আপনজন ব'লে কাউকে স্বীকার ক'রে নেবার আগে তার সম্বন্ধে সমস্ত রকম সম্ভাব্য তথ্য যাচাই ক'রে নেয়। আপনাকে তাদের সব পরীক্ষাগুলোও পাস করতে হবে। তার মানে, আপনাকে কোন প্রাক্তন এসএস-এর সঙ্গে পাঁচ-ছয় সপ্তাহ কাটাতে হবে, যে আপনাকে তাদের লোকগাথা, কথা বলার ধরন, বিশেষ সূত্র-সংজ্ঞা, রীতি-নীতি, সবকিছু শিখিয়ে দেবে। ভাগ্য ভালো, এরকম একটা লোক আমাদের জানা আছে।"

মিলার বিস্মিত হলো। "সে কি! সে আমাকে আপনাদের কথায় শেখাতে যাবে কেন?"

"যার কথা ভাবছি সে এক অদ্ভুত লোক। সত্যিকারের এসএস ক্যাপ্টেন ছিলো, কিন্তু কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত; অনুশোচনায় তার মন পুড়ে যাচ্ছিলো। পরে ওডেসায় যোগ দিয়েছিলো। অনেক ফেরারী নাৎসিদের খবর দিয়ে দিয়েছিলো কর্তৃপক্ষকে। হয়তো আরো দিতো কিন্তু ফাঁস হয়ে পড়ায় আত্মগোপন করতে বাধ্য হলো। ভাগ্য ভালো, জানে বেঁচে গেছে সে। এখন নতুন নাম নিয়ে নিয়ে বেরোথের বাইরে একটা বাড়িতে আছে।"

"আমাকে কি শিখতে হবে?"

"আপনার নতুন পরিচয় সম্বন্ধে সবকিছু। কোথায় সে জন্মেছিলো, জন্মতারিখ কতো, কিভাবে এসএস-এ এসে ঢুকেছিলো, প্রশিক্ষা পেয়েছিলো কোথায়, কোন্ কোন্ জায়গায় কাজ করেছিলো, তার ইউনিট কি, কম্যান্ডিং অফিসার কে কে ছিলো, যুদ্ধের পর থেকে তাদের গোটা ইতিহাস, সমস্ত জানতে হবে। আপনার সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেবে এমন একজন লোকেরও দরকার হবে। সেটা সহজ হবে না। আপনাকে নিয়ে আমাদের বহু পরিশ্রম এবং সময় ব্যায় করতে হবে, হের মিলার।

একবার আপনি যদি ওদের মধ্যে গিয়ে ঢোকেন, তবে আর পিছু হটা নেই।"

"আপনাদের কি লাভ হবে এতে?" সন্দেহের সুর জাগে মিলারের কণ্ঠে।

লিও উঠে দাঁড়ায়। কার্পেটের ওপরে পায়চারি করতে থাকে। অবশেষে বললো, "প্রতিহিংসা। আপনার মতো আমরাও রশম্যানকে চাই। তবে আমরা আরো অনেক কিছু চাই। জঘন্যতম এসএস ঘাতকেরা এখনো মিথ্যে পরিচয়ে আরামে দিন কাটাচ্ছে। তাদের সেই নামগুলো চাই আমাদের। সেইটাই আমাদের লাভ। তাছাড়াও আরো কিছু আছে। আমরা জানতে চাই ওডেসার হয়ে জার্মান বৈজ্ঞানিকদেরকে মনোনীত ক'রে পাঠাচ্ছে মিশরে নাসেরের রকেট বানানের জন্যে। আগেকার লোকটা, ব্র্যান্ডনার, চাকরি ছেড়ে তো গত বছর উধাও হয়ে গেছে; তার সহকারী হাইনৎস ক্রুগের সঙ্গে আমরা মোকাবিলা ক'রে নেবার পরেই। এখন নতুন একজন রয়েছে।"

"খবরগুলো শোনাচ্ছে যেনো ইস্রায়েলি ইনটেলিজেন্সের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় তথ্য," মিলার ব'লে উঠলো।

লিও চতুর দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। "বটেই তো," কেটে কেটে বললো, "মাঝেমধ্যে তাদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করেও থাকি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে তারা আমাদের মালিক।"

মিলার জিজ্ঞেস করলো, "ওডেসার ভেতরে আপনারা নিজেদের লোক ঢোকাতে চেষ্টা করেননি কখনো?"

"হ্যা, করেছি...দু'বার করেছিলাম।"

"প্রথমজনকে দেখা গিয়েছিলো খালের পানিতে ভাসতে, কোন আঙুলের একটা নখও অবশিষ্ট ছিলো না। দ্বিতীয়জনের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় নি। এখন বলেন, এরপরও যেতে চান?"

প্রশ্নটা গ্রাহ্যই করলো না মিলার।

"কিন্তু আপনাদের পদ্ধতি যদি এতোই নিঁখুতু হবে, তবে ওরা ধরা পড়লো কেন?"

"ওরা দু'জনেই ইহুদি ছিলো," সংক্ষেপে বলতে চাইলো লিও, "হাত থেকে ওদের কনসেনট্রেশন শিবিরের উল্কি তুলে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দাগ থেকেই গিয়েছিলো। তাছাড়া দু'জনেরই খৎনা করা ছিলো। সেইজন্যেই মোট্টি যখন আমাকে জানালো যে একজন খাঁটি জার্মান আর্য এসএস-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে চায়, আগ্রহ জাগলো আমার। আচ্ছা আপনার তো খৎনা করা নেই...তাই না?"

"কেন? তাতে কিছু এসে যায়," মিলার বললো।

"হ্যা, যায় বৈকি। তা যদি করা থাকে তবে যে আপনি ইহুদি হবেনই এমন

www.boiRboi.blogspot.com

কোন কথা নেই। বহু জার্মানও তো খৎনা করিয়ে থাকে। তবে না যদি থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় আপনি ইহুদি নন।"

"না নেই আমার," মিলার ছোট্ট ক'রে উত্তর দিলো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো লিও। "বাঁচালেন। এবারে হয়তো আমরা সফল হতে পারবো।"

মাঝরাত অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। লিও তার ঘড়িতে চোখ বুলালো।

"খেয়েছেন আপনি?" মিলারকে জিজ্ঞেস করলো সে।

সাংবাদিকটি শুধু মাথা নাড়লো।

"মোট্টি, অতিথির জন্যে কিছু খাবার দাও।"

হাসতে হাসতে মোট্টি ঘরের দরজা দিয়ে বাড়ির ওপর দিকে চলে গেলো।

"দেখুন আজ রাত্রে আপনাকে এখানেই থাকতে হবে," লিও মিলারকে বললো, "একটা বিছানা নিয়ে আসবো আমরা। পালাবার চেষ্টা করবেন না যেনো। দরজায় তিনটা তালা আছে, বাইরে থেকে সবগুলো বন্ধ থাকবে। আপনার গাড়ির চাবি দিয়ে দিন, এইখানেই আপনার গাড়ি নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করছি। কয়েক সপ্তাহ ওটা যদি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে সেটাই ভালো। আপনার হোটেলের বিল আমরা মিটিয়ে দিয়ে মালপত্রও এখানে নিয়ে আসবো। সকালে উঠে আপনি আপনার মা এবং বান্ধবীকে দুটো চিঠি লিখবেন; তাঁদের জানিয়ে দেবেন যে আপনি কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসও হতে পারে, বাইরে বাইরেই থাকবেন, যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না সে সময়। বুঝলেন?"

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে গাড়ির চাবি বের ক'রে দিলো মিলার। লিও সেটা একজনকে দিয়ে দিতে সেও বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলো।

"সকালে আমরা আপনাকে গাড়িতে ক'রে বেরোথে নিয়ে যাবো, আমাদের এসএস অফিসারটির কাছে। তার নাম অ্যালফ্রেড অস্টার। তার সঙ্গেই আপনি থাকবেন। সে সব বন্দোবস্ত আমিই করবো। ইতিমধ্যে, আপনার জন্যে একটা নতুন নাম এবং পরিচয় আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা, ক্ষমা করবেন, আমাকে একটু আসতে হবে।"

উঠে চলে গেলো লিও। মোট্টি একটু পরেই খাবার নিয়ে ফিরে এলো। গোটা ছয় কম্বলও নিয়ে এসেছে সে। ঠাণ্ডা মুরগির মাংস আর আলুর সালাদ খেতে খেতে মিলার ভাবে এ কোথায় সে পড়লো!

বহুদূর উত্তরে, ব্রেমেনের জেনারেল হাসপাতালে, রাতের তৃতীয় প্রহরে, আরদার্লি তার ওয়ার্ড পাহারা দিচ্ছিলো। ঘরের শেষপ্রান্তে একটা বেডের চারপাশে লম্বা পর্দা ঘেরা, ওয়ার্ডের বাকি অংশ থেকে সেটা বিছিন্ন।

আরদার্লিটির নাম ছিলো হার্টস্টাইন, প্রায় মাঝবয়সী লোক। পর্দার ফাঁক দিয়ে

উঁকি মেরে বেডটার দিকে চেয়ে দেখলো। রুগী একেবারে নিথর হয়ে পড়ে আছে। মাথার ওপরে স্বল্পাভ আলো টিমটিম ক'রে জ্বলছে রাতভর। পর্দা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকলো, রুগীর হাত তুলে নিলো নাড়ী দেখবার জন্যে কিন্তু কিছু নেই, কখন নাড়ী বন্ধ হয়ে গেছে কে জানে।

ক্যান্সারে মৃত লোকটির ক্লিষ্ট মুখের দিকে আরদার্লি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তিন দিন আগের প্রলাপ বক্‌বার কথা মনে পড়ে যেতেই আস্তে ক'রে কম্বল নামিয়ে দিয়ে মৃতদেহের বাম হাতটা তুলে ধরলো। বাম বগলের নিচে একটা নম্বর উল্কি করা আছে দেখতে পেলো। নম্বরটা আর কিছুই নয়, মৃত ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ। নিশ্চিত প্রমাণ যে একসময় সে এসএস-এ ছিলো। এমনভাবে উল্কি ক'রে রক্তের গ্রুপ লিখে রাখার উদ্দেশ্য ছিলো যে রাইখে তাদের জীবন সবচেয়ে মূল্যবান, অতএব এসএস-এরা আহত হয়ে হাসপাতালে এলে অন্যসব সেনাদের চেয়ে আগেভাগেই যতোটুকু প্লাজমা আছে তাদেরই দিতে হবে। সেইজন্য সময় যাতে নষ্ট না হয়, উল্কি ক'রে রক্তের গ্রুপ বাম বগলের নিচে খোদাই ক'রে রাখা ছিলো প্রতিটি এসএস-এর পক্ষে অতি-আবশ্যক কর্তব্য।

হার্টস্টাইন মরা মানুষটার মুখে কম্বল টেনে দিলো। টেবিলের দেরাজ খুলে দেখলো যে অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের মধ্যে আছে একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। অবশ্য তাকে কুড়িয়ে আনা হয়েছিলো; পকেটে যা ছিলো সেগুলোই আছে এখানে। ড্রাইভিং লাইসেন্স খুলে হার্টস্টাইন দেখলো লোকটার বয়স এখন প্রায় উনচল্লিশ – জন্মতারিখ হলো ১৮ই জুন ১৯২৫; নাম র‍্যালফ গুন্থার কাল্‌ব।

আরদার্লি চুপিচুপি ড্রাইভিং লাইসেন্সটাকে নিজের সাদা কোটের পকেটে চালান ক'রে দিয়ে চললো রাতের ডিউটিরত ডাক্তারের কাছে, রুগীর মৃত্যু হয়েছে সেই খবর দিতে।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১১

পিটার তার মা এবং সিগিকে চিঠি লিখলো প্রায় মাঝ সকাল পর্যন্ত। ব'সে ব'সে মোট্টি পাহারা দিলো ততোক্ষণ। হোটেল থেকে জিনিসপত্র এসে গেছে, হোটেলের বিলও তারা মিটিয়ে দিয়েছে। দুপুরের একটু আগে দু'জনে রওনা দিলো বেরোথের উদ্দেশ্যে। চালক সেই গত রাতের লোকটাই। তবে গাড়িটা অন্য; রাতের মার্সিডিজটা নয়, তার জায়গায় একটা নীল রঙের ওপেল। মিলারের সাংবাদিকসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি চকিতে গাড়িটার নম্বর-প্লেটের দিয়ে ঘুরে গেলো। মোট্টি তা দেখে হাসলো। "ঘাবড়াবেন না। এটা ভাড়া করা গাড়ি, মিথ্যে নামে নেয়া হয়েছে।"

"বাহ্, পেশাদারদের সঙ্গে আছি জেনে নিশ্চিন্ত বোধ করছি।"

"না হয়ে উপায় কি বলুন?" মোট্টি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো। "ওডেসার বিরুদ্ধে লাগতে হলে পেশাদার না হলে তো কবেই মরে ভূত হয়ে যেতাম।"

গ্যারাজে দুটো ভাগ করা ছিলো। মিলার দেখলো দ্বিতীয় খোপটায় তার কালো জাগুয়ার দাঁড়িয়ে আছে। আগের রাতের আধা-গলা তুষারগুলো পড়ে পড়ে চাকাগুলোর নিচে পানি জমে গেছে, চক্‌চকে কালো শরীরটা বিদ্যুতের আলোয় দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

ওপেলে গিয়ে ঢুকতেই আবার তার মাথার ওপর দিয়ে কালো মোজা পরিয়ে দেয়া হলো। গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে গাড়িটা যেই প্রাঙ্গণ পেরিয়ে রাস্তায় উঠলো অমনি তাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির মেঝের ওপরে ফেলে দেয়া হলো। মিউনিখ শহরে আরো কিছুটা গিয়ে তবে মোট্টি তার চোখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিলো। গাড়িটা তখন ই-৬নং মহাসড়ক ধ'রে নুরেমবার্গ হয়ে বেরোথের পথে ছুটছে।

দৃষ্টির আবরণ খুলে যেতে মিলার দেখলো রাতে ভীষণ তুষারপাত হয়েছিলো। দু'পাশে ঢালু বনের প্রান্তর, বাভারিয়া অঞ্চল এখানে ফ্রাঙ্গোনিয়ায় এসে মিশেছে। সাদা ধবধবে মোটা চাদর বিছানো সেখানে। রাস্তার দু'পাশে পাতাহীন বিচ গাছের

www.boiRboi.blogspot.com

অরণ্যগুলোকে এখন ভোঁতা-ভোঁতা দেখাচ্ছে, তীক্ষ্ণতা আর নেই। ড্রাইভার আস্তে আস্তে সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে; উইন্ডস্ক্রিনের ওয়াইপার দুটো কাঁচের ওপর থেকে বরফের কণা মুছে দিচ্ছে।

ইঙ্গোলস্ট্যাডটে পৌঁছে রাস্তায় পাশের এক সরাইখানায় ওরা লাঞ্চ সেরে নিলো। সেখান থেকে নুরেমবার্গকে পূবে ফেলে এক ঘণ্টার মধ্যে বেরোথে পৌঁছে গেলো।

ছোট্ট শহর কিন্তু অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ। এই অঞ্চলটাকেই বাভারিয়ান সুইজরল্যান্ড বলা হয়ে থাকে। প্রতিবছর এই শহরে সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াগনারের স্মরণে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে থাকে। অ্যাডলফ হিটলরের সময় নাৎসিতন্ত্রে সব রথী-মহারথীরাই এখানে এসে ভিড় করতো; কারণ ওয়াগনার হিটলারের খুব প্রিয় ছিলেন, কারণ নর্ডিক উপকথার নায়কদের তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে অমর ক'রে রেখেছেন।

তবে জানুয়ারিতে শহরটা একদম নিরিবিলি থাকে; তুষারের কম্বল গায়ে দিয়ে যেনো সুপ্ত হয়ে ওঠে। ছবির মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ি। শহর থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা নির্জন রাস্তার পরে অ্যালফ্রেড অস্টারের কটেজ ধরনের বাড়ি। সেখানে যেতে যেতে সারা রাস্তায় তারা আর একটাও গাড়ি দেখেনি।

এসএস-এর প্রাক্তন অফিসারটি জানতো যে তারা আসবে। দীর্ঘদেহী আর সুপুরুষ চেহারা তার, নীল চোখ, মাথার সামনেই শুধু কিছু ধূসর রঙের চুল। এতো শীত সত্ত্বেও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল লাল আভা তার মুখে।

মোট্টি পরিচয়ের পালা চুকিয়ে অস্টারের হাতে লিও'র চিঠিটা দিলো। সেটা পড়তে পড়তে বাভারিয়ানটি বার কয়েক মিলারের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো।

পড়া শেষ হলে বললো, "বেশ, চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। তা কতোদিন ওকে আমি রাখতে পারবো?"

"এখনো আমরা তা সঠিক জানি না," মোট্টি জানায়, "তবে যতোদিন না তৈরি হচ্ছে, এখানেই থাকবে। তার একটা নতুন পরিচয়ও তো খুঁজে বের করার আছে। পরে আপনাকে আমরা জানাবো।"

একটু পরেই মোট্টি চলে গেলো।

অস্টার মিলারকে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। ঘর থেকে পড়ন্ত বেলার ম্রিয়মান আলো পর্দা ফেলে মুছে দিলো, তারপর আলো জ্বালিয়ে ঘর আলোময় ক'রে তুললো সে।

"হু...আপনি প্রাক্তন এসএস সদস্য সাজতে চান, কেমন?"

ঘাড় নাড়লো মিলার। "হ্যা।"

অস্টার তখন তার মুখের দিকে চেয়ে বলতে শুরু করলো, "বেশ, তাহলে

www.boiRboi.blogspot.com

আমাদের আরম্ভ করতে হবে কতোগুলো মৌলিক তথ্য থেকে। জানি না, আপনি আপনার মিলিটারি সার্ভিস কোথায় করেছেন, তবে আন্দাজ করতে পরি যে ওই বিশৃঙ্খল, গণতান্ত্রিক, প্রসূতি-মায়ের আদর-মাখানো বালখিল্য বাহিনীতে, যার নাম নব জার্মান আর্মি। প্রথম কথাটা আগে শুনে রাখুন । গত যুদ্ধে বৃটিশ, আমেরিকান বা রাশিয়ান যে কোন দলের যে কোন সুপটু রেজিমেন্টের সামনে নব জার্মান আর্মি টিকে থাকতে পারতো স্রেফ দশ সেকেন্ড। অথচ ওয়াফেন-এসএস ব্যক্তিগতভাবে লড়াই করলে গত যুদ্ধে তাদের পাঁচগুণ বেশি সংখ্যক মিত্রপক্ষের সেনাদের পিটিয়ে ছাতু ক'রে দিতে পারতো। দ্বিতয়ি কথা হলো, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সবল, সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল, সুচতুর এবং সুপটু হচ্ছে ওয়াফেন-এসএস। তারা যাই ক'রে থাকুক, এই তথ্য বদলাবার নয়। অতএব মিলার, চৌকষ হয়ে উঠতে হবে আপনাকে। এই বাড়িতে যতোদিন থাকবেন, ধরে নিন সেটাই রীতি। ঘরে আমি যেই মুহূর্তে এসে দাঁড়াবো, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াবেন। লাফানোটা কথার কথা নয়, সত্যি সত্যিই লাফাবেন। পাশ দিয়ে যেই আমি হেঁটে যাবো, খটাস্ ক'রে দুই গোড়ালি একত্র ক'রে খাড়া অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে থাকবেন যতোক্ষণ না আমি আপনার থেকে পাঁচ পা এগিয়ে যাই। আমি যদি এমন কোন কথা বলি যখন, আপনার উত্তর দিতে হবে, তাহলে বলবেন: 'জু বেফেবল, হের হউপ্টু র্মফ্যুয়েরার।' কি, পরিষ্কার?"

অবাক বিস্ময়ে মাথা নাড়লো মিলার।

"গোড়ালি মেলান," প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো অস্টার, "খটাস্ ক'রে শব্দ শুনতে চাই আমি। বেশ, হাতে যখন যখন আমাদের বেশি সময় নেই তখন আজ রাত থেকেই শিক্ষা শুরু হয়ে যাবে। রাতের খাবারের আগে আমরা র‍্যাংকগুলো শিখে নেবো, সিপাহী থেকে শুরু ক'রে পূর্ণ জেনারেল পর্যন্ত। যতোরকম এসএস সৈনিকের অস্তিত্ব ছিলো তদের সবার পদমর্যাদার খেতাব, সম্বোধন করবার রীতি, কলারে ওদের প্রতীকচিহ্ন – সব শিখবেন আপনি। তারপর আমরা তাদের যাবতীয় ইউনিফর্ম সম্বন্ধে পাঠ নেবো: এসএস'দের ভিন্নভিন্ন শাখার কি কি বিশেষত্ব, প্রতীকচিহ্নে কি কি পার্থক্য, কোন্ সময়ে উৎসবের ইউনিফর্ম, কখন লড়াইয়ের ইউনিফর্ম, কখন ফ্যাটিগ ড্রেস, সবকিছু। তারপর আপনাকে আমি তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সম্পূর্ন পাঠ দেবো; আপনি এসএস-এ থাকলে ওদের ডাচাউ প্রশিক্ষা-শিবিরে যে পাঠ পেতেন তার পুরোটা আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো। কিন্তু তারপর লিওকে এসে বলতে হবে কোন্ ইউনেটে আপনি যোগ দিয়েছিলেন, কোথায় কোথায় আপনি ছিলেন, আপনার কম্যান্ডিং অফিসার কে ছিলো, যুদ্ধের শেষে আপনার ভাগ্যে কি ঘটেছিলো, ১৯৪৫-এর পর থেকে আপনি কি করতেন। যাকগে সে সব। আপনার শিক্ষার প্রথম অংশ শেষ হতে হতে প্রায় দু-তিন সপ্তাহ লাগবে,

www.boiRboi.blogspot.com

আর সেই পাঠ্যসূচীও যথেষ্ট কঠিন। হ্যা, আর কখনো ভাববেন না যেনো যে এই সমস্তই ছেলে-খেলার ব্যাপার। একবার যদি ওডেসার ভেতরে গিয়ে ঢোকেন, সামান্য ভুল করেছেন কি আপনার লাশ ভাসবে নদী-নালায়। বিশ্বাস করুন, আমিও নেহায়েত দুধের ছেলে নই; তবুও ওডেসার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার পর আমি যে আমি, সেই আমাকেও তাদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হচ্ছে, সেইজন্যেই আমি এখানে নাম পাল্টিয়ে আছি।"

এডুয়াড় রশম্যানের সম্বন্ধে সন্ধান করবার পর থেকে এই প্রথমবার মিলার আতংকিত হয়ে উঠলো। বোধহয় খুব বেশি বড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে সে।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দশটার সময় ম্যাকেনসেন এসে হাজির ওয়েরউলফের অফিসে। হিলডা যে ঘরে ব'সে কাজ করে তার দরজাটা ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে ওয়েরউলফ তার ডেস্কের উল্টোদিকে মক্কেল বসার চেয়ারে ঘাতকটাকে বসিয়ে চুরুট ধরালো।

"বুঝলে, জনৈক ব্যক্তি – একজন সাংবাদিক – আমাদের কোন একজন কামেরাডের নতুন পরিচয় এবং নাম-ঠিকানা সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, চারদিকে খোঁজখবর নিয়ে বেড়াচ্ছে –"

জল্লাদটি বুঝে নেয় কি ব্যাপার। এই ধরনের ভনিতা তো সে কতোবার শুনেছে।

"সাধারণত এইসব ব্যাপার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না," ওয়েরউলফ বললো, "কেন না রিপোর্টারেরা শেষ পর্যন্ত কোন খোঁজখবর না পেয়ে এই সব কাজ ছেড়েই দেয়, আর ছেড়ে যদিও নাও দেয়, তবুও যাদের সম্বন্ধে খোঁজ নেয়, তারা এমন কিছু বিরাট লোক হয় না যে তাদের জন্যে আমাদের সময় ও অর্থব্যয় ক'রে তাদের বাঁচাতে হবে।"

"কিন্তু এবারে ব্যাপারটা অন্যরকম, কি বলেন?" নরম গলায় প্রশ্ন করে ম্যাকেনসেন। ওয়েরউলফ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, যেনো ভয়ানক দুঃখিত।

"হ্যা, দুর্ভাগ্যবশত এবারে এই রিপোর্টারটা না জেনেশুনেই বেশ একটা স্পর্শকাতর জায়গায় হাত দিয়েছে। দুর্ভাগ্য দু'পক্ষেরই – আমাদের দুর্ভাগ্য যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আর রিপোর্টারের দুর্ভাগ্য যে এতে তার প্রাণ যাবে। আমাদের যে সহকর্মীকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তিনি আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনার পক্ষে। রিপোর্টারটিও আবার অদ্ভুত মানুষ – বেশ পরিশ্রমী, মেধাবী আর যথেষ্ট কুশলী, অথচ কী আশ্চর্য, এই কামেরাডের ওপর তার যেনো ব্যক্তিগত আক্রোশ, প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধপরিকর একেবারে!"

www.boiRboi.blogspot.com

"উদ্দেশ্য কি?" ম্যাকেনসেন জিজ্ঞেস করলো। ওয়েরউলফ যে জানে না, সেই অজ্ঞানতার ছাপ বেশ ফুটে উঠলো তার ভ্রূকুটিতে।

চুরুট থেকে টোকা দিয়ে দিয়ে ছাই ঝেড়ে ফেলে ধীরে ধীরে বললো, "বুঝতে পারছি না আমরা, তবে আছে নিশ্চয়ই কিছু। যে ব্যক্তিটিকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁর অতীতের ইতিহাস শুধু ইহুদি বা তাদের বন্ধুদেরই উত্তেজিত ক'রে তুলতে পারে। অস্টল্যান্ডে একটা শিবিরে তিনি অধিনায়ক ছিলেন। অবশ্য কিছু লোক আছে, বিশেষ ক'রে বিদেশীরা, যারা কিছুতেই বুঝতে চেষ্টা করে না যে আমরা যেসব কর্মসূচী নিয়েছিলাম ওইসব জায়গায়, তার যৌক্তিকতা কতোখানি ছিলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই রিপোর্টারটি বিদেশী নয়, ইহুদিও নয়, এমন কিছু উল্লেখযোগ্য বামপন্থীও নয়, বিবেকের তাড়না খাওয়া ভেড়া-গোছের মানুষ নয় – তারা তো শুধু উচ্চবাচ্য করে, অন্য কোন কাজ তাদের সাধ্যের বাইর। অথচ এই লোকটা একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বয়সে যুবক, জার্মান আর্য, বাপ সেনা অফিসার ছিলো, দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে; এমন কোন পটভূমিও নেই যা দিয়ে বোঝা যায় যে আমাদের ওপর তার বিতৃষ্ণা জন্মালেও জন্মাতে পারে, আমাদের কামেরাডেনদের একজনকে খুঁজে বের করবার জন্যে এমন প্রাণপণ প্রচেষ্টাই বা তার কেন যে সাবধান ক'রে দেয়া সত্ত্বেও সমানে অনুসন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে? সেই জন্যেই তার মৃত্যুর আদেশ দিতেও দুঃখ হচ্ছে আমার। তবে উপায়ান্তর নেই, কাজটা করতেই হবে।"

"মেরে ফেলতে হবে?" ম্যাক-চাকু জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা, মেরে ফেলতে হবে," ওয়েরউলফ সম্মতি দিয়ে বললো।

"কোথায় আছে?"

"জানা নেই।" দুটো টাইপ করা পৃষ্ঠা তার দিকে এগিয়ে দিলো ওয়েরউলফ। "এই হচ্ছে আমাদের সেই লোক। নাম পিটার মিলার, পেশা অসুসন্ধানী রিপোর্টার। তাকে শেষবারের মতো দেখা গেছে বাড গোডেসবার্গের ড্রিসেন হোটেলে। সেখান থেকে এতোদিনে নিশ্চয়ই চলে গেছে, তবে সেই সূত্র ধরে এগুতে পারো। আরেকটা জায়গা হলো গিয়ে তার নিজের ফ্ল্যাট, যেখানে বান্ধবীকে নিয়ে সে বাস করে। যে সব পত্রপত্রিকার হয়ে সে কাজ করে তাদেরই কোন একটার প্রতিনিধি সেজে তার বাড়িতে খোঁজ নিও। তাহলেই মেয়েটি নিশ্চয়ই তোমাকে জানাবে, অবশ্য যদি সে নিজে তার ঠিকানা জেনে থাকে। বৈশিষ্টপূর্ণ একটা গাড়ি চালায় সে, যেটার পুরো বিবরণ এখানে দেয়া আছে।"

ম্যাকেনসেন বললো, "আমার টাকার দরকার হবে।"

ওয়েরউলফ কথাটা জানতো। দশ হাজার মার্কের একটা বান্ডিল টেবিলের ওপর

রেখে তার দিকে ঠেলে দিলো সে।

"তাহলে আদেশটা কি?" ঘাতক জানতে চাইলো।

"খুঁজে বের ক'রে তাকে শেষ ক'রে ফেলবে," ওয়েরউলফ জানালো।

www.boiRboi.blogspot.com

জানুয়ারির তেরো তারিখে মিউনিখে বসে লিও জানতে পারলো যে পাঁচদিন আগে ব্রেমনে জনৈক র‍্যাল্‌ফ গুন্থার কল্‌বের মৃত্যু ঘটেছে। তার উত্তর জার্মানিতে অবস্থিত প্রতিনিধিটি চিঠির সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ড্রাইভিং লাইসেন্সও পাঠিয়ে দিয়েছে।

প্রাক্তন এসএস-দের তালিকা আছে তার কাছে, তাতে কল্‌বের নাম, র‍্যাংক এবং নম্বর খুঁজে দেখলো, পশ্চিম জার্মানি থেকে প্রকাশিত ফেরারী এসএস-দের তালিকাও সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। কোনটাতেই কল্‌বের নাম-নম্বর খুঁজে পেলো না। ড্রাইভিং লাইসেন্সের ছবিটাতে লোকটার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর সিদ্ধান্ত নিলো সে।

মোট্টিকে খবর পাঠালো তার কর্মস্থল টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। শিফ্‌ট শেষ হয়ে গেলে সে চলে আসতেই কল্‌বের ড্রাইভিং লাইসেন্সটা তার সামনে মেলে ধরে লিও বললো, "এই হচ্ছে আমাদের লোক, বুঝলে? উনিশ বছর বয়েসে স্টাফ-সার্জেন্ট ছিলো, যুদ্ধ শেষ হবার অল্প ক'দিন আগে প্রমোশন পায়। নিশ্চয়ই তার সম্বন্ধে তথ্যের ভীষণ অভাব রয়েছে। কল্‌বের মুখের সঙ্গে মিলারের মুখের একটুও মিল নেই। মিলারের মুখে মেক-আপ দিলেও এরকম হওয়া মুশকিল। তাছাড়া সাজানো মুখ আমার পছন্দ না, কাছ থেকে ধরা পড়ে যায়। তবে উচ্চতা আর গড়ন প্রায় মিলারের মতোই। অতএব নতুন একটা ছবি লাগাতে হবে। তাড়াতাড়ির নেই কিছু। ছবিটার ওপরে ব্রেমেন পুলিশ ট্র্যাফিক বিভাগের একটা নকল সিল মারতে হবে। সেটার বন্দোবস্ত করো।"

মোট্টি চলে যেতেই ব্রেমেনের একটা নম্বর ঘুরিয়ে লিও কিছু নির্দেশ দিয়ে দিলো।

"বেশ, ভালো," ছাত্রকে প্রশংসা ক'রে বললো অ্যালফ্রেড অস্টার। "আচ্ছা, এখন গানগুলো শুরু করা যাক। হর্স্ট-ওয়েসেল গানের নাম শুনেছেন?"

"হ্যা, নাৎসিদের কুচকাওয়াজের গান," মিলার বললো।

প্রথম কয়েকটা ছত্র গুনগুন ক'রে গেয়ে শোনালো অস্টার।

"ও, হ্যা, মনে পড়েছে, শুনেছিলাম। কিন্তু কথাগুলো মনে নেই।"

"প্রায় বারোটার মতো গান আপনাকে শেখাবো আমি," অস্টার বললো, "যদি, বলা তো যায় না, জিজ্ঞেস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে এইটাই হচ্ছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো কামেরাডেনদের মধ্যে গিয়ে পড়লে দলবদ্ধভাবে গাইতেও হতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারে। না জানার অর্থ মৃত্যুদণ্ড। অতএব, শুরু করুন..."

ঊর্ধ্বে মোদের পতাকা,
কাতারে মোদের একতা...

সেদিন তারিখ ছিলো ১৮ই জানুয়ারি।

মিউনিখ সোয়েইজার হফ হোটেলের বারে ব'সে ব'সে ককটেলে চুমুক দিচ্ছিলো ম্যাকেনসেন। বিভ্রান্তির কারণটা একটু চিন্তা ক'রে দেখতে চায়। মিলারের চেহারা তো এখন তার মনে একেবারে স্পষ্ট গেঁথে আছে; তার গাড়ির চেহারাটাও, কারণ জাগুয়ার গাড়ির এজেন্টের কাছ থেকে এক্সকে-১৫০ মডেলের ক্যাটালগ এনে গাড়ির ছবিটাও মনে এঁকে রেখেছে। অথচ না গাড়ি, না মানুষ কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না সে।

বাড গোটেসবার্গের সূত্র ধরে অচিরেই পৌঁছে গিয়েছিলো কোলোন এয়ারপোর্টে। সেখান থেকে জানা গেলো যে মিলার লন্ডনে উড়ে গিয়েছিলো এবং ছত্রিশ ঘন্টার মধ্যেই নববর্ষের প্রারম্ভে ফিরেও এসেছিলো। তার পর থেকেই তার এবং তার গাড়ির কোন খবর নেই।

মিলারের ফ্ল্যাটেও গিয়েছিলো সে। হাসিখুশি মেয়েটির সঙ্গে কথাও হয়েছে। কিন্তু মিউনিখের ডাকঘরের ছাপওলা একটা চিঠি দেখানো ছাড়া আর কিছুই মেয়েটি বলতে পারেনি। চিঠিটাতে লেখা ছিলো যে মিলার কিছুদিনের জন্যে সেখানেই থাকবে।

অথচ এক সপ্তাহ ধরে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলো, মিউনিখ শহরে কোন হদিসই নেই। প্রতিটি হোটেল, পার্কিং স্পেস, গ্যারেজ, পেট্রল পাম্প সব খুঁজেছে, কিছু নেই। যেনো লোকটা পৃথিবীর বুক থেকে হাওয়া হয়ে গেছে।

গ্লাস খালি ক'রে দিয়ে ম্যাকেনসেন চললো টেলিফোনের উদ্দেশ্যে; ওয়েরউলফকে সব জানাতে হবে। অথচ কল্পনাও করতে পারলো না যে দেড় হাজার গজের মধ্যেই তার কাঙ্খিত বস্তু দাঁড়িয়ে আছে – একটামাত্র হলুদ ডোরাওলা কালো জাগুয়ার। দেয়াল-ঘেরা প্রাচীন সামগ্রীর একটা বিপণির প্রাঙ্গণে সেটা তখন দাঁড়িয়ে ছিলো। সেই প্রশস্ত বাড়িটার গভীরে বাস করতো লিও এবং সেখান থেকেই চালাতো তার সেই প্রায়-উন্মাদ গুপ্ত সঙ্ঘটিকে।

ব্রেমেন জেনারেল হাসপাতালে সাদা কোট-পড়া এক জন লোক ধীরে ধীরে রেজিস্ট্রারের অফিসে এসে ঢুকলো। তার গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলছে যেনো নবাগত কোন হাউস সার্জেন।

অভ্যর্থনা ঘরে ছিলো এক মেয়ে যে একাধারে রিসেপশনিস্ট এবং অফিস-

www.boiRboi.blogspot.com

সহকারী। তাকে এসে লোকটি বললো, "আমাদের একজন রুগী, র‍্যাল্‌ফ গুন্থার কল্‌ব'র মেডিক্যাল ফাইলটা দরকার।"

হাউস-সার্জেনটিকে চিনতে পারলো না মহিলা। তবে তাতে কিছু যায় আসে না, এমন তো কতোই আছে, গণ্ডায় গণ্ডায়। ফাইলিং ক্যাবিনেটের মধ্যে নামগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলো, একটি নথিতে কল্‌ব নামটি চোখে পড়তেই সেটা টেনে বের ক'রে হাউস-সার্জনের হাতে দিলো। ঠিক তখনি ফোনটা বেজে উঠতে সেটা ধরতে চলে গেলো মেয়েটা।

চেয়ারে ব'সে পড়ে নথিটার পাতা উল্টে গেলো হাউস-সার্জেন, জানা গেলো রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলো কল্‌ব, সেখান থেকে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে ক'রে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিলো। পরীক্ষা ক'রে জানা গিয়েছিলো যে তার পেটে সাংঘাতিক ধরনের ক্যান্সার যেটা প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। পরে অপারেশন না করবারই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। রুগীকে ওষুধের ওপরেই রাখা হয়েছিলো, আশা ছেড়ে দিয়ে। শেষের দিকে শুধু বেদনানাশক ওষুধ দেয়া হোতো। ফাইলের শেষ পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো:

'৮ই এবং ৯ই জানুয়ারির অন্তর্বর্তী রাতে রুগীর মৃত্যু ঘটেছে। মৃত্যুর কারণ: প্রধান অন্ত্রের ফেঁটে যাওয়া। নিকটতম আত্মীয় কেউ নেই। শবদেহ ১০ই জানুয়ারি তারিখে মিউনিসিপ্যাল লাশঘরে জমা দেয়া হয়েছে।'

যে ডাক্তারের অধীনে কেসটা ছিলো বিবৃতিটাতে তারই স্বাক্ষর রয়েছে।

হাউস-সার্জন ফাইল থেকে পৃষ্ঠাটা খুলে নিয়ে নতুন একটা পৃষ্ঠা আঁটকে দিলো, যেটাতে লেখা ছিলো:

'ভর্তির সময়ে রুগীর অবস্থ খারাপ থাকা সত্ত্বেও ওষুধের প্রভাবে ধীরে ধীরে রোগ গিয়েছিলো। ১৬ই জানুয়ারি তারিখে রুগীর অবস্থা স্থানান্তর করবার উপযোগী ব'লে গণ্য হয়। রুগীর নিজস্ব অনুরোধ অনুসারে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে ক'রে পূর্ণ বিশ্রামের জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হয় ডেলমেনহার্স্টের আরকাডিয়া ক্লিনিকে।'

নিচে একটা দূর্বোধ্য স্বাক্ষর।

হাউস-সার্জন মিষ্টি হেসে ফাইলটা মেয়েটার হাতে ফেরত দিয়ে চলে গেলো। সেদিন তারিখ ছিলো ২২শে জানুয়ারি।

তিনদিন পরে লিও এমন একটা খবর পেলো যা দিয়ে তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। উত্তর জার্মানির কোন একটা বুকিং এজেন্সির জনৈক কেরানী তাকে খবর পাঠালো যে ব্রেমারহ্যাভেনের একটি বিশেষ রুটির কারখানার মালিক তার নিজের এবং তার বৌয়ের জন্যে শীতকালে প্রমোদভ্রমণের টিকেট কেটে ফেলেছে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি, রবিবার তারা ব্রেমারহ্যাভেন থেকে রওনা দেবে, ক্যারিবিয়ানে কাটাবে চার সপ্তাহ। লিও জানতো যে যুদ্ধের সময় লোকটা এসএস-

www.boiRboi.blogspot.com

এর কর্নেল ছিলো এবং পরে ওডেসার সদস্য হয়। মোট্রিকে ডেকে বললো যে রুটি বানানো তথ্য সম্পর্কে যেনো একটা বই কিনে নিয়ে আসে সে।

ওয়েরউলফ হতবুদ্ধিকর হয়ে গেলো। তিন সপ্তাহ ধরে তার প্রতিনিধিরা জার্মানির সব বড় বড় শহর চষে ফেলেলো, অথচ মিলার নামে লোকটির বা তার কালো জগুয়ার গাড়ির কোনই পাত্তা পাওয়া গেলো না। হাম্বুর্গের ফ্ল্যাট এবং গ্যারেজে সর্বক্ষণ পাহারা দেয়া হচ্ছে। অডর্ফে এক মাঝবয়সী মহিলার কাছে যাওয়া হয়েছিলো, কিন্তু সেখানেও শোনা গেলো ছেলে কোথায় আছে তিনি জানেন না। সিগি নামে একটি মেয়ের কাছে অনেকবার টেলিফোন করা হয়েছিলো, এই ভান ক'রে যে কোন একটা বড় সচিত্র পত্রিকার সম্পাদকের কাছ থেকে সেটা করা হয়েছে। খুব বড় কাজ আছে মিলারের জন্যে, অনেক টাকা – কিন্তু মেয়েটি শুধুই বলে যে তার জানা নেই তার ছেলেবন্ধু এখন কোথায় আছে।

হাম্বুর্গে তার ব্যাংকেও খোঁজ নেয়া হয়েছে। কিন্তু নভেম্বরের পরে আর কোন চেক সে ভাঙায়নি। তার মানে, সে একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। অথচ, জানুয়ারির ২৮ তারিখ হয়ে গেলো। আর তো দেরি করা যায় না। ওয়েরউলফ একটা টেলিফোন করতে বাধ্য হলো। খুবই দুঃখে যেনো সে রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরালো।

বহুদুরে উঁচু পাহাড়ে ওপরে একটি লোক আধ ঘণ্টা পরে টেলিফোন রেখে দিয়ে কয়েক মিনিট ধ'রে নিজের মনে মনে শাপশাপান্ত করলো। শুক্রবারের সন্ধ্যা মাত্র দু'দিনের বিশ্রামের জন্যে তার এই অবাসে এসেছে সে, এমন সময় এই টেলিফোন।

সুসজ্জিত পড়বার ঘরটার জানালায় এসে দাঁড়িয়ে বাইরে চেয়ে চেয়ে দেখলো। লনের ওপরে তুষার পরে পরে পুরু আস্তরণ পড়ে গেছে, জানালা দিয়ে আলোর রশ্মি সেখানে ছড়িয়ে গেছে। এস্টেটের সীমানা জুড়ে উঁচু উঁচু পাইনগাছ, সেখানেও গিয়ে পড়েছে আলোর দ্যুতি।

কতোকালের তার উচ্চাশা এইভাবে জীবনধারণ করার। ছেলেবেলায় বড়দিনের যখন দুটিকে দেখতো গ্রাৎসের আশেপাশে পাহাড়গুলোর ওপর এমনি কতো সুন্দর সুন্দর বড়িঘর – ধনী বড়লোকদের সম্পত্তি – তখন থেকেই তার এই অভিলাষ। এখন তা পেয়েছেও, খুব ভালো লাগে তার।

এই জায়গাটা বিয়ার কারখানার শ্রমিকের বাড়ি থেকে শতগুণ ভালো যেখানে সে বড় হয়েছে। রিগার বাড়িটা থেকেও অনেক ভালো যেখানে সে চার বছর কাটিয়েছে; বুয়েনোস আইরিসের সুসজ্জিত আবাস থেকেও ভালো বা কায়রোর হোটেল কামরা থেকেও। এমনি ধরনের আবাস তো তার চিকালের কাম্য ছিলো।

www.boiRboi.blogspot.com

টেলিফোনে খবরটা শুনে বেশ বিচলিত হয়ে উঠলো। অপর প্রান্তের লোকটিকে যদিও জানিয়ে দিলো যে তার বাড়ির আশেপাশে কাউকে দেখা যায়নি, কারখানাতেও না, তার সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করছে এমন কোন কথাও শোনেনি, তবুও চিন্তিত হয়ে উঠলো সে। মিলার? কোন্ শালা বানচোত এই মিলার? ফোনে অবশ্য তাকে বলা হয়েছে যে সাংবাদিকটাকে ঠিকমত দাওয়াই দেয়া হবে, তবুও আতংক সম্পূর্ণভাবে যাচ্ছে না। তার অন্যান্য সতীর্থেরা এবং টেলিফোনের লোকটাও যে বেশ আতংকিত স্পষ্ট বোঝা গেলো যখন তাকে ব'লে দেয়া হলো যে তারা ঠিক করেছে আগামীকালই তার জন্যে একজন ব্যক্তিগত দেহরক্ষী পাঠিয়ে দেবে, পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সেই লোকটা তার সঙ্গেই থাকবে এবং তার ড্রাইভারের কাজও করবে।

পড়ার ঘরের জানালার পর্দাটা টেনে দিলে নিমেষে শীতের প্রকৃতি চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ঘরটার দরজায় মোটা পরতের প্যাড লাগানো আছে, কাজেই বাড়ির অন্য অংশ থেকে কোন শব্দ এখানে আসে না। শুধু একটিমাত্র আওয়াজ ঘরের মধ্যে, অগ্নিকুণ্ডের; লেলিহান আগুনের শিখাগুলো নেচে নেচে উঠছে, ঘরটায় ছড়িয়ে দিচ্ছে দারুণ উষ্ণতা। তার দু'পাশে লোহার ওপরে নানান কারুকার্য, আঙুরলতা আর বাঁকা-বাঁকা নক্শা করা। বাড়িটাকে কিনে আধুনিক ঢঙে ঢেলে সাজানোর সময়েও এই জিনিসটাকে বদলায়নি সে।

দরজা খুলে গেলে বৌয়ের মাথাটা দেখা গেলো। "ডিনার তৈরি।"

"আসছি," এডুয়ার্ড রশম্যান বললো।

পরদিন সকালে শনিবারে অস্টার এবং মিলারের কাছে কয়েকজন লোক এলো মিউনিখ থেকে। গাড়ি ক'রে এসেছে চার জন – লিও, মোট্টি, গাড়ির চালক এবং আরেকজন যার হাতে একটা কালো ব্যাগ।

বসার ঘরে পৌঁছে লিও ব্যাগওলা লোকটিকে বললো, "তুমি বরং বাথরুমে গিয়ে তোমার যন্ত্রপাতি সাজাও।"

লোকটা মাথা নেড়ে ওপরে চলে গেলো।

লিও নিজে টেবিলের পাশে ব'সে অস্টার এবং মিলারকে বসতে বললো। মোট্টি রইলো দরজার পাশে, হাতে একটা ফ্ল্যাশ-লাগানো ক্যামেরা।

একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সে লিও এগিয়ে দিলো মিলারের হাতে। ছবির জায়গাটা খালি। বললো, "আপনাকে এই লোকটার ছদ্মবেশ নিতে হবে। র‍্যাল্‌ফ গুন্থার কল্‌ব, জন্ম ১৮ই জুন ১৯২৫। তার মানে যুদ্ধের শেষে আপনার বয়স উনিশ বছর – প্রায় বিশ। এখন আপনি আটত্রিশ বছরের। আপনার জন্মস্থান ব্রেমেন, সেখানেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। দশ বছর বয়সে, ১৯৩৫ সালে, আপনি হিটলার-তরুণ দলে যোগ

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়েছিলেন, জানুয়ারি ১৯৪৪-এ, মানে আঠারো বছর বয়সে, এসএস-এ ভর্তি হয়েছিলেন। আপনার বাপ-মা দু'জনেই গত। ১৯৪৪ সালে ব্রেমেন ডকে বোমাবর্ষণের সময় তারা দু'জনেই প্রাণ হারায়।"

মিলার ড্রাইভিং লাইসেন্সটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

অস্টার জিজ্ঞেস করলো, "কিন্তু এসএস-এ তার জীবনবৃত্তান্তটা কি? আমরা তো এদিকে প্রায় তথ্যের অভাবে বসেই আছি।"

"কেমন দেখছেন?" লিও প্রশ্ন করলো। মিলারের দিকে একটুও তাকালো না।

"বেশ ভালো," অস্টার জানালো, "গতকাল আমি দু'ঘণ্টা ধরে জেরা করেছি, পাস হয়ে গেছে। অবশ্য তার এসএস জীবনের বিশেষ তথ্যগুলো কিছুই জানে না...কি ক'রে তা জানবে?"

লিও মাথাটাথা নেড়ে অ্যাটাচিকেস থেকে কিছু কাগজপত্র বের ক'রে আনলো।

"কল্‌বের এসএস জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না," সে বললো, "অবশ্য তেমন কিছুই নেই নিশ্চয়ই, নইলে ফেরারী তালিকায় তার নাম থাকতো। কেউ তার নামও শোনেনি। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, ওডেসাও নিশ্চয়ই তার নাম জানে না। অসুবিধা হলো শুধু, তাহলে তার পালিয়ে থাকবার বা ওডেসার কাছ থেকে সাহায্য চাইবার প্রয়োজনটা কি? সেইজন্যে আমরাই তার একটা জীবন বানিয়ে নিয়েছি। এই যে, এখানে লেখা রয়েছে।"

কাগজগুলো অস্টারের হাতে দিয়ে দিলো। মন দিয়ে সেগুলো পড়ে অস্টার বললো, "ভালোই। জানা তথ্যগুলোর সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। আর এরকম হলে ওর পক্ষে পালিয়ে থাকবার যথেষ্ট কারণও আছে।"

লিও খুব খুশি হলো ।

"ওকে এগুলো শেখাবেন, বুঝেছেন? হ্যা, ভালো কথা, ওর জন্যে একজন গ্যারান্টারও খুঁজে পেয়েছি। ব্রেমারহ্যাভেনের একজন লোক, আগে যে এসএস-এর কর্নেল ছিলো, আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি জাহাজে ক'রে সমুদ্রভ্রমণে বেরুচ্ছে। লোকটা একটা রুটির কারখানার মালিক। মিলার যখন ওদের কাছে গিয়ে পরিচয় দেবে – সেটা অবশ্য ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পরেই হতে হবে – তখন ওর কাছে এই লোকটার একটা চিঠি থাকবে; তাতে লেখা থাকবে যে তার কর্মচারী কল্‌ব সত্যিসত্যিই এসএস-এর লোক এবং সত্যিই বিপদে পড়েছে সে। ততোদিনে রুটিওলা গভীর সাগরে, চেষ্টা করলেও তারা তার সঙ্গে সংযোগ ক'রে চিঠিটা যাচাই ক'রে নিতে পারবে না। হ্যা, আর আপনি শুনুন," মিলারকে একটা বই এগিয়ে দিয়ে বললো, "রুটি বানানোর বিদ্যা শিখে নিন। ১৯৪৫-এর পর থেকেই তো আপনি রুটির কারখানার শ্রমিক।"

তাকে কেবল জানালো না যে রুটি-কারখানার মালিক মাত্র চার সপ্তাহ বাইরে

থাকবে – ফিরে আসার পর তো মিলারের জীবন হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

"এখন আমার নাপিত আপনার চেহারাটা একটু বদলে দেবে," মিলারকে লিও জানালো, "তারপর ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্যে আমরা আপনার ছবি তোলা হবে।"

ওপরতলার বাথরুমে নাপিত মিলারের চুল একদম ছোট্ট ক'রে ছেঁটে দিলো; জীবনে কোনদিন এমন কদমছাঁট ছাঁটেনি মিলার। চুলের সামান্য রেখামাত্র অবশিষ্ট, যার মধ্যে দিয়ে ন্যাড়ামুণ্ডু উঁকি দিচ্ছে। বয়স যেনো একলাফে বেড়ে গেলো। মাথার বাম পাশে ক্ষুর দিয়ে সোজা সিথি কেটে দিলো। চোখের ভুরু টেনে টেনে প্রায় সেগুলোকে তুলেই ফেললো।

"ন্যাড়া ভুরুতে মানুষ খুব একটা বুড়ো হয়ে যায় না," নরসুন্দর গল্প গল্প শুরু করার ভঙ্গীতে বললো, "তবে তা করলে বয়স বোঝা যাবে না, ছয়-সাত বছর এদিক-ওদিক হয়ে যাবেই। হ্যা, আরেকটা কথা, আপনাকে একটা গোঁফ গজাতে হবে, পাতলা মতন, আপনার মুখের সমান। তাতে ক'রে বয়স অনেক বেড়ে যাবে। তিন সপ্তাহে গজিয়ে নিতে পারবেন না?"

মিলার তো জানে তার গোঁফ কতো তাড়াতাড়ি বাড়ে। বললো, "নিশ্চয়ই।" আয়নায় নিজের মুখ দেখলো। প্রায় মধ্য তিরিশের ব'লে মনে হচ্ছে এখন। গোঁফ উঠলে অন্তত আরো চারটা বছর তো বয়স বাড়বে।

নিচতলায় নেমে আসতেই, মিলারকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো সাদা একটা চাদরের সামনে। অস্টার এবং লিও দু'জনে মিলে ধরাধরি ক'রে চাদরকে লম্বা ক'রে ঝুলিয়ে রাখলো। মোট্টি তার পুরো মুখের কয়েকটা ছবি তুলে নিলো।

"ব্যস, এতেই হবে," মোট্টি বললো, "তিন দিনের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়ে দেবো।"

"তাহলে, কল্‌ব," কয়েকদিন ধরেই তাকে এই নামে ডাকছে অস্টার, "তোমার ট্রেনিং হয়েছিলো ডাচাউ এসএস শিক্ষাশিবিরে। ১৯৪৪-এর জুলাইয়ে তোমাকে ফ্রসেনবুর্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিলো। ১৯৪৫-এর এপ্রিলে যে দলটা অ্যাবওয়েবের নেতা অ্যাডমিরাল ক্যানারিসকে হত্যা করেছিলো সেই দলের কম্যান্ড ছিলো তোমার হাতে। হিটলারকে হত্যা করবার জন্যে যে চক্রান্ত হয়েছিলো ১৯৪৪-এর জুলাইয়ে, তাতে আরও কিছু আর্মি অফিসারকে সন্দেহ করেছিলো গেস্টাপো বাহিনী, এবং তাদের অনেককেই হত্যা করবার ব্যাপারে তোমার হাত ছিলো। কাজেই এখনকার কর্তৃপক্ষ তোমাকে তো গ্রেপ্তার করতে চাইবেই, অ্যাডমিরাল ক্যানারিস বা তার লোকেরা তো ইহুদি ছিলো না। সেকথা ভুললে চলবে না। আচ্ছা, কাজে নামা যাক, স্টাফ সার্জেন্ট।"

মোসাদের সাপ্তাহিক মিটিংটা প্রায় শেষ হয়ে আসতেই জেনারেল আমিত হাত তুলে বললেন, "শুনুন, আর একটা ব্যাপার আছে, অবশ্য সেটাকে আমি ততোখানি গুরুত্ব

www.boiRboi.blogspot.com

দেই না। মিউনিখ থেকে লিও জানিয়েছে, কিছুদিন ধরে সে এক জার্মান-আর্যকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি ক'রে নিচ্ছ ওডেসার ভেতরে ঢোকাবার জন্যে, লোকটা নাকি নিজের থেকেই কোন কারণে এসএস-এর ওপর দারুণ খাপ্পা।"

"কেন, কারণটা কি?" সন্দেহভরা প্রশ্ন জাগলো কারোর কণ্ঠে।

জেনারেল আমিত শূন্যে হাতটা ছুঁড়ে বললেন, "নিজস্ব কোন কারণ আছে তার, যে জন্যে সে রশম্যান নামে এসএস-এর জনৈক ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বের করতে চায়।"

অত্যাচারিত দেশগুলোর জন্যে যে দপ্তর রয়েছে তার প্রধান একজন প্রাক্তন পোলিশ ইহুদি, সে হুট ক'রে মাথা তুলে বললেন, "এডুয়ার্ড রশম্যান...রিগার কসাই?"

"হ্যা, তাকেই।"

"ইস্, তাকে যদি একবার হাতে পেতাম, শোধ নিয়ে নিতাম।"

জেনারেল আমিত মাথা ঝাঁকালেন। "না, আমি তো আপনাদের আগেই বলেছি, শোধ-প্রতিশোধের পালা আর ইস্রায়েলের নেই। আমার ওপর কঠিন আদেশ দেয়া আছে। রশম্যানকে যদি লোকটা খুঁজেও পায় কোনরকম খুন-খারাবি করা যাবে না। বেন গালের ব্যাপারটার পর এরকম কিছু ঘটলে অ্যাডেনয়ের ক্ষেপে যাবে। মুশকিল কি জানেন, জার্মানিতে কোন ভূতপূর্ব নাৎসি মারা গেলেও ইস্রায়েলি অনুচরদের দোষ দেয়া হয়।"

"তাহলে এই তরুণ জার্মানকে দিয়ে আমাদের কি লাভ?" শাবাখের প্রধান জানতে চাইলেন।

"আমি তাকে দিয়ে অন্যান্য নাৎসি বৈজ্ঞানিকদের খবর জানতে চাই, যাদের এই বছরে হয়তো কায়রোতে পাঠানো হবে। আমাদের পক্ষে সেটাই সর্বপ্রধান, পয়লা নম্বরের, কাজ। তাই জার্মানিতে আমাদের এক জন চর পাঠাতে চাই যে এই যুবকটিকে চোখে চোখে রাখবে। শুধু পাহারায় রাখা, আর কিছু না।"

"এ রকম লোক আছে আপার কাছে?"

"হ্যা," জেনারেল আমিত বললেন, "আছে। ভালো লোক, বিশ্বস্তও। সে শুধু ওই জার্মানটাকে অনুসরণ করবে, পাহারায় রাখবে তার কাজের ওপর, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে খবর পাঠাবে। জার্মান ব'লে অনায়াসে চালিয়ে নেবে সে। লোকটা একজন ইয়েক্কে, কার্লশ্রু থেকে এসেছে।"

"কিন্তু লিও? সে যদি তার নিজের মতো ক'রে কিছু করতে চায়, তার শোধবোধের হিসেব মিলিয়ে নেবার জন্যে?" কেউ একজন প্রশ্ন করলো।

"না, লিওকে যা বলা হবে তাই সে করবে," রেগে উঠলেন জেনারেল আমিত, "শোধবোধের পালা শেষ, বললাম না।"

www.boiRboi.blogspot.com

সেই সকালে বেরোথে মিলারকে আরেকবার পরখ ক'রে নিচ্ছিলো অ্যালফ্রেড অস্টার।

"এসএস-দের ছুরির বাঁটে কি কি লেখা থাকে?"

"রক্ত এবং সম্মান।"

"ছুরি কখন তাদের উপহার দেয়া হয়?"

"শিক্ষাশিবিরের শেষে পাসিং-আউট প্যারেডের সময়।"

"বেশ। অ্যাডলফ হিটলারের ওপর বিশ্বস্ততার শপথটা মুখস্থ বলো।"

গড়গড় ক'রে মিলার নির্ভুলভাবে সেটা আওড়ালো।

"এসএস-দের রক্ত-শপথ আবৃত্তি করো।"

সেটাও করলো মিলার।

"মৃত্যু-মস্তক প্রতীকের অর্থ কি?"

চোখ বন্ধ ক'রে মিলার তাকে যা শেখানো হয়েছে ব'লে গেলো:

"মৃত্যু-মস্তকের চিহ্ন প্রাচীন জার্মান উপকথা থেকে গৃহীত। টিউটনিক যোদ্ধাদের মধ্যে কোন কোন দলে নেতা এবং পরস্পরের প্রতি শাশ্বত ঐক্যের প্রতীক হিসাবে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হোতো। শুধু যে আমৃত্যুই তারা একে অন্যেকে রক্ষা করবে তাই নয়, সমাধিভূমিতেও অনুসরণ করবে এবং মৃত্যুর অপর পারে ভালহাল্লাতেও। সেইজন্যেই করোটি এবং ক্রশ করা দুটো অস্থি...মরণ পেরিয়ে যা ভিন্ন জগতের অর্থবহ।"

"বেশ। এসএস হলেই কি তাকে মৃত্যু-মস্তকবাহিনীর সদস্য হতে হোতো?"

"না, কিন্তু শপথবাক্য একই।"

অস্টার উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা টানটান ক'রে নিলো।

"মন্দ নয়। প্রায় সবই শিখে গেছো দেখছি, আর কিছু মনে করতে পারছি না। এখন এসো তোমার সেনাবাহিনী এবং কর্মস্থলে কিছু কথা তোমাকে শিখিয়ে দেয়া যাক। শুধুমাত্র একটা জায়গাতেই তোমার পোস্টিং হয়েছিলো, ফ্লসেনবুর্গ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সেখানে..."

এথেন্স ছেড়ে মিউনিখের দিকে চলেছে অলিম্পিক এয়ারওয়েজের বিমানটা। জানালার পাশে চুপচাপ ব'সে আছে এক লোক পারিপার্শ্বিক ভুলে। তার পাশে ব'সে আছে একজন জার্মান ব্যবসায়ী। কয়েকবার সে চেষ্টা করলো সহযাত্রীটির সঙ্গে আলাপ জমাতে, কিন্তু তার ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে প্লেবয় ম্যাগাজিনে মন দিলো। সহযাত্রীটি তখন তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে; পায়ের নিচে ঈজিয়ান সাগর পেরিয়ে গেলো, পূর্ব ভূমধ্যসাগরের রৌদ্রময় অঞ্চল ছেড়ে বিমানটা এখন ডোলোমাইট এবং বাভারিয়ান আল্পসের হিমশীর্ষ পাহাড়ের দিকে চলছে।

ব্যবসায়ীটি অবশ্য বুঝতে পেরেছিলো যে তার সহযাত্রী নিঃসন্দেহে জার্মান।

www.boiRboi.blogspot.com

তার ভাষা যেমন চমৎকার ত্রুটিহীন, তেমনি দেশটার সম্বন্ধে তার জ্ঞানও নির্ভুল। গৃসের রাজধানীতে কিছু বেচাকেনার কাজ সেরে দেশে ফিরতে ফিরতে ব্যবসায়ীটি বুঝতে পারে যে তার পাশের আসনে জানালার পাশে যে ব'সে আছে, সেও তারই স্বদেশের লোক।

কিন্তু ভুল হলো তার। পাশের লোকটা তেত্রিশ বছর আগে জার্মানিতে জন্মেছিলো বটে যখন তার নাম ছিলো জোসেফ কাপলান, কার্লশ্রুয়ের একজন দর্জির ছেলে। হিটলার যখন ক্ষমতায় এলো তখন সে তিন বছরের শিশু; কালো গাড়িতে উঠিয়ে তার বাপ-মাকে যখন নিয়ে গেলো তখন সে সাত বছরের। আরো তিনটি বছর কেটে গেলো ছাদের চোরাকুঠরিতে লুকিয়ে থেকে। দশ বছর বয়সে, ১৯৪০ সালে ধরা পড়ে গেলো; গাড়িতে ক'রে তাকেও নিয়ে যাওয়া হলো। কনসেনট্রেশন শিবিরে কেটে গেলো কৈশোরের প্রথম দিনগুলো; ঐ বয়সের যতো ক্ষিপ্রতা, অৎপরতা, অসম সাহস, সব লেগে গেলো শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখতেই। ১৯৪৫ পর্যন্ত কোনমতে টিকে থাকলো, চোখে তখন শুধু বন্যপশুর মতো প্রবৃত্তিজাত আতংক আর সন্দেহ। তখন একদিন, মনে পড়ে, একটা বিদেশী লোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো, নাকি সুরে কথা বলেছিলো; তার হাত থেকে হারশে বার নামে একটা জিনিস নিয়ে ছুটে পালিয়েছিলো সে, শিবিরের একটা কোণায় গিয়ে খেতে বসেছিলো, কিন্তু তার আগেই জিনিসটা তার হাত থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিলো।

দু'বছর পরে, কয়েক পাউন্ড ওজন বেড়েছে তখন, বয়স হয়েছে সতেরো কিন্তু ক্ষুধা তেমনি অতলান্ত, দুনিয়ার সব কিছুর ওপরে তখন দারুণ সন্দেহ আর অবিশ্বাস, একটা জাহাজে এসে উঠেছিলো যায় নাম *প্রেডিন্ট ওয়ারফিল্ড* ওরফে *এক্সোডোস*; নতুন একটা তীরে এসে পৌছালো, কার্লশ্রু বা ডাচাই থেকে যা বহু দূরে।

অনেক বছর কেটে গেলো তারপর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নরম হলো কিছুটা, পরিণত হয়ে উঠলো সে, অনেক কিছু শিখলো, বিয়ে হলো, দুটো ছেলেমেয়েও হলো। এক সময় আর্মিতে কমিশন পেলো, তবু ঘৃণা গেলো না সেই দেশের ওপর থেকে যেখানে আজ সে যাচ্ছে। মনের ভাব পুষে রেখে আসতে রাজি হয়েছিলো; আবার জার্মান সাজবার জন্যে শিষ্টতা আর ভাই-ভাই-এর পালিশ লাগাতে হয়েছিলো নিজের আচরণে।

অন্যান্য বন্দোবস্ত সার্ভিস থেকেই ক'রে দেয়া হয়েছিলো, যথা বুকপকেটের পাসপোর্টটা, চিঠিপত্র, কার্ড, দলিল, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের নাগরিকদের উপযুক্ত সমস্ত রকম সাজসজ্জা বা মালপত্র। তাকে সাজানো হয়েছিলো যেনো সে বস্ত্রব্যবসাতে ভ্রাম্যমাণ জার্মান বিক্রেতা।

www.boiRboi.blogspot.com

আকাশে মেঘ ক্রমশ ভারি হয়ে উঠলো; জমাট হিম বাতাসে টের পাওয়া গেলো পশ্চিম ইউরোপ এসে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে সে শুধু ভাবে তার কাজের কথা; কয়েক দিন কয়েক রাত ধ'রে কিব্বুৎজে মৃদুভাষী কর্নেলটি যা তাকে তোতা পাখির মতো শিখিয়েছেন, কতো ইস্রায়েলি চর কর্নেলটি যে সৃষ্টি করেছেন অথচ সফলতা পেয়েছেন কতোটুকু! একটি লোককে অনুসরণ করতে হবে তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে। একজন জার্মান তার চেয়ে যে চার বছরের ছোট, অথচ সে যা করতে যাচ্ছে অনেকেই তা পারেনি – এডেসার ভেতরে অনুপ্রবেশ। তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তার কৃতকার্যতার পরিমাপ করতে হবে, দেখতে হবে কাদের সঙ্গে সে যোগাযোগ করছে বা কারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করছে, যে সমস্ত তথ্যের সে সন্ধান পাবে সেগুলোকে যাচাই করতে হবে, জেনে নিতে হবে রকেটের ওপরে কাজ করবার জন্যে মিশরে যে নতুন জার্মান বৈজ্ঞানিকের দল পাঠানো হবে তাদের খবর পেয়েছে কিনা জার্মানটা। অথচ আত্মপরিচয় কখনো দেয়া যাবে না, নিজে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া চলবে না। জার্মানটা যা কিছু জানতে পারবে সব খবর তাকে অবিলম্বে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে, কারণ জার্মানটার ছদ্মবেশ খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। কাজটা সে করবেই, এ সব যদিও তার ভালো লাগে না করতে, তবে ভালো লাগতেই হবে এমন তো আর কোন কোন নেই তার কাছে। ভাগ্য ভালো কেউ বলেনি তাকে যে তাকে আবার জার্মান হতে ভালো লাগতেই হবে। তাকে একথাও কেউ বলেনি যে জার্মানদের সঙ্গে মিশে আনন্দ পাও, তাদের ভাষা ব'লে আনন্দ পাও বা তাদের সঙ্গে হেসে কথা ব'লে বা ঠাট্টা-তামাশা ক'রে আনন্দ পাও। সেরকম যদি কিছু বলা হোতো তাকে, তবে সে তা সোজা অস্বীকার করতো। এদের সবাইকে সে ঘৃণা করে, যে রিপোর্টারকে অনুসরণ করতে যাচ্ছে তাকেও। সেই ঘৃণা কোনদিন, কিছুতেই বদলাবে না, সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।

পরদিন শেষবারের মতো অস্টার এবং মিলারের কাছে এলো লিও। লিও এবং মোট্টি ছাড়া এবারে নতুন আরেকজন লোক ছিলো। লোকটা তাদের চেয়ে বয়সে ছোট, বেশ শক্তসামর্থ, রোদে পোড়া রঙ। মিলারের অনুমান লোকটার বয়স তিরিশের কোঠায়। তাকে শুধু জোসেফ ব'লে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। সারাক্ষণ কিছু বললো না সে।

"হ্যা, শুনুন," মিলারকে বললো মোট্টি, "আজ আপনার গাড়িটা এখানে নিয়ে এসেছি। শহরের মাঝখানে বাজারের চত্বরে পাবলিক পার্কিং লটে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।" চাবিটা মিলারকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, "ওডেসার সঙ্গে যখন দেখা করতে যাবেন গাড়িটা ব্যবহার করবেন না। কারণ সহজেই নজরে পড়বার মতো গাড়ি আপনার, আর তাছাড়া আপনি একজন রুটি কারখানার শ্রমিক, ক্যাম্পের রক্ষী ছিলেন – সে কথা প্রকাশ হয়ে পড়াতে এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অতএব, যখন

www.boiRboi.blogspot.com

যাবেন, ট্রেনে ক'রে যাবেন।"

মিলার মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো বটে, কিন্তু মনে মনে খুব দুঃখিত জাগুয়ার গাড়িটার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে ব'লে।

"আচ্ছা, এই নিন আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, আপনার এখন যা চেহারা সেইরকম ছবি লাগানো আছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনি একটা ফোক্সওয়াগেন চালান, ব্রেমেনে ছেড়ে এসেছেন সেটা, কেননা নম্বর দেখলেই পুলিশ আপনাকে ধরবে।"

ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো মিলার। তার ছোট-চুলওলা ছবি, তবে গোঁফ নেই। বলা যাবে যে সনাক্ত হয়ে যাবার পর গোঁফ গজাচ্ছে চেহারা পাল্টাবার জন্যে।

"যে লোকটা আপনার গ্যারান্টার সে নিজেও সে কথা জানে না; আজ সকালে জোয়ারের টানে তার প্রমোদতরী ব্রেমারহ্যাভেন ছেড়েছে। লোকটি পুর্বতন এসএস কর্নেল এখন রুটি কারখানার মালিক এবং আপনার প্রাক্তন মনিব। তার নাম জোয়াখিম এবারহার্ডট। এই চিঠিটা তার কাছ থেকে আপনি যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন তাকে লেখা। কাগজটা আসল, তার অফিস থেকে নেয়া। সইটা জাল, একেবারে সুদক্ষ জালিয়াতি। চিঠিটায় বলা হয়েছে যে আপনি আগে এসএস-এ ছিলেন, বেশ ভালো লোক, বিশ্বস্ত, সনাক্ত হয়ে যাওয়ায় এখন বিপদে পড়েছেন, কাজেই চিঠিটা প্রাপককে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনাকে যেনো নতুন পরিচয়পত্র বানিয়ে দেয়।"

লিও চিঠিটা মিলারের হাতে দিলো। পড়ে নিয়ে মিলার আবার সেটা খামে পুরে রাখলো।

"বন্ধ করুন," লিও বললে মিলার সেটা বন্ধ করলো।

"কার কাছে আমাকে যেতে হবে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

নামঠিকানা লেখা একটা কাগজ বের করলো লিও। "এই হচ্ছে আপনার লোক, নুরেমবার্গে থাকে। যুদ্ধে সে কি ছিলো আমরা ঠিক জানি না কারণ নতুন নাম নিয়েছে এখন। তবে আমরা ঠিক জানি যে লোকটা ওডেসার একজন হোমরাচোমরা। এবারহার্ডটের সঙ্গে নিশ্চয়ই তার দেখা হয়েছে কারণ সেও তো উত্তর জার্মানিতে ওডেসার একজন বড় নেতা। কাজেই, রুটিওলা এবারহার্ডটের এই যে এই ছবিটা, ভালো ক'রে দেখে রাখুন, যদি আপনার লোক আপনাকে তার চেহারার বিবরণ জিজ্ঞেস করে। বুঝেছেন তো?"

এবারহার্ডটের ছবিটা দেখে মিলার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আপনি তৈরি হয়ে নিয়ে কয়েকদিন বরং অপেক্ষা করুন, যতোদিন এবারহার্ডটের জাহাজ স্থলভাগের সঙ্গে রেডিও-টেলিফোনের রেঞ্জ পেরিয়ে যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

আমরা চাই না যে যার সঙ্গে আপনি দেখা করতে যাচ্ছেন, সে জাহাজটা জার্মানির জলসীমায় থাকতে থাকতেই এবারহার্ডটকে একটা টেলিফোন করে। অপেক্ষা করুন যতোদিন না জাহাজট মধ্য-আটলান্টিকে গিয়ে পড়ে। আমার মনে হয় পরের বৃহস্পতিবার সকালে গিয়ে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।"

মিলার ঘাড় নাড়লো। "বেশ, বৃহস্পতিবারেই হবে।"

"দুটো কথা আছে," লিও বললো, "প্রথমত রশম্যানের অনুসন্ধান ছাড়াও, সেটা তো আপনি করবেনই – আমরা জানতে চাই যে নাসেরের রকেট বানানোর জন্যে মিশরে বৈজ্ঞানিক পাঠানোর ভার এখন কার হাতে? এই দেশেই, জার্মানিতেই, ওডেসা থেকে রিক্রুটমেন্ট করা হচ্ছে আমরা জানি। আমরা তা সঠিকভাবে জানতে চাই, চিফ রিক্রুটিং অফিসারটি কে? দ্বিতীয়ত, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। পাবলিক টেলিফোন থেকে এই নাম্বরটাতে ফোন করবেন।"

মিলারকে এক খণ্ড কাগজ এগিয়ে দিলো সে।

"এই নম্বরে সব সময় লোক থাকবে, আমি না থাকলেও ক্ষতি নেই। যখনই কিছু জানতে পারবেন, এখানে জানিয়ে দেবেন।"

তার ঠিক বিশ মিনিট পরেই দলটা চলে গেলো।

মিউনিখে ফিরে যাবার সময় গাড়ির পেছনদিকে পাশাপাশি বসেছিলো লিও আর জোসেফ। কোণার দিকে চুপচাপ বসেছিলো ইস্রায়েলি চরটি। বেরোথের মিটিমিটি আলোগুলো পেছনে চলে যেতেই, লিও কনুই দিয়ে জোসেফকে একটু ধাক্কা দিলো।

"কি ব্যাপার মুখ এমন অন্ধকার ক'রে ব'সে আছেন কেন? সব তো ঠিকমতো চলছে।"

জোসেফ তার দিকে তাকালো। "মিলারের ওপর কতোটা ভরসা করা যায়?"

"ভরসা? আরে মিস্টার, ওডেসার ভেতরে ঢুকবার এমন সুযোগ আমরা আর কখনো পাইনি। অস্টারের কথা তো শুনলেনই। মাথা যদি ঠিক রাখে তো ছোক্‌রা এসএস ব'লে ঠিকই চালিয়ে নিতে পারবে।"

জোসেফের মন থেকে কিন্তু সন্দেহ যায় না। "আমাকে বলা হয়েছিলো যে ওকে সবসময় নজরে রাখতে। কাজেই ও যখন যাবে, আমার উচিত ছিলো ওর পেছনে লেগে থাকা; কাদের সঙ্গে ওর দেখাটেখা করিয়ে দেয়া হয় সেগুলো দেখা, ওডেসাতে তাদের কি পরিচয় তা নিরিখ করা এবং সে সমস্ত খবর দেশে পাঠিয়ে দেয়া। ওকে একা ছেড়ে দেয়া আমার মোটেই উচিত হয়নি। যখন তার মর্জি হবে আমাদের টেলিফোন করবে। ধরুন, যদি টেলিফোন না করে?"

লিও'র মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই ব্যাপারটা নিয়ে তাদের মধ্যে আগেও তর্কাতর্কি হয়ে গেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

"আরেকবার ভালো ক'রে শুনুন আপনি। এই লোকটা আমার আবিষ্কার, ওডেসাতে ওকে দিয়ে অনুপ্রবেশ করানো আমারই পরিকল্পনা। ও আমার চর, আমি বহু বছর ধরে অপেক্ষা করেছি ওর মতো কউকে পেতে যে ইহুদি নয়। ওর পেছনে কাউকে জুড়ে দিয়ে ওকে ফাঁসিয়ে দেই – সেটা আমি কিছুতেই হতে দেবো না।"

"কিন্তু ও তো আনাড়ি আর আমি একজন পেশাদার – "

"হোক। সে একজন আর্য, সে কথাটা ভুলে যাবেন না," লিও পাল্টা জবাব দিলো, "ওর প্রয়োজনীয়তা ফুরোবার আগেই আমরা জার্মানির ভেতরকার দশ জন ওডেসার মহারথীদের নাম অন্তত জানতে পারবো। তারপর তাদের ওপর আমরা একের পর এক কাজ ক'রে যাবো। তাদেরই মধ্যে থাকবে রকেট-বৈজ্ঞানিকদের ভর্তি করবার প্রধান ব্যক্তি। ভাববেন না, তাকে আমরা খুঁজে পাবোই, এবং কায়রোতে যে বৈজ্ঞানিকদের পাঠাতে চাচ্ছে তাদের নামও।"

বেরোতে তখন তুষার পড়ছিলো। জানালা দিয়ে একদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকলো মিলার। টেলিফোনে খবর দেয়ার বাসনা তার একদম নেই, কারণ রকেট – বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র কৌতুহল নেই। তার লক্ষ্য শুধু একটিই – এডুয়ার্ড রশম্যান।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১২

ফেব্রুয়ারির ১৯ তারিখে বুধবার সন্ধ্যায় অ্যালফ্রেড অস্টারের কাছ থেকে পিটার মিলার বিদায় নিলো। বেরোথে তার কটেজের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রাক্তন এসএস অফিসারটি মিলারের হাত ঝাঁকিয়ে বললো, "তোমার সৌভাগ্য কামনা করছি, কল্‌ব। যা জানি সব আমি তোমাকে শিখিয়েছি। তবু একটা ছোট্ট উপদেশ দিচ্ছি। কতোদিন তোমার ছদ্মপরিচয় টিকে থাকবে আমি জানি না, হয়তো খুব বেশি দিন নয়। যদি বুঝতে পারো যে তোমার ছদ্ম পরিচয় ধরা পড়ে গেছে, কোনরকম তর্ক কোরো না, চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়ে নিজের পরিচয়ে ফিরে যেও।"

রেলস্টেশন পর্যন্ত মাইলখানেক পথ মিলার হেঁটেই চললো। ছোট্ট স্টেশন। নুরেমবার্গের টিকেট কিনে ফটক দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে যাবে, টিকেট-কালেক্টর তাকে বললো, "আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, স্যার। আজ রাতে নুরেমবার্গের ট্রেন দেরি ক'রে আসবে।"

আশ্চর্য হলো মিলার। সময়মত ট্রেন চালানো জার্মান রেলওয়ের বৈশিষ্ট্য।

"কি হয়েছে?" টিকেট-কালেক্টর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যেখানে রেললাইনটা পাহাড়ের ভেতরে ঢুকে গেছে। দু'পাশে উপত্যকায় নতুন-পড়া তুষারের স্তূপ।

বহু বছর সাংবাদিকতা ক'রে ক'রে মিলারের এখন ওয়েটিং রুমে থাকতে খুবই খারাপ লাগে। জীবনে তার বহু সময় কেটে গেছে এসবে; ক্লান্ত অবসন্ন মুহূর্তে ঠাণ্ডা ঘরগুলো কোনরকম মার্ধুযই কোনদিন এনে দিতে পারেনি। ছোট স্টেশনটির বুফেতে গিয়ে এক কাপ কফি নিলো। টিকেটের দিকে তাকিয়ে দেখে সেটা পাঞ্চ করা হয়ে গেছে। মানসপটে ভেসে উঠলো পাহাড়ের ওপরে রাখা তার কালো জাগুয়ারটা।

নুরেমবার্গ শহরের অন্যপ্রান্তে যদি গড়িটা রেখে দেয়, যেখানে যাবে সেখান

www.boiRboi.blogspot.com

থেকে বহুদূরে, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু হবে না...যদি লোকটার সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাকে অন্য কোথাও পাঠানো হয় অন্য কোন উপায়ে, তাহলে মিউনিখে গাড়ি রেখে যাবে। গ্যারেজেও পার্ক ক'রে যেতে পারে। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবে, কেউ খুঁজে পাবে না। অন্তত কাজ শেষ হওয়ার আগে তো না। তাছাড়া গাড়িটা কাছে থাকলে প্রয়োজনে লাগতে পারে, যদি কখনো পালিয়ে যেতে হয়। বাভারিয়াতে তার লোকে কি ক'রে জানবে তার গাড়ির কথা? মোট্টির সাবধানবাণী অবশ্য মনে পড়লো, তার গড়িটা চট ক'রে নজরে পড়ে লোকের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্টারের শেষ উপদেশটাও মনে পড়লো, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে হতে পারে, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব। গাড়িটা ব্যবহার করা হয়তো বিপজ্জনক, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাও তো বিপজ্জনক। আরও পাঁচ মিনিট ধ'রে ভাবলো। তারপর কফিটা শেষ না করেই স্টেশন থেকে হাঁটতে শুরু করলো পাহাড়ের অপর দিকে। দশ মিনিটের মধ্যে গিয়ে জাগুয়ারে গিয়ে বসলো; ছুটে তার প্রিয় গাড়িটা নিয়েই, শহর ছাড়িয়ে।

নুরেমবার্গ অল্প দূরের পথ। সেখানে পৌছে বড় স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে উঠলো মিলার। দুটো দালান পেরিয়ে গলিতে গিয়ে রাখলো গাড়িটা। তারপর হেঁটেই চললো কিংগস্ গেটের ভেতর দিয়ে মধ্যযুগীয় শহর অ্যালব্রেখট ড্যুরের'র উদ্দেশ্যে।

এরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে রাস্তার আলোয় আর জানালাগুলো থেকে আসা আলোর ছটায় দেখা যাচ্ছে প্রাচীর-ঘেরা শহরটায় বাড়িগুলোর অদ্ভুত ধরনের সব ছাদ, আর তাদের প্রান্তস্থ দেয়ালগুলোর ত্রিকোণ অংশে নানারকম কারুকার্য করা। পারিপার্শ্বিক দেখে মনে হয় যেনো আবার সেই মধ্যযুগে ফিরে আসা হয়েছে। ফ্রান্সোনিয়ার রাজারা যখন নুরেমবার্গের শাসক ছিলেন, জামানি রাজ্যগুলোর মধ্যে যখন সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যনগরী ছিলো এই নুরেমবার্গ। কল্পনাও করতে পারা যায় না যে এই শহর ১৯৪৩ সালে মিত্রশক্তির বোমার আঘাতে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিলো; এবং আজ দ্বিতীয়বার নতুন ক'রে মূল স্থপতির নক্সা অনুসরণ ক'রে বানানো হয়েছে এই সেদিনমাত্র – ১৯৪৫-এর পরে।

বাজারের চৌরাস্তা ছাড়িয়ে দুটো রাস্তার পরে মিলার তার কাঙ্ক্ষিত বাড়িটার সন্ধান পেয়ে গেলো, একদম প্রায় সেন্ট সেবাল্ড চার্চের যমজ গম্বুজের তলাতেই। দরজায় বাড়ির মালিকের নাম লেখা, ঠিক মিলে গেলো তার পকেটের চিঠিতে যে নাম আছে তার সঙ্গে। ব্রেমেনের জনৈক জোয়াখিম এবারহার্ডটের লেখা পরিচয়পত্র বলেই চিঠিটাকে চালানো যাবে। ভূতপূর্ব এসএস কর্নেলটির স্বাক্ষর চমৎকারভাবে নকল করা হয়েছে। অথচ এবারহার্ডটকে মিলার কোনদিন চোখেই দেখেনি। তাই মনে মনে ভাবে যে এই বাড়ির কর্তাটিও যদি এবারহার্ডটকে না দেখে থাকে তবেই মঙ্গল।

মিলার বাজারের চৌরাস্তায় ফিরে এলো আবার। রাতের খাবার সারতে হবে কোথাও। দু'তিনটে সনাতনী ফ্রান্সেনিয় কায়দার রেস্তোঁরার পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে যেতে চোখ পড়লো সেন্ট সেবাল্ডের ফটকের সামনের মোড়ে একটা ছোট্ট সসেজের দোকানের লাল টালির ছাদ থেকে ধোঁয়া উঠে ঠাণ্ডা রাতের আকাশে কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। সুন্দর ছোট্ট দোকানটা; সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা, সেখানে বাক্স ক'রে সারি সারি বেগুনী রঙের হেদ্যার স্যাজিয়ে রাখা, অতি সযত্নে সেগুলো থেকে সকালের তুষারকণাগুলোও ঝেড়ে ফেলছে দোকানের মালিক।

ভেতরে গিয়ে ঢুকতেই একটা উষ্ণতা এবং আতিথ্যের চমৎকার পরিবেশে মনটা ভরে উঠলো। কাঠের টেবিলগুলো একটাও খালি ছিলো না। কিন্তু তখনি কোণার টেবিল থেকে একজোড়া দম্পতি উঠে যাচ্ছিলো, মিলার গিয়ে সেখানে বসতেই তাঁরা একগাল হেসে তাকে শুভেচ্ছা জানালো। মিলার সেই দোকানের বিখ্যাত নুরেমবার্গি মসলাদার সসেজের একটা প্লেট আনিয়ে নিলো। বারোটা থাকে একেক থালায়। সেগুলো শেষ ক'রে স্থানীয় মদের একটা বোতল আনিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিলো।

ভোজনপর্বের পরে কফি নিয়ে বসলো। দুটো অ্যাববাখ দিয়ে কালো পানীয়টা পান করলো। শুতে যেতে মোটেই ইচ্ছে করছিলো না। চুপচাপ ব'সে ব'সে দেখতে বেশ লাগছে; খোলা আগুনের কুণ্ডে কাঠের গুঁড়িগুলো থেকে আগুনের শিখা জ্বলছে; ওই কোণায় একদল লোক হেঁড়ে গলায় ফ্রান্সেনিয় লোকগীতি গাইছে; সঙ্গীতের তালে তালে তারা হাত ধরাধরি ক'রে এপাশ থেকে ওপাশে দুলছে, প্রতিটা ছত্রের শেষে আবার মদের গ্লাসগুলো ওপরে তুলে ধরে হৈ হৈ ক'রে গান করছে।

অনেকক্ষণ ব'সে রইলো মিলার। মনে মনে ভাবে জীবন বিপন্ন করবার কি দরকার – বিশ বছর আগে একটা লোক অপরাধ করেছিলো, এখন তার খোঁজে এসব করবার কি অর্থ? প্রায় স্থির ক'রে ফেলেছিলো যে, না, আর এসব পাগলামি না, চুলোয় যাক সব, গোঁফ কামিয়ে ফেলবে, আবার চুল গজাবে, হাম্বুর্গে ফিরে যাবে, সিগির দেহতাপে উত্তপ্ত বিছানায় গিয়ে ঢুকবে। মুখে সে স্মিত হেসে বলবে, 'ব্রিট্টে শন'।

পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ তুলতে গিয়ে একটা ছবিতে আঙুল ঠেকলো। টেনে তুলে সেটাতে চোখ রাখতেই রাগে পিত্তি জ্বলে গেলো তার। লাল অক্ষিকোটরে দুটো নিষ্প্রভ চোখ – ইঁদুর মারার জাঁতাকলের মতো একটা হা করা মুখ – কোটের কলারের ওপর থেকে তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কোটের ওপরে কালো প্রতীক আর রৌপ্যবিদ্যুতের শিখা। কিছুক্ষণ সেইদিকে চেয়ে থেকে গজ গজ ক'রে উঠলো মিলার, "হারামজাদা!" ছবির একটা প্রান্ত তুলে ধরলো তার টেবিলে রাখা মোমবাতির শিখার মাঝখানে। ধীরে ধীরে ছাই হয়ে গেলো সেটা।

www.boiRboi.blogspot.com

কোন প্রয়োজন নেই আর ছবিটার; মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে সেটা, দেখলেই চিনতে পারবে।

খাওয়ার দাম চুকিয়ে কোটের বোতাম বন্ধ ক'রে পিটার মিলার তার হোটেলে ফিরে গেলো।

ওয়েরউলফ রাগে গজরাচ্ছিলো সেই সময়। সামনে ব'সে আছে ম্যাকেনসেন।

"পাচ্ছো না মানে? হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে? কী, বলতে চাও কি? ওর গাড়ির মতো গাড়ি জার্মানিতে অল্প ক'টাই আছে, আধ মাইল দূর থেকেও চিনতে পারা যায়। ছ'সপ্তাহ ধ'রে খোঁজাখুঁজি ক'রে এখন বলছো কিনা তাকে খুঁজে পেলে না..."

ম্যাকেনসেন নির্বাক ব'সে রইলো। আশাভঙ্গের স্ফুরিত ঝটিকাটা আগে থামুক।

পরে সে বললো, "সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা সেরকমই। তার হাম্বুর্গের ফ্ল্যাটে কড়া নজর রেখেছি; তার বান্ধবী এবং মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি মিলারের বন্ধু সেজে; তার অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি। কেউ কিছু জানে না। গাড়িটা নিশ্চয়ই কোন গ্যারেজে বন্ধ ক'রে গোপন আশ্রয়ে চলে গেছে। লন্ডন থেকে ফিরে আসবার পর কোলোন হাওয়াই আড্ডার কারপার্ক থেকে গাড়ি নিয়ে দক্ষিণের দিকে ছুটেছিলো, সে পর্যন্তই জানি। তারপর আর তার কোন সন্ধান নেই।"

"কিন্তু তাকে যে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের," ওয়েরউলফ আবার বললো, "কমরেডটির কাছে যেনো সে কোনমতেই পৌছতে না পারে, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"ডুব দিয়ে কতোদিন আর থাকবে, ওপরে ভেসে উঠবেই," ম্যাকেনসেন বললো, কণ্ঠস্বরে তার নিশ্চিত প্রত্যয়। "তখন আমরা পেয়ে যাবো তাকে।"

পেশাদার শিকারীটির নিরুত্তাপ ধৈর্য আর যুক্তির সামনে ওয়েরউলফের অধীরতা ভেসে গেলো। বিবেচনা ক'রে দেখলো যে ম্যাকেনসেন ঠিকই বলছে। "বেশ, তাহলে আমার কাছাকাছিই থাকো বরং। শহরে একটা হোটেলে গিয়ে ওঠো, সেখান থেকেই অপেক্ষা করা যাবে। তুমি কাছে থাকলে আমি চট ক'রে তোমাকে পেতে পারবো।"

"আচ্ছা স্যার। শহরের মাঝখানে কোন্ হোটেলে গিয়ে উঠছি, সেখান থেকে ফোন ক'রে আপনাকে জানিয়ে দেবো। যে কোন সময় আপনি ইচ্ছে করলেই, ডেকে পাঠাতে পারবেন।"

শুভরাত্রি জানিয়ে ম্যাকেনসেন চলে গেলো।

পরদিন বেলা ন'টার দিকে মিলার এই বাড়িতে এসে পৌছালো। ঝক্‌ঝকে

www.boiRboi.blogspot.com

পালিশ-করা ঘণ্টাটা ধরে নাড়লো। সকাল সকাল এসেছে যাতে লোকটাকে বাড়িতে পাওয়া যায়, কাজে বেরিয়ে পড়বার আগেই ধরতে হবে। একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিলো। বসার ঘর দেখিয়ে দিয়ে গৃহকর্তাকে ডাকতে চলে গেলো।

দশ মিনিট পরে বসার ঘরে এসে যে ঢুকলো তার বয়স প্রায় মধ্যপঞ্চাশ, চুলের রঙ কটা, দু'পাশে রগের কাছে রূপালি ছোপ ছোপ দাগ; বেশ আত্মবিশ্বাসী এবং সম্ভ্রান্ত ধরনের চেহারা। ঘরের আসবাবপত্র এবং সাজসজ্জায় সম্পদ ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

অপ্রত্যাশিত অতিথিটির দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো, কোন কৌতূহল নেই তার মধ্যে। সস্তা দামের প্যান্ট আর জ্যাকেট পরা আছে দেখে বুঝতে পারলো লোকটা শ্রমিকশ্রেণীর।

"কি করতে পারি আমি?" ধীরে ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলো।

অতিথির ভাবভঙ্গী দেখে বোঝা যায় যে সে বেশ ঘাবড়ে গেছে, এতো বিত্তবৈভবের মধ্যে যেনো আরো বেশি হতচকিত হয়ে গেছে। সে বললো, "অ্যা, হের ডক্টর, ভাবলাম হয়তো আপনিই আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।"

"ও!" ওডেসার আঞ্চলিক প্রধান বললো, "নিশ্চয়ই জানেন যে আমার অফিস এখান থেকে বেশিদূরে নয়। আপনি বরং সেখানে গিয়ে আমার সেক্রেটারিকে ব'লে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক'রে নিন।"

"না, মানে...ঠিক উকিলের সাহায্য নিতে আসিনি, বুঝলেন, মক্কেল নই আমি –" হাম্বুর্গ এবং ব্রেমেন অঞ্চলে কথ্যভাষায় কথা বলা শুরু ক'রে দেয় মিলার, খেটে-খাওয়া মানুষের ভাষা। স্পষ্টই বোঝা যায় যে বেশ ঘাবড়ে গেছে সে। ভাষা খুঁজে না পেয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে হঠাৎ একটা চিঠি বের ক'রে হুট ক'রে এগিয়ে দিলো।

"একটা চিঠি নিয়ে এসেছি স্যার, তিনি বললেন আপনার কাছে আসতে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে ওডেসার লোকটি খাম খুলে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে গেলো। পড়তেই একটু ভাবান্তর দেখা গেলো তার ভাবভঙ্গীতে, যেনো একটু ধাতব কঠিন হয়ে উঠলো তার অঙ্গসঞ্চালন। চিঠিটার কাগজের ওপর দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে মিলারকে দেখতে দেখতে বললো, "ও! আচ্ছা, হের কল্‌ব, বোসো।"

সোজা খাড়া একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলো মিলারকে। নিজে কিন্তু বসলো বেশ আয়েসী ধরনের একটা আরামকেদারায়। কয়েক মিনিট ধরে অতিথির দিকে চেয়ে রইলো যেনো যাচাই ক'রে নিচ্ছে, ভুরু দুটো কুঁচ্‌কেই আছে। হঠাৎ তেড়ে উঠবার ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলো, "কী যেনো নাম বললে তোমার?"

"কল্‌ব, স্যার।"

"প্রথম নাম?"

www.boiRboi.blogspot.com

"র‍্যাল্‌ফ গুন্থার, স্যার।"

"কোন সনাক্তপত্র আছে তোমার কাছে?"

বুঝতে পারলো না যেনো মিলার। "শুধু আমার ড্রাইভিং লাইসন্সেটা।"

"দেখি সেটা।" ওডেসার লোকটা দৃঢ়ভাবে বললো।

লোকটির পেশা ওকালতি – হাত বাড়িয়ে দিলো। মিলার চেয়ার ছেড়ে উঠে প্যান্টের পকেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা বের ক'রে তার হাতে দিলো। লোকটি সেটা খুলে নিয়ে ভেতরের বিবরণগুলো পড়ে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো মিলারকে। বেশ মিলে যাচ্ছে।

"জন্মতারিখ কতো?" প্রায় ধমক দিয়ে ওঠলো যেনো।

"আমার জন্মতারিখ? ১৮ই জুন, স্যার।"

"সাল বলো কল্‌ব।"

"উনিশ শো পঁচিশ, স্যার।" আমতা আমতা ক'রে মিলার মানে কল্‌ব বললো।

আবার কয়েক মিনিট ধ'রে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা খুঁটিয়ে দেখলো সে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো উকিলটি। "অপেক্ষা করো, আমি আসছি।"

ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়িটার পেছনদিকের অংশে চলে এলো। এখানেই তার ওকালতির চেম্বার, অন্য আর একটা রাস্তার ওপর। মক্কেলরা সেই রাস্তা ধরেই আসে। অফিসের ভেতরে ঢুকে সোজা দেয়াল-সংলগ্ন সিন্দুক খুলে ফেললো। মোটা একটা বই বের ক'রে নিয়ে পাতা উলটাতে লাগলো।

জোয়াখিম এবারহার্ডটের নাম শোনা ছিলো, কিন্তু মানুষটাকে কখনো দেখেনি সে। এসএস-এ তার শেষ র‍্যাংকও ঠিক জানা নেই। বইটা থেকে উত্তর পেয়ে গেলো। জোয়াখিম এবারহার্ডট...ওয়াফেন-এসএস-এ কর্নেল পদে উন্নীত, ১০ই জানুয়ারি ১৯৪৫ সালে। আরো কয়েক পৃষ্ঠা উল্‌টে কল্‌ব নামটি খুঁজলো। সাতটা কল্‌ব আছে, কিন্তু একটাই র‍্যাল্‌ফ গুন্থার। এপ্রিল, ১৯৪৫ থেকে স্টাফ সার্জেন্ট। জন্মের তারিখ ১৮.৬.২৫। বাড়ির মধ্যে দিয়ে আবার বসার ঘরে ফিরে এলো সে। অতিথিটি তখনো সেই খাড়া চেয়ারে জবুথুবু হয়ে ব'সে আছে।

আবার আরাম-কেদারায় গা এগিয়ে দিলো সে।

"তোমাকে সাহায্য করা হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে, তা তো বোঝো তুমি...না?"

মিলার দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধ'রে মাথা নাড়লো। "কোথাও যাবার উপায় নেই, স্যার। ওরা আমাকে খুঁজছিলো যখন, সোজা চলে এলাম হের এবারহার্ডটের কাছে। তিনিই তো চিঠিটা দিলেন, বললেন আপনার কাছে যেনো আসি। বললেন আপনি যদি কিছু না করতে পারেন, কেউ পারবে না।"

www.boiRboi.blogspot.com

উকিলটি ছাদের দিকে দৃষ্টি মেলে গা এলিয়ে ব'সে রইলো। নিজের সঙ্গেই যেনো কথা বলছে এখন।

"আশ্চর্য, তাহলে আমাকে উনি ফোন করলেন না কেন?" কথাটা বলেই চুপ ক'রে গেলো যেনো জবাবের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

ধাঁধার উত্তর খুঁজে পেয়েছে এমন ভঙ্গী ক'রে মিলার ব'লে উঠলো, "না স্যার, হয়তো ফোন করতে চাননি...এরকম একটা ব্যাপার।"

উকিলটি বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। "কি বাজে বকছো, ফোন করা যাবে না কেন? যাক্, এরকম গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি কি ক'রে গিয়ে পড়লে?"

"হ্যা, স্যার...মানে লোকটা তো আমাকে চিনে ফেললো তখন, ওরা বললো যে আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসছে। তাই বেরিয়ে পড়লাম। বেরোতে তো হবেই, কি বলেন?"

উকিলটি বড় ক'রে শ্বাস ফেলে বিরক্ত কণ্ঠে বললো, "গোড়া থেকে আরম্ভ করো তো। কে তোমাকে চিনলো, কি ব'লে চিনলো?"

ডমলার দম নিয়ে নিলো। "আমি ব্রেমেনে ছিলাম। ওখানেই থাকি, কাজ করি...মানে করতাম আর কি এই ঘটনাটা ঘটবার আগ পর্যন্ত...হের এবারহার্ডটের ওখানে। তাঁর রুটির কারখানায়। একদিন বুঝালেন, প্রায় মাস চারেক আগে, রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, শরীরটা কেমন ক'রে উঠলো। পেটে ভীষণ ব্যথা, চিনচিনিয়ে উঠছে। কিছু আর মনে নেই, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ফুটপাতের ওপর। ওরা আমাকে তখন হাসপাতালে নিয়ে গেলো।"

"কোন্ হাসাপাতালে?"

"ব্রেমেন জোনারেল, স্যার। কি সব পরীক্ষা-টরীক্ষা করেছিলো, বললো আমার ক্যান্সার হয়েছে। পেটের ভেতর। ভাবলাম আমার পোড়া কপাল!"

"কপালের লিখন আর কে খণ্ডাতে পারে, বলো?" শুকনো গলায় উকিলটি মন্তব্য করলো।

"আমিও তাই বলি, স্যার। যাক্‌গে, রোগটা নাকি গোড়াতেই ধরা পড়েছিলো। সে হিসাবে আমার কপাল ভালোই। ওরা অপারেশন না ক'রে ওষুধপত্র দিতে থাকলো, কিছুদিন পরে ক্যান্সার সেরে গেলো।"

"তুমি তো খুব ভাগ্যবান দেখছি...তা তোমাকে চিনে ফেলার ব্যাপাটা কি?"

"সে এক লম্বা ইতিহাস, স্যার। হাসপাতালে একজন আরদার্লি ছিলো বুঝলেন, ইহুদি, লোকটা সব সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। ডিউটিতে যখনই আসতো, বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতো আমার দিকে। খুব অস্বস্তি হতো আমার। ভাবনায় পড়লাম; কেমন যেনো চাহনি তার, যেনো বলতে চায় 'তোমাকে চিনে ফেলেছি'। আমি অবশ্য তাকে চিনতে পারলাম না, তবে বুঝতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারলাম ও আমাকে চিনে ফেলেছে।"

"হ্যা, তারপর?" উকিলটির কৌতূহল যেনো বেড়ে উঠলো।

"মাসখানেক আগে ওরা বললো যে অনেক ভালো হয়ে গেছি, কোন স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে পারি। রুটিকারখানার শ্রমিক-ইনস্যুরেন্স থেকে টাকা দেয়া হলো। ব্রেমের জেনারেল ছেড়ে আসছি, অমনি আমি তাকে চিনতে পারলাম। মানে ওই ইহুদি শুয়োরটাকে। কয়েক সপ্তাহ লেগেছিলো, তারপর মনে পড়লো। ফ্লসেনবুর্গের বাসিন্দা ছিলো সে।"

উকিল এবারে সটান খাড়া হয়ে বসলো। "ফ্লসেনবুর্গে ছিলে তুমি?"

"হ্যা, সেই কথাই তো বলছি স্যার, শুনুন না আগে। হাসপাতালের আরদার্লিকে ঠিক চিনে ফেললাম আমি তখন। ব্রেমেন হাসপাতালে থেকে ওর নামও আমিও জেনে নিয়েছিলাম। ফ্লসেনবুর্গে আমরা অ্যাডমিরাল ক্যানারিস আর অন্য অফিসারদের ফ্যুয়েরারকে মারার ষড়যন্ত্র করার জন্যে তো গুলি ক'রে মেরেছিলাম; তাদে লাশ পোঁড়াবার জন্যে যে ইহুদি দলটাকে লাগিয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিলো সে।"

উকিলটি তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। "ক্যানারিস আর অন্যদের যারা গুলি ক'রে মেরেছিলো, তাদের মধ্যে তুমি ছিলে?"

মিলার কাঁধ ঝাঁকালো। "আমিই তো শাস্তি দেবার দলাটর নেতা ছিলাম," কণ্ঠস্বর একটু নিচে নামিয়ে বললো, "ওরা তো বিশ্বাসঘাতকই ছিলো, তাই না? ফুয়েরারকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো না?"

উকিল লোকটি হাসলো। "আরে, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। ওরা তো বিশ্বাসঘাতকই ছিলো। ক্যানারিস আবার মিত্রশাক্তির কাছে গোপন খবরগুলোও পাঠাতো। ওরা সাবাই বিশ্বাসঘাতক...আর্মির সব শুয়োরগুলো...জেনারেল থেকে আরাম্ভ ক'রে সেপাই পর্যন্ত। কথা হচ্ছে যে, ওদের মেরেছে যে লোক তার সাক্ষাৎ আমি পাবো, সেটা কখনও ভাবিনি।"

মিলার একটু হাসতে চেষ্টা করলো। "কিন্তু সেইজন্যেই তো আমাকে ওরা ধরতে চায়। ইহুদি ঠেঙানো আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ক্যানারিস বা তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তো শুনছি এখন একেকজন হিরো।"

"হ্যা, তা ঠিক। এখনকার জার্মান কর্তৃপক্ষ যদি তোমাকে হাতে পায়, মুশকিলে পড়বে তুমি। যাক্, তারপর কি হলো?"

"স্বাস্থ্যনিবাসে বদলি হয়ে এলাম, ইহুদি আরদার্লিটাকেও আর দেখেতে পেলাম না। কিন্তু গত শুক্রবার আমার নামে একটা টেলিফোন এলো স্বাস্থ্যনিবাসে। ভেবেছিলাম রুটির কারখানা থেকে হয়তো কেউ খোঁজ নিচ্ছে। লোকটা কিন্তু নাম জানায় নি; শুধু বললো যে অনেক খবর সে রাখে আর জানে যে আমি কে সে খবর

www.boiRboi.blogspot.com

চলে গেছে কোনো একটি বিশেষ লোকের কাছে আর তার কাছ থেকে লুডভিগসবুর্গের কুত্তাগুলো জেনে গেছে। আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পরোয়ানা নাকি জারি হচ্ছে। লোকটা যে কে বুঝতে পারলাম না, তবে গলা শুনে মনে হলো যা বলছে সঠিক জেনেই বলছে। সরকারী আমলার মতো জোরদার কণ্ঠ...বুঝলেন কি বলছি?"

মাথা নাড়লো উকিল। "হয়তো ব্রেমেন পুলিশ বিভাগের কোন দোস্ত হবে। তা তুমি কি করলে?"

অবাক হয়ে তাকালো মিলার। "কি করলাম স্যার? পালালাম। স্রেফ সট্‌কে পড়লাম। তাছাড়া আর কি করার ছিলো বলেন? বাড়িও যাইনি, যদি ওখানে ওরা আমার জন্যে ব'সে থাকে। আমার ফোকসওয়াগাটাও নিতে যাইনি, ওটা এখনো আমার ঝোপড়ির সামনে দাঁড় করানো আছে। শুক্রবার রাতে রাস্তাতেই কাটালাম। শনিবারে একটা একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। গেলাম মালিকের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে – মানে, হের এবারহার্ডটের সঙ্গে। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে তো তাঁর ঠিকানা আছে। খুব ভালো ব্যবহার করলেন তিনি। বললেন, পরদিন সকালেই জাহাজে পাড়ি দিচ্ছেন বৌকে নিয়ে – শখের ভ্রমণ আর কি। তবু আমার একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন। তখনই এই চিঠিটা দিয়ে দিলেন আপনার নামে, বললেন আপনার সঙ্গে যেনো আমি দেখা করি।"

"হের এবারহার্ডট যে তোমাকে সাহায্য করবে কি ক'রে জানলে?"

"ও হ্যা – সে এক ঘটনা। দেখেন, উনি যে যুদ্ধে ছিলেন আমি জানতাম না। তবে কারখানায় আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করতেন। বছর দু'য়েক আগে আমাদের সব কর্মীদের একটা পার্টি হয়েছিলো একদিন। আমরা সবাই একটু ফূর্তিতে ছিলম, বুঝলেন না? আমি একবার টয়লেটে গেলাম। দেখলাম সেখানে হের এবারহার্ডট হাতটাত ধুচ্ছেন আর গান করছেন। আর কি আশ্চর্য; জানেন কোন্ গান? হার্স্ট ওয়েসেল গীত, আমিও যোগ দিলাম। বাথরুমে আমরা দু'জনে সেদিন প্রাণভরে সেই গান গাইলাম; তারপর আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'একটিও কথাও না কল্‌ব, বুঝলে।' এই কাহিনী আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন বিপদে পড়তেই আবার মনে পড়লো। ভাবলাম, উনিও বোধহয় আমার মতো এসএস-এ ছিলেন। তাই তাঁর কাছেই গেলাম সাহায্যের জন্যে।"

"আর তোমাকে তিনি আমার কাছে পাঠালেন – কেমন?"

মিলার মাথা নাড়লো।

"ইহুদিটার নাম কি?" উকিল জানতে চাইলো।

"হার্টস্টাইন, স্যার।"

"যে স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলে তার নাম?"

www.boiRboi.blogspot.com

"আর্কাডিয়া ক্লিনিক, ব্রেমেনের বাইরে ডেলমেনহার্স্টে।"

উকিলটি একটা কাগজে কিছু লিখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

"বসো একটু," বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে হলওয়ে পেরিয়ে পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। টেলিফোন এনকোয়ারি থেকে তিনটি নম্বর জেনে নিলো – এবারহার্ডটের রুটি-কারখানার, ব্রেমেন জেনারেল হসপিটালের এবং ডেলমেনহর্স্টের আর্কাডিয়া ক্লিনিকের। প্রথমে রুটির কারখানায় টেলিফোন করলো।

এবারহার্ডটের সেক্রেটারি বেশ চটপটে। বললো, হের এবারহার্ডট ছুটিতে গেছেন স্যার। না, তার সঙ্গে যোগাযোগ করা অসম্ভব। প্রতি শীতেই যেমন যান, এবারেও গেছেন জাহাজে চড়ে, ক্যারিবিয়ানে, ফ্রাউ এবারহার্ডটকে সঙ্গে নিয়ে...চার সপ্তাহ পরে ফিরবেন...আমি কিছু করতে পারি আপানার জন্যে?"

"না, কিছু না, ধন্যবাদ।"

তারপর ব্রেমেন জেনারেলে ফোন ক'রে কর্মী-শাখার সঙ্গে সংযোগ চাইলো।

"দেখুন, আমি সমাজকল্যাণ বিভাগের পেনশন শাখা থেকে বলছি," মোলায়েম গলায় উকিলটি বললো, "আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে আপনাদের ওখানে হার্টস্টাইন নামে একজন আরদার্লি কাজ করে।"

একটু বিরতি পড়লো কথাবর্তায়। হাসপাতালের মেয়েটি তখন কর্মীদের ফাইল ঘাঁটছে।

"হ্যা হ্যা," খুঁজে পেয়ে মেয়েটি বললো, "আছে, ডেভিড হার্টস্টাইন।"

"ধন্যবাদ।" নুরেমবার্গের উকিলটি ফোন রেখে দিয়ে আবার ঐ নম্বরে ঘোরালো। এবারে চাইলো রেজিস্টারের অফিস।

"আমি এবারহার্ডট বেকিং কোম্পানির সেক্রেটারি," ফোনে বললো সে, "আমাদের একজন কর্মী আপনাদের হাসপাতহালে ভর্তি হয়েছিলো, পেটে টিউমার। রুগীর নাম র‍্যাল্‌ফ গুন্থার কল্‌ব। তার অবস্থা এখন কেমন জানতে পারি কি?"

"ধরুন একটু।" মেয়ে কেরানীটি র‍্যাল্‌ফ গুন্থার কল্‌বের ফাইল বের ক'রে শেষ পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে টেলিফোনে জানালো, "দেখুন, রুগীকে তো ডিসচার্জ করা হয়ে গেছে। তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়াতে স্বাস্থ্যনিবাসে বদলি করা হয়েছে।"

"বা, বেশ সুখবর," উকিলটি স্মিত কণ্ঠে বললো, "আমি আবার ছুটি নিয়ে স্কি করতে গিয়েছিলাম তো, তাই সব খবর এখনো জেনে উঠতে পারিনি। আচ্ছা, বলতে পারেন, কোন স্বাস্থ্যনিবাস?"

"ডেলমেনহাস্টের আর্কাডিয়া।"

ফোন রেখে দিয়ে এবারে আর্কাডিয়া ক্লিনিকের নম্বর ঘোরালো সে।

নারীকণ্ঠে উত্তর ভেসে আসে। অনুরোধ শুনে নিয়ে মেয়েটি তার পাশে দণ্ডায়মান ডাক্তারের দিকে তাকালো। হাতের তালু দিয়ে মাউথপিসটা ভালো ক'রে

www.boiRboi.blogspot.com

বন্ধ ক'রে বললো, "আপনি আমাকে যে লোকটির কথা বলেছিলেন, তার সম্বন্ধে খোঁজ করছে।"

ডাক্তার নিজেই টেলিফোন ধরলো "বলুন, আমি এই ক্লিনিকের চিফ, ডা: ব্রাউন বলছি। কি করতে পারি আপনার জন্যে?"

ব্রাউন নাম শুনে সেক্রেটারি তার দিকে কেমন বোকার মতো তাকালো। ডাক্তারের কিন্তু তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। নুরেমবার্গ থেকে ভেসে আসা কথাগুলো শুনে নিয়ে সবিনয়ে জানালো, "দেখুন, হের কল্‌ব গত শুক্রবার বিকেলে নিজে থেকেই ক্লিনিক ছেড়ে চলে গেছেন, কাউকে না জানিয়ে। অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে, কিন্তু আমরা আর কি করতে পারি বলুন?...হ্যা হ্যা, ঠিক ব্রেমেন জেনারেল থেকেই এসেছিলেন...পেটে টিউমার হয়েছিলো, প্রায় সেরে এসেছে।"

আরো একমুহূর্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে নিয়ে বললো, "না না, তাতে আর কি? আপনার সাহায্যে যে আসতে পেরেছি তাই যথেষ্ট।"

ডাক্তারের আসল নাম রোজমেয়ার; টেলিফোন রেখে দিয়ে এবারে মিউনিখের একটা নম্বর সে ঘোরালো। কোনোরকম ভনিতা না ক'রে সোজা বললো, "কল্‌বের সম্বন্ধে কেউ ফোনে প্রশ্ন করছিলো। যাচাই করা শুরু হয়ে গেছে।"

নুরেমবার্গে টেলিফোন রেখে দিয়ে উকিল তার বসার ঘরে ফিরে এলো।

"হু, কল্‌ব...তাহলে বোঝা যাচ্ছে তুমি যে পরিচয় দিয়েছো, সত্যিই তুমি তাই।"

বিস্ময়ে মিলার শুধু বললো, "জি।"

"তবুও আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কিছু মনে করবে না তো?"

বিস্ময় কাটেনি মিলারের। ঘোরের মধ্যে মাথা নাড়লো শুধু, "না স্যার!"

"বেশ। তোমার খৎনা করা আছে কি?"

বোকার মতো চেয়ে থাকে মিলার। কোনমতে বললো, "না।"

"দেখাও আমাকে," শান্তস্বরে উকিলটি বললো।

মিলার কিন্তু তার চেয়ারে ব'সে শুধু তাকিয়েই রইলো তার দিকে, কিছুই করলো না। দেখানোর কোন আগ্রহই নেই।

"আমাকে দেখাও, স্টাফ সার্জেন্ট," কড়া হুকুমের ভঙ্গীতে বলে ওঠলো উকিলটি।

এক লাফে মিলার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। অ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, "জু বেফেল।"

সেই সটান অবস্থায় খাড়া সামনের দিকে চেয়ে, চোখ না নামিয়েই প্যান্টের জিপার টেনে নামিয়ে দিলো মিলার। এক মুহূর্তে সেদিকে চেয়ে দেখে উকিল আবার তাকে ইশার করলো ওটা বন্ধ ক'রে রাখতে।

www.boiRboi.blogspot.com

মৃদু কণ্ঠে বললো এবার, "আচ্ছা...অন্তত ইহুদি যে নও তা বোঝা গেলো।"

চেয়ারে গিয়ে বসেছিলো মিলার, সেখান থেকেই আবার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো। মুখ হাঁ হয়ে গেছে তার। কোনমতে বললো, "ইহুদি তো নই।"

উকিলটি হাসলো। "তবু আগে কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছে, ইহুদিরা কামেরাড সেজে চলে এসেছে। বেশিদিন অবশ্য টেকেনি কেউই। যাক্, তোমার কাহিনী আমি আবার শুনতে চাই। প্রশ্ন করবো, উত্তর দেবে, পরখ ক'রে দেখবো আর কি, বুঝলে?" একটু থেমে আবার বললো, এবার যন্ত্রের মতো ক'রে। "কোথায় জন্মেছিলে তুমি?"

"ব্রেমেনে, স্যার।"

"ঠিক। তোমার এসএস রেকর্ডেও তাই লেখা আছে, আমি দেখে এসেছি। তরুণ-হিটলারে ছিলে?"

"হ্যা স্যার, দশ বছর বয়সে ঢুকে ছিলাম ১৯৩৫ সালে।"

"তোমার বাপ-মা – তাঁরাও কি সুযোগ্য ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ছিলেন?"

"হ্যা স্যার, দু'জনেই।"

"তাদের কি হয়েছিলো?"

"ব্রেমেনের বোমাবর্ষণে মারা গেছেন।"

"এসএস-এ কবে ঢুকেছিলে?"

"১৯৪৪-এর বসন্তে, স্যার। আঠারো বছরে।"

"কোথায় ট্রেনিং হয়েছিলো?"

"ডাচাউ শিক্ষাশিবিরে, স্যার।"

"তোমার ডান বগলে তোমার ব্লাড-গ্রুপ উল্কি করা আছে?"

"না, স্যার। কিন্তু থাকলে তা বাম বগলে থাকতো, ডান বগলে নয়।"

"কেন তোমার উল্কি করা নেই?"

"ব্যাপারটা হলো স্যার, শিক্ষাশিবির থেকে আমাদের পাস ক'রে বেরুনোর তো কথা ছিলো ১৯৪৪-এর আগস্টে। সেখান থেকে আমরা চলে যেতাম ওয়াফেন-এসএস-এর কোন ইউনিটে প্রথম পোস্টিং পেয়ে। কিন্তু ফ্যুয়েরারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্যে তখন বহু আর্মি অফিসারকে ধরে ফ্লসেনবুর্গ ক্যাম্পে চালান করা হয় জুলাই মাসে। ফলে ফ্লসেনবুর্গে বহু লোকের দরকার হয়; ডাচাউ শিক্ষাশিবির থেকে অবিলম্বে লোক পাঠানোর তলব আসে। আমি আর জনাদশেক অন্য শিক্ষার্থী সোজা ওখানে পোস্টিংয়ে যাওয়ার জন্যে আদেশ পাই; বিশেষ দক্ষতার জন্যেই আমাদের নাকি বাছাই করা হয়েছিলো। শিক্ষার শেষে তাই পাসিং-আউট প্যারেডও আমাদের ভাগ্যে জুটলো না, উল্কির ছাপও বাদ গেলো। কম্যান্ডান্ট অবশ্য বলেছিলেন ব্লাড-গ্রুপের দরকার নেই, ফ্রন্টে আমাদের কখনোই পাঠানো হবে না।"

www.boiRboi.blogspot.com

উকিলটি মাথা নাড়লো। ১৯৪৪-এর জুলাই...ফ্রান্সের অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেছে মিত্রশক্তি...কম্যান্ডান্ট বলবেনই তো...যুদ্ধ শেষ হয়ে আসবার তখন আর দেরি কোথায়।

"ছোরা পেয়েছিলে?"

"হ্যা স্যার। কম্যান্ডান্টের হাত থেকে।"

"কি লেখা আছে তার ওপর?"

"রক্ত এবং সম্মান, স্যার।"

"ডাচাউয়ে কি ধরনের শিক্ষা পেয়েছিলে?"

"পুরো সামরিক শিক্ষা স্যার আর রাজনৈতিক মতাদর্শের শিক্ষা, তরুণ-হিটলারে যা শেখানো হয়েছিলো তার সবকিছু।"

"গানগুলো শিখেছিলে?"

"হ্যা স্যার।"

"হর্স্ট ওয়েসেল গীত কোন্ কুচকাওয়াজ-সঙ্গীতের বই থেকে নেয়া হয়েছে?"

"'দেশের তরে সংগ্রামের হয়েছে এখন সময়' সেই গীতিকা থেকে স্যার।"

"ডাচাউ শিক্ষাশিবির কোথায় ছিলো?"

"মিউনিখের দশ মাইল উত্তরে, স্যার। ওই নামে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে তিন মাইল দূরে।"

"তোমার ইউনিফর্ম কি ছিলো?"

"ধূসর-সবুজ রঙের টিউনিক আর ব্রিচেস, জ্যাকবুট, কালো রঙের কলার-লেপেল, বাম পাশে ব্যাংক কালো চামড়ার বেল্ট আর গান মেটালের বকল্‌শ।"

"বকলশে কি আদর্শ-বাণী লেখা আছে?"

"মাঝখানে একটা স্বস্তিকা স্যার, তার চারপাশে গোল ক'রে লেখা: 'আমার বিশ্বস্ততাই আমার সম্মান'।

উকিলটি উঠে হাত-পা টান টান ক'রে নিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো।

"আচ্ছা, এখন ফ্লসেনবুর্গ শিবির সম্বন্ধে কিছু বলো, স্টাফ সার্জেন্ট কল্‌ব। কোথায় সেটা?"

"বাভারিয়া এবং থুরিঙ্গিয়ার সীমানায়, স্যার।"

"কবে খোলা হয়েছিলো সেটা?"

"১৯৩৮ সালে, স্যার। ফ্যুয়েরারের বিরুদ্ধে যারা কাজ করছিলো সেই শুয়োরের বাচ্চাগুলোর জন্যে প্রথম যেগুলো খোলা হয়েছিলো তাদেরই একটা।"

"কতো বড় ছিলো?"

"আমি যখন ছিলাম, স্যার, লম্বায় ছিলো ৩০০ মিটার, চওড়া ৩০০ মিটার।

www.boiRboi.blogspot.com

উনিশটা ওয়াচ-টাওয়ার চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো; তাদের প্রত্যেকটাতে ভারি আর হাল্কা দু'রকম মেশিনগানই ছিলো। নাম ডাকবার চত্বরটা ছিলো ১২০ মিটার বাই ১৪০ মিটার। হায় ঈশ্বর, আমরা যা মজা করেছিলাম ওখানে, ইদ্‌সগুলোকে নিয়ে..."

"বাজে কথা রাখো," ধমক দিলো উকিল, "থাকবার জায়গা কি ছিলো?"

"চব্বিশটা ব্যারাক, বাসিন্দাদের জন্যে একটা রান্নাঘর, একটা ধোয়া-মোছার ঘর, একটা স্যানাটোরিয়াম আর নানারকম কারখানা।"

"এসএস রক্ষীদের জন্যে?"

"দুটো ব্যারাক, একটা দোকান আর একটা বোর্ডে লো।"

"যারা মরতো তাদের লাশগুলো কি করতে?"

"তার কাঁটার ওপাশে ছোট্ট একটা দাহ করার ঘর ছিলো। শিবিরের ভেতর থেকে মাটির তলায় একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে সেখানে যাওয়া যেতো।"

"কি ধরনের কাজ হোতো ওখানে?"

"পাথর ভাঙা স্যার। জায়গাটাও ছিলো তারের বাইরে; সেখানে ওদের নিজস্ব তারকাঁটার বেড়া আর ওয়াচ-টাওয়ার ছিলো।"

"১৯৪৪-এর শেষভাগে কতো জনসংখ্যা ছিলো সেখানে?"

"প্রায় ১৬০০০ বাসিন্দা, স্যার।"

"অধিনায়কের অফিস ছিলো কোথায়?"

"তারের বাইরে, স্যার। একটা টিলার মাঝখানে, শিবিরের দিকে মুখ করা।"

"অধিনায়কদের নাম বলো পর পর।"

"আমি ওখানে যাবার আগে দু'জন ছিলেন। প্রথম জন হলেন এসএস মেজর কার্ল কুনস্টলার, তার পরে এসএস ক্যাপ্টেন কার্ল ফ্রিৎস। শেষের জন ছিলেন এসএস লেফট্‌ন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্স কোয়েগেল।"

"রাজনৈতিক বিভাগের নম্বর কতো ছিলো?"

"দু'নম্বর বিভাগ, স্যার।"

"কোথায় ছিলো সেটা?"

"অধিনায়কের ব্লকে।"

"তাদের ডিউটি কি ছিলো?"

"বার্লিন থেকে যদি কারো জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ আসতো তবে তা পালন করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখা।"

"ক্যানারিস এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষেত্রে সেরকম নির্দেশ ছিলো?"

"হ্যা স্যার। তাদের সবার জন্যেই নির্দেশ এসেছিলো।"

"কবে সেটা পালন করা হয়?"

www.boiRboi.blogspot.com

"১৯৪৫-এর ২০শে এপ্রিল, স্যার। বাভারিয়ার ভেতর দিয়ে আমেরিকানরা চলে আসছিলো, তাই হুকুম এলো তাদের শেষ ক'রে ফেলতে হবে। আমাদের ক'জনকে নিয়ে একটা দল গড়ে কাজটা আমাদের দেয়া হলো। তখন আমি সবে প্রমোশন পেয়েছি স্টাফ সার্জেন্টের; ক্যাম্পে যখন এসেছিলাম তখন তো শুধু এসএস সেপাই ছিলাম। ক্যানারিস এবং অন্য পাঁচ জনের বন্দোবস্ত করার ভার ছিলো আমার ওপর। তারপর আমরা ইহুদিদের মধ্যে থেকে একটা সৎকার করার দল গড়ে নিয়ে লাশগুলোর ব্যবস্থা করলাম। হাটস্টাইন শালা ওই দলেই ছিলো – কাজ শেষ হয়ে যাবার পর ক্যাম্পের কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেললাম। দু'দিন পর হুকুম এলো বন্দীদের মার্চ করিয়ে নিয়ে যেনো আমরা উত্তরদিকে চলে যাই। পথে যেতে যেতে শুনলাম যে ফ্যুয়েরার আত্মহত্যা করেছেন। তারপর স্যার, অফিসারেরা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। বন্দীরা পালাতে শুরু করলো জঙ্গলের দিকে। আমরা স্টাফ সার্জেন্টরা যদিও গুলি ক'রে কিছু মারলাম, কিন্তু আর মার্চ ক'রে যাবার কোন মানে ছিলো না। ইয়াঙ্কিরা তখন সব জায়গায় এসে গিয়েছিলো।"

"ক্যাম্প সম্বন্ধে একটা শেষ প্রশ্ন, স্টাফ সার্জেন্ট। ক্যাম্পের ভেতরের জায়গা থেকে যদি উপর দিকে তাকাতে, কি দেখতে পেতে?"

মিলার হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললো, "আকাশ।"

"দুর গর্দভ, দিগন্তে কি দেখা যেতো?"

"ও! মানে ওই পাহাড়টা আর তার ওপরে ওই ভাঙা ভাঙা দুর্গ?"

উকিল মাথা নাড়তে নাড়তে হাসলো। "আসলে চতুর্দশ শতাব্দীর সেটা! যাক কল্‌ব, ফ্লসেনবুর্গে তুমি ছিলে। কিন্তু পালালে কি ক'রে তারপর?"

"আপনাকে তো বললাম স্যার, আমাদের মার্চ তো গেলো লণ্ডভণ্ড হয়ে। আমি দেখলাম কি, একটা আর্মির জওয়ান এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মাথায় মারলাম এক বাড়ি, নিয়ে নিলাম তার পোশাক। ইয়াঙ্কিরা তার দু'দিন পরে আমাকে পাকড়াও করলো। দু'বছর আমি যুদ্ধবন্দীর শিবিরে কাটালাম। কিন্তু ওদের বলেছিলাম যে আমি একজন আর্মির জওয়ান। জানেন তো স্যার, চারদিকে তখন গুজব যে ইয়াঙ্কিরা এসএস-দের দেখলেই গুলি ক'রে মারছে। তাই আমি বলেছিলাম যে আমি আর্মির লোক।"

উকিল এককমুখ ধুঁয়া ছাড়লো। "তুমি একাই ওরকম করোনি। যাক্, নাম বদলেছিলে?"

"না স্যার। কাগজগুলো ফেলে দিয়েছিলাম, নইলে চিনতে পারবে এসএস বলে। তবে নাম বদলানোর কথা মনে আসেনি। চিন্তাই করিনি যে কোন স্টাফ সার্জেন্টকে কেউ খুঁজবে। সেই সময় ক্যানারিদেরকে নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাতো না, লোকে ওদের নিয়ে হট্টগোল শুরু করলো তো বহুদিন পরে। বার্লিনে যেখানে ওই

www.boiRboi.blogspot.com

চক্রান্তের কিছু পাণ্ডাকে ধ'রে ফাঁসি দিয়েছিলো আজ সেখানে বেদী সাজিয়েছে। তবে ততোদিনে ফেডারাল রিপাবলিকের কাগজ এসে গেছে আমার কাছে, কল্‌ব নামে। কিছুই কিন্তু হোতো না যদি ওই আরদার্লি আমাকে চিনতে না পারতো। আর যদি চিনতেই পারলো তো নাম বদলিয়ে কি লাভ!"

"তা তো ঠিকই। আচ্ছা, যা শিখেছিলে তুমি, তার কিছু কিছু আবার ঝালিয়ে নেয়া যাক্, ফ্যুয়েরারের প্রতি বিশ্বস্ততার শপথটা বলো তো?"

তিন ঘণ্টা ধরে এইরকম চললো। ঘেমে ওঠলো মিলার। একসময় কোনরকমে বললো যে তাড়াতাড়ি হাসপাতাল ছেড়ে চলে এসেছে, সারাদিন খাওয়া হয়নি তার। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে যাবার পর উকিলের জেরা শেষ হলো। সন্তুষ্ট হয়েছে মনে হলো।

"কি চাও তুমি?" মিলারকে জিজ্ঞেস করলো।

"মানে, ওরা তো আমাকে এখন খুজে বেড়াচ্ছে স্যার, তাই আমার দরকার এখন নতুন কিছু কাগজপত্র, যাতে বোঝা যায় যে আমি র‍্যালাফ গুন্থার কল্‌ব নই। চেহারা বদলে ফেলতে পারবো, চুল লম্বা ক'রে গজিয়ে নেবো, গোঁফটাকে বাড়াবো, বাভারিয়া বা অন্য কোথাও একটা চাকরিও জুটিয়ে নিতে পারি। মানে, আমি রুটি বানাতে পারি, বেকারির কাজে বেশ দক্ষ, আর মানুষের তো রুটির দরকার, কি বলেন?"

সাক্ষাৎকার শুরু হওয়ার পর এই প্রথমবার উকিলটি জোরে জোরে হাসলো, মাথা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে।

"ভালোই বলেছো, মানুষের তো রুটির দরকার হয়ই! আচ্ছা শোনো, সাধারণত তোমার অবস্থার লোকদের জন্যে কেউ সময় বা অর্থব্যয় করে না। তবে তুমি আজ বিপাকে পড়েছো তোমার কোন দোষ না থাকাও সত্ত্বেও এবং দেখছি তুমি বেশ সৎ আর দেশপ্রেমী জার্মান, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করবো। নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স বানিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই, তাতে তো তুমি সামাজিক নিরাপত্তার কার্ড পাবে না, বার্থাসর্টিফিকেট না দেখালে। অথচ সেটা তো তোমার কাছে নেই। তবে নতুন পাসপোর্ট যদি থাকে, সব পেতে পারো। টাকা আছে তোমার সঙ্গে?"

"না স্যার, একেবারে কপর্দকহীন। গত তিনদিন ধরে তো হিচহাইক ক'রে এলাম দক্ষিণে।"

উকিলটি একটা একশো মার্কের নোট বের করলো।

"দেখো, এখানে তোমার থাকা চলবে না। আর নতুন পাসপোর্ট আসতেও অন্তত এক সপ্তাহও সময় লাগবে। আমি তোমাকে আমার এক বন্ধুর কাছে পাঠাবো, তিনি তোমাকে পাসপোর্ট পাইয়ে দেবেন। তিনি থাকেন স্টুটগার্টে। কোন একটা

সাধারণ হোটেলে গিয়ে ওঠো, সেখান থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেও। আমি তাঁকে তোমার আসার খবর জানিয়ে দেবো, তিনি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবেন।"

কাগজের একটা টুকরো নিয়ে কিসব লিখে উকিল তাকে দিলো।

"তাঁর নাম ফ্রানৎস বেয়ার, এটা হলো তাঁর ঠিকানা। ট্রেনে ক'রে চলে যাও স্টুটগার্ট। হোটেলে উঠে সোজা তাঁর কাছে যাও। যদি আরো কিছু টাকার দরকার হয় তো তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। তবে পাগলের মতো খরচ করো না। গা ঢাকা দিয়ে থেকো যতোদিন না বেয়ার নতুন পাসপোর্ট জোগাড় ক'রে দেন। তারপর দক্ষিণ জার্মানিতে আমরা তোমার জন্যে একটা চাকরির বন্দোবস্ত ক'রে দেবো, কেউ কোনদিন তোমার সন্ধান পাবে না।"

মিলার সলজ্জ ধন্যবাদ জানিয়ে একশো মার্কের নোট আর বেয়ারের ঠিকানাটা পকেটে ভরে নিলো। "ধন্যবাদ হের ডক্টর, আপনি সত্যিই মহান।"

পরিচারিকা এসে তাকে বাইরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। হাঁটতে হাঁটতে মিলার তারপর চলে এলো তার হোটেলে। এক ঘণ্টা পর যখন তার জাগুয়ার ছুটে চললো স্টুটগার্টের দিকে, তখন উকিলটি টেলিফোন ক'রে বেয়ারকে জানিয়ে দিলো যে আজ সন্ধ্যার দিকে র‍্যাল্‌ফ গুন্থার কল্‌ব নামে একজন লোক এসে তার সঙ্গে দেখা করবে...কল্‌ব আপাতত পুলিশের নজর এড়িয়ে চলছে।

ম্যাপ দেখে দেখে মিলার তার গাড়িটাকে নিয়ে পাহাড়ের উপত্যকার দিকে চলে গেলো। চমৎকার একটা জায়গা, স্টুটগার্টের কেন্দ্রস্থল। বেয়ারের বাড়ি থেকে প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে গাড়িটাকে রেখে দিলো। দরজায় চাবি দিতে দিতে তাকিয়েও দেখলো না যে একজন্য মধ্যবয়সী মহিলা কাছাকাছি ভিলা হসপিটাল থেকে হসপিটাল ভিজিটার্স কমিটির সাপ্তাহিক মিটিং সেরে, তার গাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলো।

সন্ধ্যা প্রায় আটটার সময় নুরেমবার্গে উকিলটি আবার বেয়ারের বাড়িতে টেলিফোন করলো। উদ্দেশ্য হচ্ছে জেনে নেয়া যে পলাতক কল্‌ব নিরাপদে এসে পৌঁছালো কিনা। বেয়ারের স্ত্রী ফোন ধরলো।

"হ্যা, হ্যা, যুবকটি তো?...হ্যা...সে আর আমার স্বামী দু'জনে বাইরে কোথাও ডিনার খেতে গেছে।"

"আচ্ছা! আমি টেলিফোন করলাম শুধু এই কথাই জানতে, নিরাপদে পৌঁছেছে কিনা।"

"কি সুন্দর ছেলেটি!" উৎফুল্ল কণ্ঠে বেয়ারের স্ত্রী বললো, "গাড়ি রাখছিলো যখন তখনই তার পাশ দিয়ে আমি এসেছিলাম। ভিজিটার্স কমিটির মিটিং থেকে ফিরছি তখনই দেখেছিলাম। কিন্তু বাড়ি থেকে কতোদূরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলো বোধহয় বেচারা। হতে পারে... জানেন তো স্টুটগার্ট...এই রাস্তা উঠেছে, এই

www.boiRboi.blogspot.com

নেমেছে..."

"মাফ করবেন, ফ্রাউ বেয়ার," উকিল তাকে থামিয়ে দিলো, "তার সঙ্গে তো তার ফোকসওয়াগেনটা ছিলো না, ট্রেনে ক'রে এসেছে।"

"না না, কি যে বলেন! গাড়িতে এসেছে। কি সুন্দর যুবক, আর কী চমৎকার গাড়ি! মেয়েরা তো বোধহয় ওকে পেলে পাগল হয়ে যাবে..."

"ফ্রাউ বেয়ার, শুনুন, এবার মন দিয়ে শুনুন। ভীষণ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কি ধরনের গাড়ি?"

"সেটা তো আমি চিনি না। তবে স্পোর্টস গাড়ি। লম্বা কালো, একটা লম্বালম্বি হলুদ টান দেয়া..."

ঝপ্ ক'রে উকিল ফোন রেখে দিয়ে আবার একটা নম্বর ঘোরালো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে। হোটেলের সংযোগ পেতেই একটা ঘরের নম্বর চাইলো। পরিচিত গলায় জবাব এলো, "হ্যালো।"

"ম্যাকেনসেন," ওয়েরউলফ খেঁকিয়ে উঠলো, "চলে এসো ঝটপট, মিলারকে পাওয়া গেছে।"

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১৩

ফ্রানৎস বেয়ার তার বৌয়ের মতোই মোটাসোটা হাসিখুশি মানুষ। ওয়েরউলফ খবর পাঠিয়েছে, তাই সন্ধ্যা থেকেই আশা করছে লোকটা বুঝি এই এলো। আটটার একটু পরেই মিলার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াতেই হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

হলঘরে ঢোকার মুখে বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো। কিন্তু বেয়ারের স্ত্রী অতো সময় কই, তড়িঘড়ি রান্নাঘরে ছুটে গেলো।

বেয়ার বললো, "মি: কল্‌ব, আগে কোনদিন উর্টেনবার্গে এসেছিলেন?"

"না, কোনদিন না।"

"আহা! জানেন আমরা ভীষণ অতিথিপরায়ণ। খাবেন নিশ্চয়ই কিছু এখন, তাই না? আজ সারাদিন কিছু খেয়েছেন?"

"না।" মিলার জানিয়ে দিলো, কিছুই জোটেনি তার, না সকালে না দুপুরে। সারাদিন কেবল ট্রেনেই কেটেছে।

বেয়ার তাই শুনে আফশোশ করলো। "ইস্, কি কষ্ট গেছে আপনার, এক্ষুণি কিছু মুখে দিন। হ্যা, এক কাজ করা যাক; চলুন, শহরে গিয়ে কোথাও পেট ভরে ডিনার খাওয়া যাক। আরো না না, তাতে কি, এ আর এমন কি! তোমাকে একটু খাওয়াবো – আরে, তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে কোরো না, বয়সে তুমি আমার অনেক ছোট –"

হরবর ক'রে চলে গেলো বাড়ির মধ্যে, বৌকে ব'লে আসতে যে অতিথিকে নিয়ে স্টুটগার্ট শহরের মধ্যে যাচ্ছে কোন হোটেলে ডিনার করতে। দশ মিনিট পর বেয়ারের গাড়িতে ক'রে ওরা দু'জনে চললো শহরের মাঝখানে।

নুরেমবার্গ থেকে স্টুটগার্ট পুরনো ই-১২নং জাতীয় সড়ক ধরে অন্তত দু'ঘণ্টার পথ,

www.boiRboi.blogspot.com

তা যতো জোরেই গাড়ি চালানো যাক। ম্যাকেনসেন সেই রাত্রে চালালোও বটে। ওয়েরউলফের টেলিফোন পাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে, সব খবরাখবর নিয়ে বেয়ারের ঠিকানা জেনে বেরিয়ে পড়েছিলো। সড়ে দশটায় সোজা বেয়ারের বাড়িতে এসে পৌছালো সে।

ফ্রাউ বেয়ার ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। একে তো ওয়েরউলফ আবার টেলিফোন ক'রে জানিয়ে দিয়েছিলো যে কল্‌ব তো নয়ই, বরং পুলিশের চর বলেই মনে হচ্ছে, তার ওপর আবার এতো অল্প সময়ের মধ্যে জল্লাদের মতো এক জোয়ান এসে উপস্থিত। আর ম্যাকেনসেনের কথা বলার ধরনও তো কিছু ভরসা জাগানোর মতো নয়।

"কখন গেছে ওরা?" লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

"সোয়া আটটার দিকে," কাঠ-কাঠ গলায় বেয়ারের স্ত্রী জানালো।

"কোথায় যাচ্ছে কিছু বলেছিলো?"

"না। ফ্রানৎস বললো ছেলেটা সারাদিন খায়নি, তাকে খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে শহরের কোন রেস্তোরাঁয়। আমি বললাম বাড়িতেই কিছু বানিয়ে দিচ্ছি, তা না, চললেন বাইরে। ফ্রানৎসের তো একটা ছুতো হলেই হলো..."

"এই যে কল্‌ব লোকটা...আপনি বললেন যে তার গাড়ি পার্ক করার সময় আপনি দেখেছিলেন...কোথায় সেটা?"

ফ্রাউ বেয়ার বিস্তারিত ব'লে গেলো কোন্ রাস্তায় কোথায় জাগুয়ারটা রেখে দিয়েছে, কি ক'রে সেখানে যেতে হয়, সবই। ম্যাকেনসেন মিনিটখানেক গভীরভাবে ভেবে তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, কোন্ রেস্তোরাঁয় আপনার স্বামী যেতে পারেন ব'লে আপনার মনে হয়?"

একটু ভেবেচিন্তে ফ্রাউ বেয়ার বললো, "ওর প্রিয় দোকান হচ্চে ফ্রেডরিক স্ট্রাসের ওপর তিন মুর রেস্তোরাঁটা। সেখানেই প্রথমে ঢু মারবে মনে হচ্ছে।"

ম্যাকেনসেন বেয়ারের বাড়ি থেকে গাড়ি চালিয়ে চলে এলো যেখানে জাগুয়ারটা রাখা আছে সেখানে। ভলো ক'রে গাড়িটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো – যেনো মুখস্থ ক'রে রাখছে, দেখলেই যাতে আবার চিনতে পারে। একটু ইতস্তত করলো, মিলারের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে নাকি। কিন্তু ওয়েরউলফের নির্দেশ হচ্ছে মিলার ও বেয়ারকে খুঁজে বের করা, তারপর ওডেসার লোকটিকে সাবধান ক'রে বাড়ি পঠিয়ে দিয়ে মিলারের ব্যবস্থা করা। সেই জন্যেই তিন মুরে টেলিফোনও করলো না সে। বেয়ারকে এখন সাবধান ক'রে দিলেই মিলার জানতে পারবে যে তার ছদ্মবেশটা ধরা পড়ে গেছে, তাহলে অদৃশ্য হয়ে যাবার সুযোগ আবার সে পেয়ে যাবে।

ঘড়ি দেখলো ম্যাকেনসেন। এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। তার

মার্সিডিজে চড়ে সে চললো এবার শহরের মাঝখানে।

মিউনিখের মফস্বলের ছোট্ট একটা অখ্যাত হোটেলে জোসেফ তার খাটে চিৎ হয়ে শুয়েছিলো। হোটেলে অফিস থেকে খবর এলো যে তার একটা টেলিগ্রাম এসেছে। নিচে গিয়ে সেটা নিয়ে এলো।

নড়বড়ে টেবিলটায় ব'সে বাদামি রঙে খামটা খুললো। বেশ দীর্ঘ তারবার্তা। লেখা ছিলো:

"ক্রেতা যে সমস্ত মালের অনুসন্ধান করিয়েছেন সেগুলির নিম্নরূপ দর আমরা দিতে পারি:

সেলেরি :	৪৮১ মার্ক, ৫৩ ফেনিগ
তরমুজ :	৩৬২ মার্ক, ১৭ ফেনিগ
কমলা :	৬২৭ মার্ক, ২৪ ফেনিগ
সরবতি লেবু :	৩১৩ মার্ক, ৮৮ ফেনিগ

ফল এবং তরিতরকারীর লম্বা একটা তালিকা দেয়া ছিলো। সাধারণত এই সব মাল ইস্রায়েল থেকে রপ্তানিও করা হয়, তাই বার্তাটা পড়লে মনে হবে কোন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান থেকে থেকে তাদের জার্মনিতে অবস্থিত প্রতিনিধিকে দরের কোটেশন পাঠানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক টেলিগ্রামে বার্তা পাঠানো হয়তো বিপদসঙ্কুল, কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে প্রতিদিন এতো বেশি সংখ্যক বাণিজ্যিক টেলিগ্রাম চালাচালি হয় যে সবগুলো বাছতে গেলে প্রচুর লোক লাগবে।

কথাগুলো বাদ দিয়ে জোসেফ শুধু সংখ্যাগুলো লম্বা লাইনে সাজিয়ে নিলো। মার্ক আর ফেনিগে ভাগ করা অংশগুলো উড়ে গিয়ে পাঁচ-অংকের একেকটা সংখ্যায় ভাগ করলো। প্রত্যেকটা ছয় অংকের সংখ্যা থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪, এই তারিখটাকে বিয়োগ ক'রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ফল হলো আরেকটা ক'রে ছয় অংকের সংখ্যা।

সংকেতটা খুবই সরল। একটা কোড, নিউইয়র্কের পপুলার লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত ওয়েবস্টারের নিউ-ওয়ার্ড ডিক্শনারি'র পেপারব্যাক সংস্করণের ওপর যার ভিত্তি। ছয় অংকের ওই সংখ্যাগুলোর প্রথম তিনটির সংখ্যার অর্থ ওই অভিধানের পৃষ্ঠাসংখ্যা; চতুর্থ সংখ্যাটি এক থেকে নয় পর্যন্ত যা কিছু হতে পারে, বেজোড় সংখ্যা হলে প্রথম স্তম্ভ ওপর থেকে অতো নম্বর শব্দ। আধ ঘণ্টা ধরে সমানে কাজ ক'রে গেলো জোসেফ। তারপর বার্তার সংকেত-বাক্য পড়ে নিয়ে দু'হাতের মধ্যে মাথা গুজে ব'সে রইলো। তিরিশ মিনিট পর লিও'র বাড়িতে লিও'র সঙ্গে সে ব'সে

www.boiRboi.blogspot.com

ছিলো। চক্রান্তকারী দলটির নেতাও সংকেত-বার্তাটি পড়েই যেনো শিউরে উঠলো। কিছুক্ষণ পরে শুধু বললো, "দুঃখিত। আগে আমি জানতে পারিনি।"

তারা দু'জনেই জানতো না যে গত ছয় দিনে মোসাদের কাছে তিনটি সংক্ষিপ্ত বার্তা এসেছিলো যে জনৈক ভালকানকে দশ লক্ষ জার্মান মার্কের সমমূল্য অর্থ দেবার অনুমোদন দিয়েছে কেউ একজন, যাতে সে 'গবেষণা প্রকল্পের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে।'

দ্বিতীয়টা এসেছিলো সুইস ব্যাংকের কোন একজন ইহুদি কর্মচারীর কাছ থেকে। লোকটা সাধারণত গোপন নাৎসি তহবিল থেকে পশ্চিম ইউরোপে অবস্থিত ওডেসার কাছে অর্থ হস্তান্তরের কাজকর্মে নিয়োজিত আছে। সে জানিয়েছিলো যে ব্যাংকে বৈরুত থেকে দশ লক্ষ মার্ক এসে জমা পড়েছিলো কোন এক ফ্রিৎজ ওয়াগনারের অ্যাকাউন্টে; দশ বছর ধ'রে যে অ্যাকাউন্টে চলেছে; নগদ অর্থে সেই টাকাটার পুরোটাই তুলে নেয়া হয়েছে।

তৃতীয় বার্তা পাওয়া গিয়েছিলো জনৈক মিশরিয় কর্নেলের কাছ থেকে। কর্নেলটি ৩৩৩নং কারখানার ধারে কাছে ডিফেন্স মেকানিজমে বেশ উঁচু পদে বহাল ছিলো। তাকে প্রচুর অর্থের লোভ দেখিয়ে আরমপ্রদ অবসর জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে রোমের একটা হোটেলে নিয়ে আসা হয়েছিলো। সেখানে সে মোসাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ধ'রে কথাবার্তা বলে। ফলে জানা যায় যে রকেট প্রকল্পের জন্যে এখন শুধু নির্ভরযোগ্য টেলিগাইডের সিস্টেমটারই প্রয়োজন, বাকি সব কাজ হয়ে গেছে। সেই সিস্টেমের গবেষণা এবং নির্মাণ হচ্ছে পশ্চিম জার্মানির কোন কারখানায় এবং তার জন্যে ওডেসার দশ লক্ষ মার্কের মতো আরো খরচ হবে। এই তিনটি খবরের টুকরো আরো হাজার খবরের সঙ্গে গিয়ে জমা পড়লো ইস্রায়েলের কম্পিউটার ব্যাংকে, অধ্যাপক ইউভেল নিমান যার প্রধান। অপূর্ব প্রতিভা এই ইস্রায়েলি বৈজ্ঞানিকের। তিনিই প্রথম তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করেছিলেন; পরে তিনিই ইস্রায়েলি আণবিক বোমার জনক হোন। মানুষের স্মৃতিশক্তি অকৃতকার্য হলেও, কম্পিউটার যন্ত্রে হাজার হাজার খবরের মধ্যে এই খবর তিনটি একসঙ্গে রপ্ত হয়ে যায় এবং পূর্ব গৃহীত খবর থেকে টেনে বের ক'রে আনে যে ১৯৫৫ সালে রশম্যান নিজের ছদ্মনাম নিয়েছিলো ফ্রিৎজ ওয়াগনার।

লিও'র আন্ডারগ্রাউন্ড হেডকোয়ার্টারে তখন জোসেফ বলছিলো, "আমি এখন থেকে এখানেই থাকছি, ওই টেলিফোনের কাছ ছাড়ছি না। আমাদের শক্তিশালী হর্সপাওয়ারের মোটর-সাইকেল আর নিরাপদ পোশাক এনে দিও তো। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যেনো পেয়ে যাই। যে মুহূর্তে আপনার মিলার খবর দেবে, কাল বিলম্ব না ক'রে আমাকে তার কাছে যেতে হবে।"

www.boiRboi.blogspot.com

"ও যদি ফেঁসে যায় তো আপনি যতো তাড়াতাড়িই করুন না কেন কোন লাভ হবে না," লিও বললো, "সাধে কি ওরা তাকে সাবধান করে দিয়েছিলো; ওইসব মানুষের এক মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌছালেও কি আর তাকে আস্ত রাখবে।"

লিও আন্ডারগ্রাউন্ড ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। আরেকবার জোসেফ সেই বার্তাটাতে চোখ বুলালো। তেল আভিভ থেকে জানানো হচ্ছে:

অতি সাবধান/ নতুন খবরে জানা যাচ্ছে রকেটের কৃতকার্যতার চাবিকাঠি তোমার প্রদেশেই জার্মান এক শিল্পপতির হাতে/ সাংকেতিক নাম ভালকান/ পরিচয় বোধহয় রশম্যান/ মিলারকে অবিলম্বে লাগিয়ে দাও/ খুঁজে বের ক'রে শেষ ক'রে দাও/ কর্মর‍্যান্ট।

টেবিলের ব'সে জোসেফ তার ওয়ালথার পিপিকে অটোমেটিকটাকে সাফ ক'রে নিয়ে গুলি ভরে নিলো। মাঝে মধ্যেই নির্বাক টেলিফোন যন্ত্রটার দিকে আড়চোখে দেখতে লাগলো।

ডিনারে বেয়ারের খুব ফূর্তি, ঠাট্টা-মস্করা হাসি-তামাশায় ডুবে গেলো একেবারে। মিলার বারবারই নতুন পাসপোর্টের কথা তুললো, কিন্তু সেদিকে তার কোন নজর নেই!

প্রত্যেকবারেই তার পিঠে বেশ জোরে চাপড় মেরে বললো, "আরে, তার জন্যে চিন্তা করছো কেন বন্ধু...ফ্রানৎস বেয়ারের ওপর সব ছেড়ে দাও।" বলেই নিজের নাকে নিজেই টোকা মেরে চোখ মট্‌কে আবার অমোদের রাজ্যে ফিরে যায়।

আট বছর ধরে রিপোর্টারের কাজ ক'রে একটা জিনিস শিখেছে মিলার, কি ক'রে চোখের পাতা না কাঁপিয়ে মদ গিলতে হয় এবং গিলে মাথা সোজা রাখতে হয়। তবে সাদা মদে সে অভ্যস্ত নয়; তবে সাদা মদের একটা বাড়তি সুবিধা এই যে অন্য লোককে খুব সহজেই মাতাল ক'রে দেয়া যায়, নিজে ঠিক থেকে। ফাঁকিটা ধরা কঠিন। ঠাণ্ডা পানি আর বরফ-ভরা বালতিতে ক'রে এগুলো নিয়ে আসে, যাতে হিমঠাণ্ডা থাকে। তিন তিনবার মিলার তার সঙ্গীর অজান্তে নিজের গ্লাসের মাল দিলো সেই বরফের বালতির মধ্যে ঢেলে।

শেষে মিষ্টি আসতে আসতে দুটো বোতল শেষ। বেয়ার তার বোতাম-বন্ধ জ্যাকেটে হাসফাঁস করতে লাগলো। দর দর করে ঘাম ঝরছে তার। ফলে তেষ্টা আরো বেড়ে গেলো, আবার বোতলের অর্ডার দিলো সে।

মিলার এমন ভাব দেখালো যেনো সে খুব চিন্তিত...বোধহয় নতুন পাসপোর্ট আর পাওয়া যাবে না...গ্রেপ্তার হতেই হবে তাকে, ১৯৪৫ সালে ফ্লসেনবুর্গে যা করেছিলো সেই অভিযোগে।

চিন্তিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো, "আমার তো কয়েকটা ছবির দরকার হবে

www.boiRboi.blogspot.com

আপনার, তাই না?"

হো হো ক'রে হেসে ফেললো বেয়ার।

"হ্যা, দুটো ছবি লাগবেই। ঘাবড়াচ্ছো কেন, স্টেশনে গিয়ে অটোমেটিক বুথ থেকে নিলেই হবে। অপেক্ষা করো দু'দিন, চুলটা একটু বড় হোক তোমার, গোঁফটা আরো ঘন...কেউ চিনতে পারবে না তুমি সেই লোক।"

"কেন, কি হবে তখন?" সরল বিস্ফারিত জিজ্ঞাসা মিলারের।

সামনে ঝুঁকে এসে বেয়ার তার মোটা হাতটা তার কাঁধে রাখলো। যেই কথা বলার জন্যে মুখ খুললো মদের গন্ধ ভক্ ক'রে এসে মিলারের নাকে ঢুকলো।

"আমি ওগুলো আমার এক দোস্তের কাছে পাঠিয়ে দেবো, এক সপ্তার মধ্যে পাসপোর্ট চলে আসবে। সেই পাসপোর্ট দেখিয়ে তোমাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে দেবো – পরীক্ষায় অবশ্য পাস করতে হবে তোমাকে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্ডও বানিয়ে দেবো। ব্যস, হয়ে গেলো! কর্তৃপক্ষের চোখে তুমি পনেরো বছর পরে দেশে ফিরেছো, কোন সমস্যা নেই বন্ধু, চিন্তা বাদ দাও, ফূর্তি করো।"

বেয়ার প্রায় মাতল হয়ে উঠলেও জিভের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ছিলো তখনো পুরোপুরি। আর কিছু বললো না, কোনো গোপন তথ্য না। মিলারও আর খোচাঁলো না; বেশি চাপ দিতে গেলে হয়তো সন্দেহ হবে, একেবারেই চুপ মেরে যাবে।

কফির জন্যে তেষ্টা পেয়েছে তবুও কফি আনতে নিষেধ করলো মিলার। তার ভয় কফি খেয়ে যদি ফ্রানৎস বেয়ারের মাতলামি কেটে যায়। মোটা লোকটা বেশ ব্যাগ থেকে টাকা বের ক'রে খাবারের দাম চুকিয়ে দিলো। তারপর চললো ওরা কোট আনাবার কাউন্টারে। সময় তখন সাড়ে দশটা।

"চমৎকার কাটলো সন্ধ্যাটা, হের বেয়ার। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"ফ্রানৎস বলে ডেকো," কোট পরতে পরাতে হাঁসফাঁস ক'রে সে।

মিলার তার কোটটা পরে নিয়ে বললো, "আচ্ছা, স্টুটগার্টে বোধহয় রাতের জীবন ব'লে কিছু নেই।"

"হ্যা, নেই! তুমি খুব জানো! আমাদের শহর সম্পর্কে কি জানো তুমি? অন্তত আধডজন ভালো ক্যাবারে আছে...যাবে নাকি?"

"ক্যাবারে? মানে, বলতে চান ওই স্ট্রিপটিজ আর ওই সব?" মিলারের চোখ দুটো যেনো গোল গোল হয়ে ওঠলো।

খিক্‌খিক্ ক'রে হাসলো বেয়ার। চোখে টিপে বললো, "যাবে নাকি? চলো সুন্দরীদের কাপড় খোলা দেখতে আমারও মন্দ লাগবে না।"

কোট রাখার মেয়েটিকে মোটা বখশিশ দিয়ে বেয়ার হেলেদুলে বাইরে বের হলো।

বোকার মতো প্রশ্ন করলো মিলার, "স্টুটগার্টে ক'টা নাইটক্লাব আছে?"

"দাঁড়াও দেখছি। মোলাঁরুজ, বালজা, ইম্পিরিয়াল আর সায়োনারা। হ্যা, তাছাড়া এবারহার্ড স্ট্রাসে আছে মাদেলিন।"

"এবারহার্ড? আরে, কি অদ্ভুত! ব্রেমেনে আমার মালিকের নামও তো তাই ছিলো। সেই-ই তো আমকে ওখান থেকে নুরেমবার্গ উকিলের কাছে পাঠিয়েছিলো!" মিলার একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো।

"তাই নাকি! বাহ্, তাহলে ওখানেই যাওয়া যাক্।" বেয়ার চললো তার গাড়ির উদ্দেশে।

রাত সোয়া এগারোটার দিকে ম্যাকেনসেন গিয়ে পৌছালো তিন মুরে। ওয়েটারদের নেতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো।

"কি বললেন, হের বেয়ার? হ্যা হ্যা, এসেছিলেন আজ রাতে। চলে গেছেন আধ ঘন্টা আগে।"

"তার সঙ্গে এক লোক ছিলো না? লম্বা মতো, ছোট্ট বাদামী চুল, গোঁফ আছে।"

"হ্যা, ছিলো। মনে পড়ছে আমার, ওদিকের কোণার টেবিলে বসেছিলেন।"

বিশ মার্কের একটা নোট অনায়াসে লোকটার হাতে গুজে দিলো ম্যাকেনসেন, কোন আপত্তি করলো না লোকটা।

"দেখো, ভীষণ জরুরী ব্যাপার। তাকে আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। তার বৌ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়ে..."

"হায় হায়, সে কি!" উৎকণ্ঠায় তার মুখটা যেনো কুঁচ্‌কে উঠলো।

"এখান থেকে তারা কোথায় গেছে, জানো?"

"না! আচ্ছা, দাঁড়ান।" অন্য আরেকজন পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যান্স, তুমি তো ওই টেবিলে হের বেয়ার আর তাঁর বন্ধুকে পরিবেশন করেছিলে। ওরা কোথাও যাবার কথা বলেছিলো নাকি?"

"না, তেমন কোন কথা বলতে তো আমি শুনিনি।"

ওয়েটার তখন বললো, "আপনি কোট-টুপি রাখে যে মেয়েটা তাকে বরং জিজ্ঞস করুন। ও হয়তো কিছু শুনে থাকতে পারে।"

ম্যাকেনসেন মেয়েটিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো। তারপর টুরিস্টদের কাগজ চেয়ে নিয়ে দেখলো স্টুটগার্টে কি চলছে। ক্যাবারে বিভাগে কয়েকটা নাম চোখে পড়লো। বইটার মাঝখানে শহরের কেন্দ্রস্থলের একটা মানচিত্র আঁকা ছিলো। গাড়িতে ক'রে ম্যাকেনসেন চললো প্রথম ক্যাবারের উদ্দেশ্যে।

মাদেলিন নাইটক্লাবে দুজনের একটা টেবিলে গিয়ে বসলো বেয়ার আর মিলার।

www.boiRboi.blogspot.com

বেয়ার তখনও মদ খেয়ে যাচ্ছে। বড় বড় চোখ মেলে দেখছে উদ্ভিন্না এক যুবতী ফ্লোরের মাঝখানে নিতম্ব দোলাতে দোলাতে হাতের আঙুল দিয়ে ব্রা'র হুক খুলছে। সেটা খুলে পড়ে যেতেই বেয়ার মিলারের পেটে কনুই দিয়ে মারলো এক ধাক্কা।

"কি দারুণ মাল, দেখেছো ছোক্‌রা!" হেলে দুলে হাসলো। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে তখন। মদে প্রায় চুর হয়ে গেছে বেয়ার। ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো মিলার, "দেখুন, হের বেয়ার আমার খুব ভয় লাগছে। ক'দিন আর পারিয়ে পালিয়ে থাকবো। পাসপোর্ট তাড়াতাড়ি আনাতে পারবেন না?"

বেয়ার মিলারের কাঁধ জড়িয়ে ধরলো, "আরে র‍্যাল্‌ফ, বন্ধু আমার, এতো ঘাবড়াচ্ছো কেন? বলেছি না, ফ্রানৎসের ওপর ছেড়ে দাও সব।" চোখ টিপে দিয়ে বললো, "আমি নিজে তো আর পাসপোর্ট বানাই না। ফটো পাঠিয়ে দেই এক লোকের কাছে। কোন ভাবনাই নেই। এসব কথা ছাড়ো, আরেক দফা হয়ে যাক পুরনো দোস্ত ফ্রানৎসের সঙ্গে।"

একটা টালমাটাল হাত শূন্যে তুলে দোলাতে লাগলো বেয়ার।

"এই বেয়ারা, আরেক রাউন্ড দাও।"

মিলার আরাম ক'রে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসলো। অবস্থাটা মনে মনে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলো। পাসপোর্টের ফটো তুলবার জন্যে যদি চুল গজাবার অপেক্ষা করতে হয় তো কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। অথচ বেয়ারের কাছ থেকে ভুজংভাজং দিয়ে যে ওডেসা-দলের পাসপোর্ট বানানোর কারিগরটার নাম-ঠিকানা নিয়ে নেবে তাও সম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে না। বেয়ার মাতাল হয়েছে বটে কিন্তু এমন মাতাল নয় যে তার জিভ থেকে সেই জালিয়াতের নামটা বেরিয়ে পড়বে।

নাইটক্লাব ছেড়ে আসতেই চায় না ওডেসার মোটা লোকটা। অনেক ক'রে যখন তাকে নিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বের হলো মিলার, তখন রাত একটা বেজে গেছে। বেয়ারের পা টলমল করছিলো। মিলারের কাঁধে হাতের ভর রেখে বাইরে বের হতেই হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার দমকে ওর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়লো।

মিলার গাড়ি রাখার জায়গাটায় পৌছে বেয়ারকে বললো, "আমিই না হয় গাড়ি চালিয়ে আপনাকে বড়ি পৌছে দিচ্ছি।" বেয়ারের কোটের পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের ক'রে মোটা লোকটাকে গাড়িতে তুলে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। তারপর চালকের আসনে গিয়ে বসলো মিলার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মোড় ঘুরে একটা ধূসর রঙের মর্সিডিজ গাড়ি পেছন থেকে ওদের দিকে আসতে আসতে হঠাৎ ব্রেক কষে বিশ গজ দূরে থেমে গেলো।

উইন্ডস্ক্রিনের পেছনে ব'সে ব'সে ম্যাকেনসেন ওদের গাড়ির নম্বরটা লক্ষ্য করলো। পাচঁটা নাইটক্লাব ঘুরে অবশেষে মাদেলিনে এসে পৌছাতেই দেখলো যে তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত গাড়িটা ধীরে ধীরে রওনা দিচ্ছে। কোন ভুল নেই কোথাও।

www.boiRboi.blogspot.com

ফ্রাউ বেয়ার তার স্বামীর গাড়ির নম্বর আগেই ব'লে দিয়েছিলো, ঠিক মিলে যাচ্ছে। ক্লাচ চেপে চেপে চললো তার পেছনে পেছনে।

মিলার সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলো। মদের ঘোর কাটিয়ে অতি সতর্কভাবে, যাতে এই মোক্ষম সময়ে পুলিশের গাড়ি এসে তাকে মাতাল অবস্থায় গাড়ি ড্রাইভিংয়ের দায়ে চালান না করে। গাড়ি নিয়ে চললো বেয়ারের বাড়ির দিকে নয়, নিজের হোটেলের দিকে। মাথা নিচু ক'রে বেয়ার ঝিমাচ্ছে। টাই আর কলারের ওপর কয়েক পরত পুরু চর্বির ভাঁজের ওপর তার মাথাটা দুলছে।

হোটেলের বাইরে মিলার তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগালো। "ফ্রানৎস...বন্ধু...ওঠো, চলো এক চুমুক নাইটক্যাপ হয়ে যাক।"

মোটা মানুষটা তার দিকে চেয়ে রইলো। বিড়বিড় ক'রে উঠলো, "বা-বা-বাড়ি যে-যেতে হবে...বউ ব-ব-ব'সে আছে।"

"আরে, এসো না, একটুখানি...সন্ধ্যাটার সদ্ব্যবহার করি । আমার ঘরে ব'সে জিভে ঢালতে ঢালতে পুরনো দিনের গল্পো করা যাবে।"

খিক্‌খিক্ ক'রে মাতাল-হাসি হাসলো বেয়ার। "পুরনো দিন...অ্যা, সে যে কি দিন ছিলো, র‍্যাল্‌ফ...বিরাট!"

মিলার নেমে এসে বেয়ারকে নামিয়ে নিলো। ফুটপাতের ওপর দিয়ে হাত ধ'রে ধরে তাকে নিয়ে এসে ঢুকলো হোটেলের বড় দরজা দিয়ে। বললো, "বিরাট দিন তো বটেই...চলেন, সে সব দিনের গল্প করা যাক।"

রাস্তায় তখন মার্সিডিজটা আলো নিভিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

মিলার তার ঘরের চাবিটা পকেটেই রেখে দিয়েছিলো। ডেস্কের পেছনে হোটেলের নৈশকর্মী তখন ঝিমুচ্ছে। বেয়ার বিড়বিড় ক'রে কি যেনো একটা বলতে গেলো।

"চুপ চুপ, কথা বলবেন না!"

"চুপ...চুপ!" বেয়ার নিজেও কয়েকবার বললো। হেলে দুলে সিড়ি দিয়ে চললো। নিজের অভিনয়ে নিজেই হেসে উঠলো মিলার। ভাগ্য ভালো মিলারের ঘর ছিলো দোতলায় নইলে আরো ওপরে উঠতে হলে বেয়ারের পক্ষে হয়তো সম্ভব হোতো না। ঘরের একমাত্র হাতালওলা চেয়ারে তাকে বসিয়ে দিলো মিলার।

বিপরীত দিকের রাস্তা থেকে তখন ম্যাকেনসেন চেয়ে আছে অন্ধকার হোটেল-কামরাগুলোর দিকে। রাত দুটো বাজে। কোন ঘরে আলো নেই। মিলারের ঘরে আলো জ্বলে উঠতেই ম্যাকেনসেন লক্ষ্য ক'রে দেখেলো যে তার ঘরটা দোতলায়, হোটেলের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালে ডান পাশে।

মনে মনে হিসাব ক'রে দেখলো যে ওপরে উঠে মিলাম তার শোবার ঘরের দরজা খোলামাত্র তাকে মারাটা ঠিক হবে না দুটো কারণে। প্রথমত, লবির কাঁচের

www.boiRboi.blogspot.com

দরজা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে যে হোটেলের নৈশকর্মীটি বেয়ারের পায়ের শব্দে ঢুলুনি ভেঙ্গে যাওয়াতে এখন ভেতরে পায়চারী করছে। রাত দুটোয় যদি সে ওপরে উঠে যায় সিড়ি বেয়ে তবে স্পষ্ট মনে থাকবে সেকথা...হোটেলের কোন বোর্ডার নয় সেটাও লক্ষ্য করবে...পরে পুলিশের কাছে বিবরণও দেবে বেশ ভালোমতো। আর দ্বিতীয় কথাটা হলো, বেয়ারের অবস্থা। কেমন ক'রে তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো মিলার তা দেখেছে সে...অতএব মিলারকে হত্যা করবার পর তাড়াতাড়ি চম্পট দিতে পারবে না বেয়ার, ধরা প'ড়ে যাবে। আর বেয়ার ধরা পড়া মানেই ওয়েরউলফ খেপে যাবে...ম্যাকেনসেনেরই বিপদ তাতে। তার প্রকৃত নামে বেয়ারের নাম ফেরারী তালিকায় বেশ মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে, তাছাড়া ওডেসাতে তো সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

জানালা দিয়ে গুলি করার স্বপক্ষে আরো একটা যুক্তি খাড়া করলো ম্যাকেনসেন। হোটেলের বিপরীত দিকে একটা দালান তৈরি হচ্ছে; অর্ধেক হয়ে গেছে সেটা, কাঠামো আর মেঝেগুলো তৈরি, দোতলা তিন তলায় যাবার জন্যে কংক্রিটের সিঁড়িও রয়েছে যদিও এখনো সেটা এবড়োখেবড়ো। মিলার তো পালিয়ে যাচ্ছে না, অপেক্ষা করবে সে সেখানে। নিজের গাড়ির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে চললো ম্যাকেনসেন। ফন্দি আঁটা হয়ে গেছে। গাড়ির বুটের ভেতরে রয়েছে একটা শিকারের উপযুক্ত দূরপাল্লার রাইফেল।

ঘুষিটা যখন এলো বেয়ার হকচকিয়ে গেলো। মোটেই প্রস্তুত ছিলো না এর জন্যে। মদের ঘোরে প্রতিক্রিয়াশক্তিও শ্লথ হয়ে গেছে। সময়ই পেলো না উল্টো ঝাঁপিয়ে পড়বার। ওয়ার্ডরোব খুলে হুইস্কির বোতল খুঁজছে যেনো এরকম একটা ভান ক'রে মিলার তার একটা টাই বের ক'রে এনেছিলো। দুটোই নিজের টাই, আরেকটা গলায় ঝুলছে। সেটাও খুলে ফেলেছে।

দশ বছরেরও ওপর হয়ে গেলো আর্মির শিক্ষাশিবিরে সে আর তার রংরুট সহকর্মীরা নানারকম ঘুষি চালানো শিখেছিলো। কতোখানি ফলপ্রসূ যে সেগুলো তা কোনদিন পরখ করবার সুযোগ হয়নি। চেয়ারে ব'সে বেয়ার বিড়বিড় করলো, "আহ্, ঈ যে সেইসব দিন..." পেছন থেকে মোটা ঘাড়টাকে দেখাচ্ছিলো যেনো একটা গোলাপী পাহাড়। তাই যতোটা জোরে পারে মিলার ঘুষি মারলো।

নক-আউট ঘুষি নয়। কারণ মিলারের হাত একটু নরম আর এসবে সে অপটু তার ওপর বেয়ারের ঘাড়ে চর্বির স্তর পুরু। তবুও তাতেই কাজ হলো। চেতনা থেকে মদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে উঠতে ওডেসার নেতা দেখলো যে তার দুটো কব্জিই কাঠের চেয়ারের দুটো হাতলের সঙ্গে শক্ত ক'রে বাঁধা।

"শালার এতো বড় আস্পর্ধা! অ্যা, শালা..." জড়ানো কণ্ঠে বললো সে।

www.boiRboi.blogspot.com

জোরে জোরে মাথা দোলালো এদিক-ওদিক যাতে মস্তিষ্কের অস্পষ্টতা কেটে যায়। তার নিজের টাইটাও খুলে গেলো ততোক্ষণে, সেটা দিয়ে তার বাম পায়ের গোড়ালি চেয়ারের পায়ার সঙ্গে শক্ত ক'রে বেঁধো দেয়া হলো, ডান পা'টাকে টেলিফোনের তার দিয়ে বাঁধা হয়ে গিয়েছিলো আগেই।

প্যাঁচার মতো চোখ ক'রে মিলারের দিকে চেয়ে রইলো সে। বোধশক্তির তার বোতাম-মার্ক চোখের তারায় ফুঠে উঠলো একটু একটু ক'রে। তাদের সবার মতোই বেয়ারের মনেও একটা ভয়ংকর ভীতি আছে।

"না না, আমাকে কখনো তুমি নিয়ে যেতে পারবে না...তেল আভিভে কখনো নিয়ে যেতে পারবে না। কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। তোমাদের লোকদের আমি কখনো ছুয়েও দেখিনি..."

কথাগুলো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো, কারণ ততোক্ষণে একজোড়া মোজা তার মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়েছে মিলার। একটা স্কার্ফ দিয়ে মুখটা শক্ত ক'রে বেঁধে দিলো ঘাড়ের পেছনে। স্কার্ফটা তার মা দিয়েছিলো মিলারকে, ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য। নকশা-কাটা প্যাটার্নের ওপর থেকে বেয়ারের দুটো আর্তচোখ তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

ঘরের অন্য হাতলহীন চেয়ারটাকে টেনে সেটাকে উল্টিয়ে বসলো মিলার। বন্দীর কাছ থেকে প্রায় দুই ফুট দূরে রইলো।

"শোনো হারামজাদা। আমি ইস্রায়েলের চর নই, বুঝলে? আর তুমি কোথাও যাচ্ছো না। এখানেই থাকবে। আর মুখ খুলবে আমার কাছে...বুঝলে?"

প্রত্যুত্তরে বেয়ারের চোখ দুটো স্কার্ফের ওপরে শুধু ধকধক্ ক'রে জ্বলে উঠলো। আমোদের ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গও আর সে দুটো হাতে নেই। এখন লাল লাল ছোপ ধরেছে সেখানে, যেনো ঘন ঝোপের ভেতরে একটা বন্য শুয়োর।

"আমি যা চাই আর রাতটা ভোর হওয়ার আগে তুমি যা বলবে তা হলো ওডেসার হয়ে যে লোকটা পাসপোর্ট বানিয়ে দেয় তার নাম আর ঠিকানা।"

চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎ টেবিল-ল্যাম্পটা তার নজরে পড়লো। প্লাগ খুলে সেটাকে নিয়ে এলো কাছে।

"শোনো শালার বেয়ার – অথবা তোমারনাম যাই হোক। আমি তোমার মুখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি। কথা বলবে ভদ্রছেলের মতো। যদি চেঁচামেচি করো তবে এটা তোমার মাথায় পড়বে। মাথা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবো...বুঝলে?"

অবশ্য কথাটা সত্য নয়। মিলার কোনদিন মানুষ খুন করেনি, আজও সেটা করবার কোন ইচ্ছাই নেই তার।

ধীরে ধীরে স্কার্ফটা আলগা ক'রে দিয়ে বেয়ারের মুখ থেকে মোজাজোড়া টেনে বের ক'রে আনলো। কিন্তু ডান হাতে ভারি ওজনের টেবিল-ল্যাম্পটাকে মোটা

www.boiRboi.blogspot.com

লোকটা মাথার ওপর ধ'রে রাখলো।

"বানচোত শালা...হারামজাদা," রেগেমেগে বললো বেয়ার, "শালার টিকটিকি...কিছুই জানতে পারবি না আমার কাছ থেকে।"

কথাগুলো শেষ হতে না হতেই আবার মোজাজোড়া ঢুকে গেলো তার ফোলা-ফোলা গালের ভেতর। স্কার্ফটা আবার মুখে লাগিয়ে দেয়া হলো।

"পারবো না...অ্যা?" মিলার বললো, "আচ্ছা...আঙুলগুলো দিয়ে শুরু করি, দেখি কেমন লাগে।"

বেয়ারের ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর অনামিকা নিয়ে পেছন দিকে বাঁকাতে থাকলো মিলার। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো বেয়ার।

এবার মুখটা আবার খুলে দিলো।

ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, "তোমার দুটো হাতের প্রত্যেকটা আঙুল আমি ভেঙ্গে দিতে পারি, বেয়ার। তারপর টেবিলে-ল্যাম্প থেকে বাল্ব খুলে নিয়ে, সুইচ অন্ ক'রে, তোমার লিঙ্গটাকে ঢুকিয়ে দেবো ওখানে।"

শিউরে চোখ বন্ধ করলো বেয়ার। দরদর ক'রে ঘামছে এখন, মুখ ভিঁজে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে।

বিড়বিড় ক'রে বললো, "না না, ইলেক্ট্রিক না, ইলেক্ট্রিক না, ওখানে তো কোনমতেই না।"

"ব্যাপারটা তোমার জানা আছে দেখছি...তাই না?"

বেয়ার জানে বৈকি। বিশ বছর আগে 'সাদা খরগোশ' উইং কমান্ডার ইয়োটিমাসকে যারা এই যন্ত্রণা দিয়ে মাংসপিণ্ড বানিয়ে দিয়েছিলো তাদের মধ্যে বেয়ারও ছিলো অন্যতম। প্যারিসের ফ্রেসনে জেলের সেই ভূতলকক্ষ...উফ্! জানে না মানে...তবে চূড়ান্ত মুহূর্তটায় থাকেনি।

"বলো," রেগেমেগে বললো মিলার, "জালিয়াতের নাম কি, তার ঠিকানা কি?"

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো বেয়ার। ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, "না, পারবো না, বলতে পারবো না, ওরা তাহলে আমাকে মেরে ফেলবে।"

মিলার আবার তার মুখের মধ্যে মোজা ঢুকিয়ে দিলো। তার বুড়ো আঙুলটা নিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে উল্টোদিকে বিরাট জোরে একটা হ্যাঁচকা টান মারলো। সশব্দে হাড় ভেঙে গেলো। বেয়ার চেয়ারে ব'সে আর্তনাদ করলো, মুখের ভেতরে গোঁজা কাপড়ের পুঁটলিটার মধ্যেই বমি ক'রে ফেললো সে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাপড় টেনে দিয়ে মিলার সরে গেলো, নইলে বমিগুলো তার গায়ে এসে লাগতো। মোটা লোকটার মাথা সামনের দিকে ঢুলে পড়লো; রাতের যাবতীয় দামি দামি খাদ্য, দু বোতল ওয়াইন কয়েক দফা বড় স্কচ, সব তার বুক

ভাসিয়ে কোলের ওপরে এসে পড়লো।

"বল্ শালা," মিলার গর্জে বললো, "আরো সাতটা আঙুল আছে তোর।"

চোখ দুটো বন্ধ ক'রে বেয়ার ঢোঁকে গিলে কোনমতে বললো, "উইনজার।"

"কি?"

"উইনজার, ক্লস উইনজার। সেই-ই বানায় পাসপোর্ট।"

"পেশাদার জালিয়াত নাকি?"

"একজন মুদ্রক।"

"কোথায়, কোন্ শহরে থাকে?"

"ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

"না বললে আমিই মেরে ফেলবো...কোন্ শহর?"

"অসনাব্রুখ," অস্ফুট কণ্ঠে বললো বেয়ার।

তার মুখে আবার কাপড়ের পুটলিটা গুঁজে দিয়ে মিলার চিন্তা ক'রে নিলো। ক্লস উইনজার, অসনাব্রুখের জনৈক মুদ্রক। অ্যাটাচি কেস খুলে সেটা থেকে একটা ম্যাপ বের করলো। জার্মানির রাস্তার একটা ম্যাপ।

অসনাব্রুখে যাবার জাতীয় সড়ক অনেক উত্তরে – নর্ড রাইন/ওয়েস্ট-ফালিয়ার ভেতরে ম্যানহাইম, ফ্রাংফুর্ট, ডর্টমুন্ড মুনস্টারের মধ্যে দিয়ে গেছে। চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ তো হবেই রাস্তার অবস্থার ওপর নির্ভর করে সেটা। রাত প্রায় তিনটা বেজে গেছে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ।

রাস্তার ওপাশে অর্ধসমাপ্ত দালানটার তিন তলায় একটা ছোট্ট ঘরে ব'সে ম্যাকেনসেন শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। ওপাশের হোটেলের দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। বার বার আলোকিত বন্ধ জানালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচের বড় দরজার দিকে তাকাচ্ছে সে। বেয়ার যদি বেরিয়ে আসলেই মিলাকে শেষ ক'রে দেয়া যাবে। অথবা, কেউ যদি জানালাটা খোলে, তাজা বাতাসের একটু ঝলক পাওয়ার জন্যে। আবার শরীরটা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো, ভারি রেমিংটন ৩০০০ রাইফেলটাকে দৃঢ় মুঠিতে শক্ত ক'রে ধরলো। তিরিশ গজ দূরের লক্ষ্যবস্তু, এইরকম একটা অস্ত্র, কোন সমস্যাই হবে না। ম্যাকেনসেন অপেক্ষা করতে পারবে, ধৈর্য আছে তার।

মিলার তার ঘরে নিঃশব্দে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলো। বেয়ারকে অন্তত ছয় ঘণ্ট নীরব রাখতে হবে। লোকটা হয়তো ভয়ের চোটে তার দলের নেতাকে বলবেও না যে সে জালিয়াতের গোপন কথা ফাঁস ক'রে দিয়েছে, তবু তার ওপর তো নির্ভর করা যায় না।

শেষ কয়েক মুহূর্ত মিলার বেয়ারের হাত-পায়ের আরো শক্ত করে বাঁধলো,

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

মুখটাও বেঁধে দিলো, তারপর চেয়ারটাকে কাত ক'রে শুইয়ে দিলো যাতে বেয়ার ইচ্ছে ক'রে চেয়ারসহ উলটে শব্দ ক'রে লোকজন না ডেকে আনতে পারে। টেলিফোনের তার আগেই ছিঁড়ে দিয়েছে সে। ঘরটার চারদিকে শেষ নজর বুলিয়ে মিলার বাইরে এসে দরজাটা লাগিয়ে দিলো।

সিড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই হঠাৎ মনে পড়লো হোটেলের নৈশকর্মী ওদেও দু'জনকে সিড়ি দিয়ে উঠতে দেখেছিলো, এখন হঠাৎ যদি সে নিচে নেমে বিল মিটিয়ে চলে যায় তবে কী ভাববে লোকটা? মিলার আবার পেছন ফিরে হিটেলের পেছন দিকে চললো। করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা জানালা আছে। তার নিচে রয়েছে ফায়ার-এস্কেপ সিঁড়িটা। জানালাটা খুলে মই দিয়ে মূহুর্তেই চলে এলো পেছনের উঠানে, যেখানে গ্যারেজটা রয়েছে। মিলার বেরিয়ে পড়লো সংকীর্ণ একটা গলিতে।

দু'মিনিট পরেই সে হাঁটতে লাগলো জাগুয়ারের উদ্দেশ্যে; প্রায় মাইল তিনেক পথ, বেয়ারের বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে সেটা। মদের প্রভাব আর রাতের কাজকর্মে খুব ক্লান্ত লাগছে তার, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে এখন। তবু ঘুমনোর উপায় নেই; উইনজারের কাছে গিয়ে পৌছাতেই হবে, যে-কোন সময়ে সে বিপদ-সংকেত পেয়ে যেতে পারে।

জাগুয়ারে গিয়ে যখন বসলো তখন প্রায় ভোর চারটা বেজে গেছে। আরো আধ ঘণ্টা পর উত্তরমুখী বড় সড়কটাতে গিয়ে পৌছালো, হাইলব্রন আর ম্যানহাইমের পথে।

মিলার ঘর ছেড়ে যাওয়া মাত্র বেয়ার মুক্তি পাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা করতে লাগলো। মাতলামি তার কখন কেটে গেছে। মুখটাকে এগিয়ে কবজির বাঁধন দাঁত দিয়ে চেষ্টা করলো। কিন্তু অতোবড় মোটা মুখ, নিচুও হওয়া যায় না। তাছাড়া মুখের ভেতরে মোজার পুটলির জন্যে দাঁতের পাটি দুটো আলাদা হয়ে আছে। কয়েক মিনিট পর পরেই নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস টানতে হচ্ছে।

পায়ের বাঁধন আলগা করতে চেষ্টা করলো বারবার নড়ে চড়ে টেনে হিঁচড়ে। কোন লাভ হলো না। ভাঙা বুড়ো আঙুলটায় অসহ্য ব্যথা, ফুলেও উঠেছে বেশ, তবু চেষ্টা করলো কোনমতে মোচড়া-মুচড়ি ক'রে যদি কব্জি গলিয়ে আনতে পারে। পারলো না যখন তখন চোখে পড়লো মেঝের ওপর টেবিল-ল্যাম্পটার দিকে। বাল্বটা তখনো লাগানো, কিন্তু ভাঙতে পারলে অনেক কাঁচের টুকরো পাওয়া যাবে, টাই কেটে বাঁধন খোলা হয়তো যাবে তখন।

ওলটানো চেয়ারসুদ্ধ হেঁচ্ড়ে হেঁচ্ড়ে মেঝের ওপর দিয়ে টেবিল-ল্যাম্পের কাছে পৌছাতে এক ঘণ্টা সময় লেগে গেলো তার। তারপর অবশ্য বাল্ব ভাঙতে আর সময় লাগলো না।

www.boiRboi.blogspot.com

শুনতে সহজ, কিন্তু এক টুকরো ভাঙা কাঁচ দিয়ে বাঁধা থাকা অবস্থায় কব্জির বাঁধন কাটা সহজ কাজ নয়। কাপড়ের একটা পরত কাটতেই ঘণ্টা লেগে যায়। বেয়ারের কব্জি থেকে ঘাম বেরিয়ে টাইয়ের কাপড় ভিজে গেলো, তাতে মোটা মোটা হাতের ওপর আরো শক্ত হয়ে গেলো বাঁধনটা। সাতটা যখন বেজে গেলো শহরের বাড়ি-ঘরের ছাদে আলো ফুটলো, সেই সময় ভাঙা কাঁচের ঘষায় বাম-কব্জির বাঁধনের প্রথম পরতটা মাত্র ছিঁড়তে পারলো। বাম কব্জি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হতে প্রায় আটটা বাজলো।

সেই সময় মিলারের জাগুয়ারটা গর্জন তুলতে তুলতে কলোনরিং পেরিয়ে চলেছে। অসনাব্রুখ আরো একশো মাইল দূরে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে, বিশ্রী তুষারপাতও তার সঙ্গে চলছে। হাওয়ার বেগে সেগুলো সড়কের ওপর ঘুরে ঘুরে পড়ছে। উইন্ডস্ক্রিনে ওয়াইপার দুটো সাঁফ করে যাচ্ছে সেগুলো। ঘুমে ভার হয়ে আসছে মিলারের দু'চাখ।

গতি কমিয়ে ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে চললো মিলার। আর বাড়ানো কমানো নয়, একই গতি থাকুক। রাস্তা পিছলে দু'পাশের কর্দমাক্ত মাঠে গিয়ে পড়বার মোটেই ইচ্ছে নেই তার।

বাম হাতটা ছাড়ানোর পর কয়েক মিনিটেই মুখের বাঁধন খুলে ফেললো বেয়ার। কিছুক্ষণ শুধু বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। ঘরটায় গা-গুলানো দুর্গন্ধঃ ঘাম, ভয়, বমি আর হুইস্কির গন্ধ মিলেমিশে একাকার। ডান কব্জির গিট খুলে ফেললো সে, ভাঙা আঙুলটা থেকে যন্ত্রণার স্রোত উঠলো শির্‌শির্ ক'রে শরীরের মধ্যে। পা দুটোকে মুক্ত করে নিলো সে।

প্রথমেই দরজার কথাটা মনে এলো, কিন্তু সেটা তালাবন্ধ। টেলিফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলো, কিন্তু সেটাও ডেড। পা টেনে টেনে ঘরের মধ্যে হাঁটলো; এতোক্ষণ শক্ত ক'রে বাঁধা থাকায় রক্ত সঞ্চালন এখনো পুরোপুরি হয়নি। কোন মতে টলতে টলতে তারপর জানালার কাছে আসলো, একটানে পর্দাটা সরিয়ে জানালার পাল্লা দুটোকে ভেতরের দিকে টেনে খুলে ফেললো। রাস্তার বিপরীত দিকে ম্যাকেনসেন অতো ঠাণ্ডা সত্ত্বেও তার ঘরে ব'সে ব'সে ঢুলছিলো। হঠাৎ চোখে পড়লো মিলারের জানালার পর্দাটা সরে গেলো। নিমিষে রেমিংটন পিস্তলটা তাক্ ক'রে অপেক্ষা করতে থাকলো সে। যেই দেখলো একটা ছায়ার অবয়ব এসে পাল্লা দুটো ভেতরের দিকে টেনে খুলছে, অমনি তার মুখ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো।

বুলেট গিয়ে লাগলো বেয়ারের গলায়। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। অতোবড় লাশটা ভূপাতিত হওয়ার আগেই প্রাণপাখি উধাও। রাইফেলের শব্দ হয়তো গাড়ির ব্যাক ফায়ারিঙের শব্দ ব'লে ভুল করবে লোকে, কিন্তু সে ভুল টিকবে মাত্র মিনিটখানেক,

www.boiRboi.blogspot.com

তার বেশি নয়। ম্যাকেনসেন জানতো এই ভোরেও লোকজন আসবে খোঁজ করতে। অতএব ঘরের দিকে আর পলকমাত্র না চেয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে ম্যাকেনসেন দৌড়ালো। পেছন দিক দিয়ে ছুটলো সে, দু'একটি সিমেন্ট মিক্সার আর কাঁকরের স্তূপকে পাশ কাটিয়ে। গুলি ছোঁড়ার ষাট সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ির কাছে গিয়ে পৌছালো, বন্দুকটাকে বুটে ভ'রে রওনা দিলো সে।

গাড়িতে ব'সে চাবি ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো যে কোথাও একটা ভুল হয়েছে। যে লোকটাকে মারতে বলেছিলো ওয়েরউলফ, সে বেশ লম্বা একহারা চেহারার। অথচ জানালার ছায়াটা মোটা মতোন। গতকাল সন্ধ্যায় যা দেখেছে তাতে মনে হচ্ছে বেয়ারকেই মেরে বসেছে সে। অবশ্য তাহলেও খুব একটা সমস্যা নেই। বেয়ারকে মৃত অবস্থায় মেঝের ওপর পড়ে থাকতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মিলার ভাগবে। যতো জোরে ছুটতে পারে দৌড়াবে। তার মানে তিন মাইল দূরে রাখা তার জাগুয়ারের কাছে রুদ্ধশ্বাসে চলে আসবে। ম্যাকেনসেন তার মার্সিডিজটা নিয়ে ছুটলো সেইদিকে। কিন্তু পৌছেই দেখলো বেনজ ট্রাক আর একটা ওপেল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা, অথচ আগের সন্ধ্যায় ওখানেই তো রাখা ছিলো জাগুয়ারটা। এবার দূর্ভাবনায় পড়লো ম্যাকেনসেন।

কিন্তু বিপদের সময় মুর্ছা যাওয়ার মতো মানুষ ম্যাকেনসেন নয়, তা হলে কি সে ওডেসা দলের প্রধান-ঘাতক হতে পারতো? জীবনে বহু সমস্যায় পড়েছে, বহুবার। ড্রাইভিং হুইলে কয়েক মিনিট নিথর হয়ে ব'সে রইলো। অবশেষে বুঝতে পারলো মিলার অবশ্যই ভেগেছে, নিশ্চয়ই কয়েক'শ মাইল পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

বেয়ারকে জ্যান্ত অবস্থায় রেখেই মিলার পালিয়েছিলো। অর্থাৎ, ম্যাকেনসেন মনে মনে চিন্তা ক'রে দেখলো যে হয় মিলার তার কাছ থেকে কিছুই পায়নি, নয়তো কিছু পেয়েছে। যদি কিছু পেয়ে না থাকে তো কোন ক্ষতিই হয়নি। ধীরে-সুস্থে পরে মিলারকে নিঃশেষ করা যাবে, কোন তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু যদি কিছু পেয়ে থাকে তো তা কোন সংবাদ হবে, কোন গোপন তথ্য। মিলার কিসের অনুসন্ধানে ঘুরছে যা বেয়ার তাকে দিতে পারে, তা জানেন একমাত্র ওয়েরউলফ।

অতএব ওয়েরউলফ রাগে ফেটে পড়বে জেনেও ম্যাকেনসেন তাকে টেলিফোন করার সিদ্ধান্ত নিলো।

সাধারণ টেলিফোন খুঁজে বের করতে করতে বিশ মিনিট সময় লেগে গেলো। দুরপাল্লার কথোপকথনের জন্যে ম্যাকেনসেন সব সময়েই পকেটভর্তি খুচরা মার্ক রেখে দিতো।

নুরেমবার্গে সংবাদ শুনে ওয়েরউলফ থ হয়ে গেলো। রাগে ফেঁটে পড়লো সে। টেলিফোন লাইনে ভেসে উঠলো একগাদা গালিগালাজ। কয়েক সেকেন্ড পরে

www.boiRboi.blogspot.com

একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললো, "ওকে খুঁজে বের করো হারামজাদা তাড়াতাড়ি...কোথায় যে গেছে ঈশ্বরই জানে!"

ম্যাকেনসেন জানতে চাইলো কি ধরনের খবর বেয়ার ওকে দিতে পারে সেটা যদি সে জানতে পারে তাহলে সুবিধা হয়।

লাইনের অপর প্রান্তে ওয়েরউলফ একটু দম নিয়ে বসে রইলো।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তারপর বললো, "হায় ঈশ্বর...জালিয়াত...জালিয়াতের নাম জেনে গেছে সে।"

"জালিয়াত কি স্যার?" ম্যাকেসেন জানতে চাইলো।

সম্বিৎ ফিরে পেলো ওয়েরউলফ। শুক্‌নো গলায় শুধু বললো, "আচ্ছা, তাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি...হ্যা...মিলার ওখানেই গেছে–"

ম্যাকেনসনকে একটা ঠিকানা বলে দিলো। তারপর নির্দেশ দিয়ে জানালো, "অসনাব্রুখে যাও; এমন তেজে গাড়ি চালাবে কোনদিন যা করোনি, উড়ে যাবে একেবারে। ওই ঠিকানাতে মিলারকে পাবে, নয়তো শহরের অন্য কোথাও। যদি বাড়িটাতে না পাও, জাগুয়ারের খোঁজে চোখ রাখবে। এবারে জাগুয়ারটা ছেড়ো না, ঘুরে ঘুরে ওখানেই সে ফিরে আসবে।"

ঠক্ ক'রে টেলিফোন রেখে আবার তুলে নিয়ে এনকোয়ারিতে একটা নাম্বার চাইলো। নাম্বরটা পেয়ে অসনাব্রুখে ডায়াল করলো।

স্টুটগার্টে ম্যাকেনসেন দেখে যে তার হাতের ধরা যন্ত্রে আর কোন সাড়া নেই, শুধুই যান্ত্রিক আওয়াজ হচ্ছে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার তার মার্সিডিজে গিয়ে বসলো। মিলারের মতোই তার দু'চোখ ঘুম আসছে। আগের দিনে লাঞ্চের পর থেকে তো আবার পেটেও কিছু পড়েনি।

সাধারণত খোলা জায়গায় ব'সে ব'সে পাহারা দিয়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরে গেছে। আগুনের মতো গরম কফি আর তার পরে স্টাইনহেগার পেলে খুব ভালো হোতো। কিন্তু উপায় নেই। মার্সিডিজটা স্টার্ট দিয়ে উত্তর দিকে চললো ওয়েস্টফালিয়ার পথে।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১৪

ক্লস উইনজারকে দেখেও মনেও হবে না যে সে কোনদিন এসএস-এ ছিলো। কারণ তাদের ন্যূনতম দৈর্ঘ্য ছয় ফুটের নীচে তার উচ্চতা, তাছাড়া চোখেও কম দেখে। চল্লিশ বছর বয়সেই থলথলে চেহারার হয়ে গেছে, এলোমেলো সোনালী চুল, আত্মবিশ্বাসের বেশ অভাব যেনো তার চালচলনে। বস্তুত এসএস বাহিনীতে যতো লোক ভর্তি হয়েছিলো তার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র কাহিনী হলো এই ব্যক্তিটির।

১৯২৪ সালে ক্লসের জন্ম হয়েছিলো; বাপ ছিলো উইসব্যাডেনের এক শুকরমাংস বিক্রেতা। বিশ দশকের গোড়া থেকেই অ্যাডলফ হিটলার আর নাৎসি পার্টির পরম ভক্ত হয়ে উঠলো তার বাবা। সেইসব দিনে, ক্লসের স্পষ্ট মনে পড়ে বাবা বাড়ি ফিরতো পথে পথে কমিউনিস্ট আর সোশ্যালিস্টদের মধ্যে মারপিটের শেষে খুব বীরদর্পে মহল্লা কাঁপিয়ে।

ক্লস দেখতে হয়েছিলো তার মায়ের মতো। বাবা সেজন্যে খুব বিরক্ত ছিলো – এই ছেলে এমন হালকা-পাতলা কেন হলো, গায়েও জোর নেই, চোখেও কম দেখে। মারপিট ভালো লাগতো না ক্লসের, খেলাধূলাও না, তরুণ-হিটলার দলের নাম শুনেই বিশ্রী লাগতো তার। একটি মাত্র কাজের তার দারুণ আগ্রহ ছিলো: হস্ত লিপির শিল্প, নানারকম হাতের লেখা লিখতে পারা, সেগুলোতে আবার নানারকম বিচিত্র কারুকার্য করা, তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স থেকে এই কাজ নিয়েই মাতলো সে, অপূর্ব দক্ষতা জন্মালো তাতে। বাপ তো দেখে দেখে ঘৃনায় মুখ বেঁকে রাখে, ছেলে কিনা শেষে এমন একটা মেয়েলি কাজ ধরলো!

নাৎসিদের হাতে ক্ষমতা আসবার পর শুয়োরের মাংসবিক্রেতাটি তো ফুলে ফেঁপে উঠলো। পার্টিতে কতো কাজ ক'রে দিয়েছে আগে, তাই স্থানীয় এসএস ব্যারাকগুলোতে মাংস সরবরাহ করার একচ্ছত্র অধিকার পেয়ে গেলো। এসএস তরুণগুলোকে যখন দেখতো, ঘাড় ফুলিয়ে বীরদর্পে হেঁটে বেড়াচ্ছে, মনে মনে তখন

www.boiRboi.blogspot.com

কামনা করতো, আহা, নিজের ছেলেটি যদি কোনদিন গ্যুৎজ স্ট্যাফেলের কালো রূপালী প্রতীক লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতো!

ক্লসের কিন্তু সেদিকে কোনই উৎসাহ ছিলো না। নিজের তৈরি লিপিচিত্রগুলো নিয়েই তন্ময় হয়ে থাকতো, নানাধরনের রঙ আর সুন্দর সুন্দর হস্তাক্ষর নিয়ে অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতো। তারপর যুদ্ধ বাঁধলো। ১৯৪২-এর বসন্তে ক্লস আঠারোতে পা দিলো। ডাক পড়বার বয়স হয়ে গেলো। বাপের মতো দৃঢ়মুষ্টি আর সবল চেহারা নেই তার, তেমন উগ্র ইহুদি-বিদ্বেষী ছিলো না। বরং ছোটোখাটো লাজুক আর ফ্যাকাশে চেহারার কিশোর। সেনাদলে কেরানীগিরি করবার মতোও স্বাস্থ্য নেই তার, ডাক্তারী পরীক্ষায় ফেল করলো। রিক্রুটিং বোর্ড থেকে বাড়ি ফিরে এলো ক্লস। তার বাপের পক্ষে সেটা মেনে নেয়া কী কষ্টকরই না ছিলো।

জোহান উইনজার বার্লিনের ট্রেন ধরলো। রাস্তায় মারপিটের দিনের এক সঙ্গী এখন এসএস-এ কেউকেটা হয়ে গেছে। তাকে ধরে ছেলের জন্যে যদি কিছু করা যায়, রাইখের সেবায় কোন একটা বিভাগে যদি তাকে ঢোকানো যায়। লোকটা আশ্বাস দিলো কিন্তু করতে পারলো তার চেয়েও কম। জিজ্ঞেস করলো তরুণ ক্লস কি কোন কাজে বিশেষ পারদর্শী? লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে তার বাপ বললো যে ছেলে নক্‌শা-কাটা চিত্রলিপি বানাতে পারে।

লোকটি যথাসাধ্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলো। তবে ভূমিকা হিসাবে কিছু নির্দশন চাইলো – জনৈক এসএস মেজর ফ্রিৎস সুহরেনের সম্মানে পার্চমেন্টের ওপর একটা মানপত্র লিখে দিতে পারবে কি ক্লস?

উইসব্যাডেন ফিরে ছেলেকে বলতেই সে কাজে লেগে গেলো। এক সপ্তাহ পরে বার্লিনের এক উৎসবে সুহরেন তার সতীর্থদের কাছ থেকে মানপত্রটি উপহার পেলো। সাখসেনহাউসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের পদ থেকে বদলি হয়ে তখন সুহরেন যাচ্ছে আরো কুখ্যাত ক্যাম্প র‍্যাভেন্সব্রুখের প্রধান হয়ে।

১৯৪৫-এ সুহরেনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ক'রে ফরাসিরা।

বার্লিনে আরএসএইচ-এর হেডকোয়ার্টারে দায়িত্বভার হস্তান্তরের উৎসবে সবাই ওই সুন্দর সুশোভিত মানপত্রটির প্রশংসা করলো। তার মধ্যে ছিলো অ্যালফ্রেড নউজোকস নামে জনৈক এসএস লেফটনান্ট। এই লোকটিই ১৯৩৯-এর আগস্ট মাসে জার্মান-পোলিশ সীমান্তে গ্লেভিজ বেতারকেন্দ্রে মিথ্যা আক্রমণ চালিয়ে কনসেনেট্রেশন ক্যাম্পের অধিবাসীদের মৃতদেহগুলোতে জার্মান সৈন্যের পোশাক পরিয়ে 'প্রমাণ' রেখে এসেছিলো যে পোল্যান্ডই জার্মানিকে আক্রমণ করেছে, যার ফলে পরবর্তী সপ্তাহে হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করবার অজুহাত খুঁজে পেয়েছিলেন।

নউজোকস জানতে চাইলো মানপত্রটি বানিয়েছে কে? শুনেই কিশোর ক্লস

www.boiRboi.blogspot.com

উইনজারকে বার্লিনে আসার আমন্ত্রণ জানালো সে।

তারপর অনেক কিছুই ঘটে গেলো। ক্লস উইনজার ভালমতো কিছু বুঝে ওঠবার আগেই এসএস-এ ভর্তি হয়ে গেলো। কোন প্রশিক্ষণ নেই, শুধু বিশ্বস্ততার শপথ আর গোপনীয়তার আরেক দফা শপথ নিয়ে চলে গেলো এক গভীর-গোপন রাইখ প্রকল্পে। উইসব্যাডেনের মাংসওয়ালা তো বিস্ময়ে হতবুদ্ধির হয়ে গেলো ; আনন্দের সীমা নেই তার, যেনো বেহেস্ত পেয়ে গেছে।

প্রকল্পটিকে তখন আরএসএইচ-এর আওতায় ছয় নম্বর অ্যামটের এফ-বিভাগ থেকে বার্লিন শহরের ডেলব্রুখ স্ট্রাসের একটা কারখানায় চালানো হচ্ছিলো। মূল বিষয়টি খুবই সরল। লাখে লাখে বৃটিশ পাঁচ পাউন্ড নোট ও মার্কিনী একশো ডলারের বিল জাল ক'রে বের করবার চেষ্টা করছিলো এসএস। বার্লিনের বাইরে স্পেকথাউসেনের রাইখ ব্যাংকনোট-কাগজের ফ্যাক্টরিতে কাগজ তৈরি হচ্ছিলো। ডেলব্রুখ স্ট্রাসের কারখানাতে বৃটিশ ও আমেরিকান কারেন্সির ওয়াটারমার্কগুলো বানানোর চেষ্টা চলছিলো।

মতলব ছিলো যে জাল নোটগুলোকে বৃটেন এবং আমেরিকার বাজারে ছড়িয়ে দিয়ে ওই দেশ দুটোর অর্থনীতিকে ধ্বংস ক'রে দেয়া। ১৯৪৩-এর গোড়ার দিকে বৃটিশ পাঁচ পাউন্ড নোটের ওয়ার্টরমার্ক সঠিকভাবে তৈরি হয়ে গেলে প্রিন্টিং প্লেটগুলোকে সাখসেনহাউসেন কনসেনট্রেশন শিবিরের ১৯ নং ব্লকে স্থানান্তরিত করা হলো। সেখানে ইহুদি গ্র্যাফোলোডিস্ট এবং গ্রাফিক লিল্পীরা এসএস-দের তত্ত্বাবধানে কাজ ক'রে যেতো। উইনজারের ওপর ভার পড়লো কাগজগুলোর মান যাচাই ক'রে দেখা, কারণ এসএস তাদের বন্দীদের ওপর কখনোই ভরসা করতে পারতো না, ভয় ছিলো পাছে তারা তাদের কাজের মধ্যে ইচ্ছে ক'রে কোন ত্রুটি রেখে দেয়।

দু'বছরের মধ্যে উইনজার তার অধীনস্থ লোকগুলোর কাছ থেকে সবকিছু শিখে নিলো। আগেই তার কাগজ কালি, রেখাচিত্র, লিপিমালা সম্বন্ধে অদ্ভুত জ্ঞান ছিলো, এখন গ্র্যাফোলোজি শিখে নিয় হয়ে উঠলো এক অতি-সুদক্ষ জালিয়াত। ১৯৪৪-এর শেষ দিকে ১৯ নং ব্লকে জাল পরিচয়পত্রও তৈরি হতে শুরু হলো যাতে জার্মানির পরাজয়ের পর এসএস অফিসারেরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারে।

১৯৪৫-এর প্রথম বসন্তে ফলিত শিল্পের এই ছোট্ট দুনিয়াটি ধ'সে পড়লো। সাখসেনহাউসেন থেকে পুরো কাজটাকে তুলে অস্ট্রিয়ার পাহাড়ের গোপন বন্দরে নিয়ে যাবার আদেশ দিলো দলটির অধিনায়ক এসএস ক্যাপ্টেন বার্নহার্ড ক্রুয়েগার। মালপত্তর সব নিয়ে দক্ষিণে চললো গাড়িতে ক'রে; আপার অস্ট্রিয়ার রেডল-জিপফের পরিত্যক্ত বিয়ার কারখানায় আবার জালিয়াতির কারখানা বসলো। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার কয়েকদিন আগে আশাহত ক্লস উইনজারের চোখের সামনে তার

www.boiRboi.blogspot.com

বড় সাধের অতো সুন্দরভাবে জাল করা কোটি কোটি পাউন্ড ও ডলারের নোটগুলো হ্রদে ফেলে দেয়া হলো; সেদিন তার দুচোখ ভরে পানি পড়েছিলো।

বাড়ি ফিরে গেলো সে – উইসব্যাডেনে। অবাক হয়ে দেখতে পেলো যে ১৯৪৫ সালের সেই গ্রীষ্মে এসএস-এ যখন ছিলো তখন খাওয়ার কোনই অভাব ছিলো না, অথচ দেশে বেসামরিক লোকদের কতই না কষ্ট। উইসব্যাডেন এখন মার্কিনীদের কবলে, তাদের কোনই খাদ্যাভাব নেই, কিন্তু জার্মানরাই শুধু অনাহারে আছে। বাপ চিরজন্মের মতো নাৎসিবিরোধী হয়ে গেছে; অবস্থাও পড়ে গেছে তার। তাছাড়া জিনিসের খুব অভাব, আগে তার দোকান হ্যামে ঠাসা থাকতো, কিন্তু এখন কেবল সেখানে রাশিটাক সসেজ ঝুলছে।

ক্লসের মা তাকে জানায় যে খাবার কিনতে হয় র‍্যাশন-কার্ডে, সেগুলো আবার আমেরিকানরা ইসু করে। হতবুদ্ধি ক্লস রেশনকার্ডগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে। সস্ত গোছের কাগজে স্থানীয় ছাপাখানায় ছাপানো। কয়েকটা কার্ড নিয়ে ঘরে খিল দিলো ক'দিনের জন্যে। বের হলো যেদিন মায়ের হাতে গুঁজে দিলো গোটা কয়েক আমেরিকান র‍্যাশন কার্ড, যা দিয়ে তারা ছয় মাসেরও বেশি খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। মা তো আঁতকে ওঠে, "ওগুলো তো জাল!"

ক্লস তখন ধৈর্য ধ'রে মাকে বোঝায়, "ওগুলো জাল নয় মা, শুধু ভিন্ন মেশিনে ছাপানো।"

বাবাও ছেলেকে সমর্থন করে। "মূর্খ মেয়েলোক তুমি, বলতে চাও আমাদের ছেলের র‍্যাশন কার্ডগুলো ইয়াঙ্কিদের চেয়ে খারাপ?"

তর্কে জেতা দুঃসাধ্য, বিশেষ ক'রে সে-রাতে ওরা যখন চার পদের খাবার নিয়ে খেতে বসলো।

এক মাস পরে অটো ক্লপ্‌সের সঙ্গে দেখা হলো ক্লস উইনজারের। ক্লপ্‌স ছিলো উইসব্যাডেন শহরে কালোবাজারের সম্রাট। দু'জনে লেগে গেলো ব্যবসায়। উইনজার অসংখ্য র‍্যাশন কার্ড, পেট্রল কুপন, আঞ্চলিক পাস, ড্রাইভিং লইসেন্স, মার্কিন সামরিক পাস, পিএক্স কার্ড বানিয়ে দিতো আর ক্লপ্‌স সেগুলো দিয়ে খাদ্য, পেট্রল, ট্রাকের টায়ার, নাইলনের মোজা, সাবান, প্রসাধনদ্রব্য, কাপড় ইত্যাদি কিনতো। কালোবাজারে সেগুলো বেঁচে ওরা অল্পদিনের মধ্যেই বেশ বড়লোক হয়ে উঠলো। ১৯৪৮-এর গ্রীষ্ম পর্যন্ত তিরিশ মাসের মধ্যে একা উইনজারের ব্যাংকের খাতাতেই পঞ্চাশ লক্ষ রাইখস-মার্ক জমা পড়েছিলো।

ভীতসন্ত্রস্ত মা'কে সে তার সহজদর্শন ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলো, "কাগজ কখনো আসল নকল হয় না, মা; তারা হয় সক্ষম নইলে অক্ষম। কোন একটা পাস হাতে থাকলে যদি কোন সীমান্ত তুমি পেরিয়ে যেতে পারো, আর কোন কাগজের প্রভাবে যদি সেই সীমান্ত তুমি সত্যিই পেরিয়ে যাও, তাহলে তোমার হাতে আছে

www.boiRboi.blogspot.com

সক্ষম কাগজ।"

১৯৪৮-এর অক্টোবরে ক্লস উইনজার তার জীবনে দ্বিতীয়বার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো। দেশের মুদ্রাসংস্কার হলো: পুরনো রাইখসমার্কের জায়গায় এলো নতুন ডয়েসমার্ক। কিন্তু প্রতিটি পুরনো মার্কের বদলে নতুন মার্ক না দিয়ে প্রত্যেককে ঢালাও ১০০০ নতুন মার্ক দেয়া হলো। উইনজার তলিয়ে গেলো, তার সম্পদ হয়ে গেলো শুধু কয়েক বান্ডিল বাজে কাগজ।

খোলা বাজারে জিনিসপত্র আসতে শুরু করতেই কালোবাজারিদের দিন ফুরালো। লোকে তখন ক্লপ্‌সের পেছনে লাগলো। সময় থাকতে উইনজার সটকে পড়লো। গাড়ি নিয়ে নিজের তৈরি একটা আঞ্চলিক পাস হাতে সোজা হ্যানোভারে চলে এলো, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তরে। সেখানে বৃটিশ সামরিক সরকারের পাসপোর্ট অফিসে একটা চাকরির দরখাস্ত করলো সে।

উইসব্যাডেনের মার্কিন কর্তৃপক্ষের দেয়া প্রশংসাপত্র ছিলো তার কাছে, জনৈক কর্নেলের দস্তখতে। তার সম্বন্ধে চমৎকার সব অভিমত লেখা : হতেই হবে – কারণ পুরো জিনিসটা তো তার তৈরি। যে বৃটিশ মেজর ইন্টারভিউ নিচ্ছিলো সে চায়ের কাপ শেষ ক'রে প্রার্থীটিকে জানালো: "নিশ্চয়ই বোঝো যে প্রত্যেকের সঙ্গে সব সময় তার পরিচয়পত্র থাকা কতোখানি দরকার?"

"হ্যা...মেজর সাহেব," একান্ত বশ্যদের মতো ভঙ্গী করে বললো উইনজার।

দু'মাস পরে এলো সৌভাগ্যের সূচনা। বিয়ার-হলে ব'সে একা একা বিয়ার পান করছে, তখন একটা লোক এসে আলাপ জমালো তার সাথে। লোকটার নাম হার্বার্ট মল্ডার্স। উইনজারকে সে চুপিচুপি জানালো যে যুদ্ধাপরাধের জন্যে বৃটিশরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাই জার্মানি থেকে তাকে পালিয়ে যেতেই হবে; অথচ জার্মানদের পাসপোর্ট দিতে পারে একমাত্র বৃটিশরা কিন্তু সে তো আবেদন করতে পারে না। তাহলেই ধরা পড়বে। উইনজার অস্ফুট স্বরে তাকে জানিয়ে দিলো যে উপায় একটা হতে পারে, কিন্তু টাকা লাগবে প্রচুর।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো উইনজার, মল্ডার্স পকেট থেকে একট আসল হীরার নেকলেস বের করলো। ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালো যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যখন ছিলো, তখন সেখানে একদিন এক ইহুদি বন্দী এসে এটা দেখিয়ে মুক্তি চাইলো। মল্ডার্স গয়নাটা হাতিয়ে ইহুদিটাকে প্রথম দলেই গ্যাস চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা পাকাপাকি ক'রে ফেলেছিলো। নিষিদ্ধ হলেও মাল কিন্তু নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলো।

এক সপ্তাহ পরে মল্ডার্সের একটা ছবি আনিয়ে উইনজার তার পাসপোর্ট বানিয়ে ফেললো। জাল করেনি, তার দরকারও পড়েনি।

পাসপোর্টের অফিসের নিয়মরীতিগুলো খুব সহজ-সরল। এক নম্বর বিভাগে

প্রার্থীরা আসতো তাদের পরিচয়পত্র নিয়ে, একটা ফর্ম পূরণ ক'রে চলে যেতো। দু'নম্বর বিভাগ বার্থসার্টিফিকেট, সনাক্ত কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে দেখতো, দলিলগুলো আসল না নকল, জালিয়াতি কি না তাও দেখতো, যুদ্ধাপরাধীদের ফেরারী তালিকার সঙ্গে নামও মেলাতো, তারপর সব পরীক্ষায় পাস হয়ে গেলে দলিলগুলো অনুমোদন ক'রে বিভাগপ্রধানের স্বাক্ষরিত অনুমোদন সহ তিন নম্বর বিভাগে পাঠিয়ে দিতো। একটা খালি পাসপোর্ট বই বের ক'রে সব বিবরণ লিখে প্রার্থীর ছবি লাগিয়ে এক সপ্তাহ পরে যখন প্রার্থী আবার সশরীরে এসে হাজির হোতো তাকে দিয়ে দিতো।

উইনজার চেষ্টাচরিত্র ক'রে তিন নম্বর বিভাগে বদলি হয়ে এসেছিলো। মল্ডার্সের হয়ে আনায়াসে অন্য একটা নামে ফর্ম পূরণ ক'রে দিলো। দু'নম্বর বিভাগের 'আবেদন অনুমোদিত' স্লিপ লাগিয়ে বৃটিশ অফিসারটির স্বাক্ষর জাল করলো।

যথারীতি দু'নম্বর বিভাগে গিয়ে অনুমোদিত আবেদনপত্রগুলো নিয়ে এলো পাসপোর্ট ইসু করবার জন্যে। সেদিন ট্রেতে ছিলো উনিশটি আবেদনপত্র ও উনিশটি আবেদন অনুমোদিত স্লিপ তার সঙ্গে মর্ল্ডাসের আবেদনপত্র ও অনুমোদিত স্লিপ লাগিয়ে নিয়ে গেলো তিন নম্বরের অফিসার মেজর জনস্টোনের কাছে। জনস্টোন গুনে দেখলো যে বিশটা অনুমোদনপত্র আছে, ঘরের কোণায় গিয়ে সিন্দুক খুলে বিশটা খালি পাসপোর্ট বের ক'রে উনিজারকে দিলো। উইনজার সেগুলোকে পূরণ ক'রে সরকারী সিল লাগিয়ে অপেক্ষমান উনিশজন উল্লসিত ব্যক্তির হাতে সেগুলো দিয়ে দিলো। বাকি একটা পাসপোর্টটি রেখে দিলো নিজের পকেটে। ফাইলিং ক্যাবিনেটে বিশটি আবেদনপত্র চলে গেলো। বিশটা পাসপোর্ট ইসু মিলে গেলো।

সেদিন সন্ধ্যায় মল্ডার্সকে তার নতুন পাসপোর্ট দিয়ে হীরার নেকলেস পেয়ে গেলো উইনজার। নতুন রাস্তা খুলে গেলো তার সামনে, নব উদ্ভাবন।

১৯৪৯-এর মে মাসে পশ্চিম জার্মানির পত্তন হলো। পাসপোর্ট অফিসটি চলে এলো লোয়ার স্যাক্সনি রাজ্য সবকারের হাতে, যার রাজধানী হ্যানোভার। উইনজার তার চাকরিতে থেকে গেলো। আর কোন মক্কেল পায়নি সে, দরকারও হয়নি। প্রতি সপ্তাহে কোন ছবির দোকান থেকে সাদামাটা চেহারার কোন লোকের মুখের ছবি নিয়ে এসে অতি সযত্নে পাসপোর্টের একটি আবেদন ফর্ম পূরণ করতো উইনজার; সেই ছবিটাকে ফর্মের সঙ্গে গেঁথে দু'নম্বর বিভাগের প্রধান (যিনি একজন জার্মান) স্বাক্ষর জাল ক'রে অনুমোদন স্লিপ বানিয়ে তিন নম্বর বিভাগের কর্তার কাছে চলে যেতো আবেদনপত্র এবং অনুমোদনপত্রগুলো নিয়ে। সংখ্যাগুলো মিলে যেতেই অতোগুলো খালি পাসপোর্ট তার পকেটে চলে যেতো। দরকার এখন শুধু সরকারী সিলের। চুরি করলে সন্দেহ জাগবে, তাই এক রাতে সেটা বাড়িতে নিয়ে এলো।

www.boiRboi.blogspot.com

সকাল নাগাদ লোয়ার স্যাক্সনি রাজ্য সরকারের পাসপোর্ট অফিসের সিলের কাস্টিং তৈরি হয়ে গেলো।

ষাট সপ্তাহে ষাটটি ফাঁকা পাসপোর্ট হস্তগত ক'রে চাকরি ছেড়ে দিলো সে। সবাই প্রশংসা করলো, আহা, কী পরিশ্রমী, যত্নবান কেরানী। আরক্তমুখে ওপরওলাদের শেষ প্রশংসা নিয়ে চলে এলো উইনজার। হ্যানোভারও ছাড়লো। অ্যান্টোয়ার্পে গিয়ে হীরার নেক্‌লেস বেঁচে অসনাব্রুখে এসে ছোটখাটো ছাপাখানা খুলে বসলো। সেই সময় সোনা বা ডলার দিলে ন্যায্য মূল্যের অনেক কমেও জিনিস পাওয়া যেতো।

মল্ডার্স নিরব থাকলে ওডেসার সঙ্গে তাকে জাড়িয়ে পড়তে হোতো না। কিন্তু মাদ্রিদে পৌছে যেই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এসে পড়লো, অমনি তার বকবকানি শুরু হয়ে গেলা।

হ্যা, হ্যা...তার পরিচিত আছে একজন...যে কোন ভূয়া নামে পশ্চিম জার্মানির পাসপোর্ট বের ক'রে দিতে পারে...শুধু চাইলেই হলো!

১৯৫০-এর শেষদিকে উইনজারের সঙ্গে দেখা করতে এলো একজন 'বন্ধু'। উইনজার তখন মাত্র অসনাব্রুখে ছাপাখানা ব্যবসায় নেমেছে। রাজি হওয়া ছাড়া তার কোন গত্যন্তর ছিলো না। তারপর থেকে যখনই ওডেসার কেউ বিপদে পড়েছে, উইনজারকে তার জন্যে নতুন পাসপোর্ট বানিয়ে দিতে হয়েছে।

কৌশলটাও অত্যন্ত নিরাপদ। উইনজারের দরকার শুধু লোকটার একটা ফটো আর তার বয়স। প্রতিটি আবেদনপত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিগত বিবরণ লিখে দিয়েছিলো তার প্রত্যেকটার নকল আছে তার কাছে; মূল আবেদনপত্রগুলো তো এখন হ্যানোভারের অভিলেখে শোভাবর্ধন করছে। ফাঁকা একটা পাসপোর্ট নিয়ে ১৯৪৯-এ লেখা কোন একটি আবেদনপত্রে লিপিবদ্ধ বিবরণগুলো ভরে দেয়। নামটা হয় সাধারণত এমন একটা জায়গার যেটা এখন পূর্ব জামার্নির গভীর অভ্যন্তরে অতএব যাচাই করা অসম্ভব, জন্ম তারিখটা প্রায়ই এসএস প্রার্থীটির আসল বয়সের কাছাকাছি হয়। তারপর পাসপোর্টটায় লোয়ার স্যাক্সনির সিল মেরে দেয়া হয়। লোকটা তার নতুন পাসপোর্ট নিয়ে তার নতুন নামের স্বাক্ষর দিয়ে দেয় প্রাপকের জায়গায়।

নবায়ন করাও সহজ। পাঁচ বছর পরে ফেরারী এসএস লোকটি লোয়ার স্যাক্সনি বাদে অন্য যে কোন রাজ্যের রাজধানী শহরে গিয়ে নবায়ন করার আবেদন করবে, ধরা যাক বাভারিয়াতে। বাভারিয়ার কেরানীটি তখন হ্যানোভারকে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠাবে : "আপনারা কি ১৯৫০ সালে অমুক নম্বর পাসপোর্ট ইসু করেছিলেন, ওয়াল্টার শ্যুমানের নামে যার জন্মতারিখ অতো?" হ্যানোভারে তখন আরেকটি কেরানী ফাইলের নথী ঘেঁটে জবাব পাঠাবে, "হ্যা", বাভারিয়ার কেরানী

হ্যানোভারের কেরানীর জবাব পেয়ে আশ্বস্ত হবে যে মুল পাসপোর্টটা খাঁটি। অতএব নতুন একটা পাসপোর্ট বিনা দ্বিধায় ইসু ক'রে দেবে, বাভারিয়ার সিল মেরে।

যতোক্ষণ না হ্যানোভারের আবেদনপত্রে লাগানো ফটোটার সঙ্গে মিউনিখে জমা দেয়া পাসপোর্টটার ফটো মিলেয়ে না দেখা যাচ্ছে, ততোক্ষণ কোনই সমস্যা নেই। কিন্তু ফটো কখনোই মিলিয়ে দেখা হয় না। কেরানীরা আবেদনপত্র অনুমোদন এবং পাসপোর্টের নম্বরের ওপর নির্ভর করে, ফটোর চেহারার ওপর নয়।

উইনজারের পাসপোর্টগুলোর জরুরি নবায়নের দরকার হয়েছিলো ১৯৫৫সালের পর থেকে, অর্থাৎ হ্যানোভার থেকে ইসু করার পাঁচ বছর পরে। কিন্তু পাসপোর্ট হাতে এলেই অন্যসব কাজগুলো নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে যেতো; এসএস-এর লোকটা পেয়ে যেতো নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্স সামাজিক নিরাপত্তার কার্ড অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন এক পরিচয়।

১৯৬৪ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত তার হাতে থাকা ষাটটি মূল পাসপোর্টের মধ্যে বিয়াল্লিশটি ইসু করেছিলো উইনজার।

কিন্তু উইনজার ছিলো খুব ধুর্ত, একটা সাবধানতা সে অবলম্বন করেছিলো। জানতো যে ওডেসার পক্ষ থেকে হয়তো কোন না কোনদিন তার কাজ ফুরিয়ে যাবে, তখন তাকে ওরা খুন করতেও দ্বিধা করবে না। তাই সব তথ্য সে লিখে রেখেছিলো। মক্কেলদের আসল নামের প্রয়োজন নেই, সেটা অবান্তর। তাই প্রতিটি ফটো যা তার কাছে আসতো তার কপি ক'রে নিতো। মূল ফটোটা পাসপোর্টে সেঁটে পাঠিয়ে দিতো, কপিটাকে কার্টিজ পেপারে লাগিয়ে তার পাশে লোকটার নতুন নাম, ঠিকানা (জার্মান পাসপোর্টে ঠিকানার প্রয়োজনীয়তা হয়) এবং নতুন পাসপোর্ট নম্বর টাইপ ক'রে রাখতো সে।

কার্টিজ পেপারের শিটগুলো একটা ফাইলে লাগিয়ে রাখতো। ফাইলটাই তার জীবনবীমা। বড়িতে তো রেখে দিয়েই ছিলো আর নথিটার সম্পূর্ণ একটা প্রতিলিপি বানিয়ে জুরিখে তার উকিলের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলো। যদি কোনদিন ওডেসা তাকে প্রাণের ভয় দেখায় তো তাদের সে ফাইলের কথাটা জানিয়ে দেবে। সাবধানও ক'রে দেবে যে তার যদি কিছু ঘটে তো জুরিখের উকিল নথির কপিটা জার্মান কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেবে।

পশ্চিম জার্মান কর্তৃপক্ষ ফটো হাতে পেয়ে ফেরারী নাৎসিদের যে 'দুর্বৃত্ত তালিকা' আছে তাদের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখবে। শুধু পাসপোর্টের নম্বরটাই যদি ষোলটি প্রাদেশিক রাজধানীর সঙ্গে যাচাই ক'রে নেয়া যায় তো লোকটির ঠিকানা জেনে যাবে। তারপর এক সপ্তাহেরও বেশি লাগবে না তার খোঁজ পেতে। কাজেই ক্লস উইনজারের পক্ষে টিকে থাকবার উপায়টি বেশ জোরালোই বলতে হবে।

www.boiRboi.blogspot.com

এই হলো উইনজারের ইতিবৃত্ত। লোকটি আজ এখন এই শুক্রবারের সকাল সাড়ে আটটায় নাস্তা শেষে কফি খেতে খেতে *অসনাব্রুখ-জাইটুং* এর প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বোলাচ্ছে। ফোন বেজে উঠলো। ওপাশ থেকে ভেসে-আসা কণ্ঠস্বরটা প্রথমে ভীত, পরে আশ্বস্ত ব'লে মনে হলো।

"তোমার কোন সমস্যা হবে না, এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করবে না," ওয়েরউলফ তাকে ভরসা দিলো, "শুধু মুশকিল হয়েছে এই শালার রিপোর্টারকে নিয়ে। আমরা খবর পেয়েছি আমাদের একজন লোক আসছে, আজকে দিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে দশ মিনিটের মধ্যে তুমি ওখান থেকে স'রে পড়ো। আমি চাই তুমি..."

আধ ঘণ্টা পরে ত্রস্তব্যস্ত ক্লস উইনজার ছোট্ট একটা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সিন্দুকের দিকে একবার সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো। স্থির ক'রে ফেললো যে ফাইলটার দরকর নেই। বাড়ির পরিচারিকা বারবারাকে জানিয়ে দিলো যে সেদিন আর সকালে ছাপাখানায় যাবে না, বরং কিছু দিনের জন্য ছুটি নিয়ে অস্ট্রিয়া আল্পসে যাচ্ছে। মন আর শরীর ঠিক রাখার জন্য টাটকা হাওয়ার বিকল্প নেই। বারবারা দারুণ স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

দোরগোড়ায় হা ক'রে তাকিয়ে রইলো বারবারা। উইনজারের ক্যাডেট গাড়িটার পিছু হঠে চত্বর পেরিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে শো ক'রে এগিয়ে চলে গেলো। ন'টা দশে শহরের চার মাইল পশ্চিমে রাস্তার মোড়ে এসে পৌছালো যেখান থেকে রাস্তাটা উঁচুতে উঠে জাতীয় সড়কে পড়েছে। ক্যাডেট গাড়িটা যখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো তখন বিপরীত দিক থেকে একটা কালো জাগুয়ার তীব্র বেগে অসনাব্রুখের দিকে ছুটে আসছিলো।

পশ্চিম দিক থেকে শহরের ঢোকবার মুখটায় সার প্লাৎজে একটা তেলের ঘাঁটি পেয়ে গেলো মিলার। পাম্পের পাশে নিয়ে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে এলো সে। পেশীগুলো ব্যথা করছে, ঘাড় বাঁকাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আগের সন্ধ্যায় মদের স্বাদটা এখন পাখির বিষ্ঠার মতো বিস্বাদ হয়ে উঠছে।

পাম্পের ছেলেটাকে বললো, "গাড়িটা ভরে দাও তো বন্ধু। ফোন আছে, কয়েন বক্সের ফোন?"

"ঐ কোণাটায় আছে," ছেলেটা তাকে জানালো।

সেদিকে যেতে যেতে মিলার দেখতে পেলো একটা কফি অটোম্যাট। কয়েন ঢুকিয়ে কাগজের কাপে ধূমায়িত এক কাপ কফি নিয়ে ফোন-বুথে ঢুকে পড়লো সে। অসনাব্রুখে শহরের ফোনের তালিকা উলটেপালটে দেখলো। অনেকগুলো উইনজার আছে, কিন্তু একটিই মাত্র ক্লস। নামটা দু'বার ক'রে ছাপা আছে। প্রথমটার পাশে

লেখা আছে মুদ্রক এবং একটা টেলিফোন নম্বর; দ্বিতীয়টার বিপরীতে 'আবাস'। ন'টা বিশ বেজে গেছে, অতএব কাজের সময় এখন। ছাপাখানায় ফোন করলো সে।

যে লোকটা উত্তর দিলো সে সম্ভবত ফোরম্যান। বললো, "দুঃখিত, উনি এখনো আসেননি। সাধারণত ন'টাতেই আসেন। আসবেন নিশ্চয়ই এক্ষুণি। আধ ঘণ্টা পর আবার ফোন করুন।"

মিলার ধন্যবাদ জানিয়ে ফোনটা রেখে দিলো। বাড়িতে ফোন করবার কথা ভাবলো একবার, কিন্তু মনে হলো, থাক, দরকার নেই, বড়িতে যদি থাকে গিয়েই দেখা করবে। ঠিকানাটা টুকে নিয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে এলো।

পেট্রলের দাম দিতে দিতে পাম্পের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলো, "ওয়েস্টারবার্গ কোথায় বলতে পারো?"

ছেলেটা রাস্তার উত্তরদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, "ওই যে ওখানে। বড়লোকদের এলাকা, ঐ শালার সব ওখানে থাকে।"

শহরের একটা নক্শা কিনে মিলার তার কাঙ্ক্ষিত রাস্তাটার সন্ধান পেয়ে গেলো। দশ মিনিটেরও পথ নয়। বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় মালিক বেশ ধনী। গোটা অঞ্চলটাতেই উচ্চবিত্ত লোকেরা বাস করে, সুন্দর আয়েসী পরিবেশ। জাগুয়ারটাকে পথের প্রান্তে রেখে দিয়ে সামনের দরজার কাছে চলে এলো সে। দরজা খুলে দাঁড়ালো একজন পরিচারিকা। আঠারো-উনিশ বছর বয়স, অপূর্ব সুন্দর। এক ঝলক উজ্জ্বল হাসি দিলো তার দিকে তাকিয়ে।

মিলার বললো, "সুপ্রভাত, হের উইনজারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"ওহ্, তিনি তো চলে গেছেন স্যার, বিশ মিনিট হলো।"

আশান্বিত হলো মিলার। নিশ্চয়ই ছাপাখানার উদ্দেশ্যে গেছে, পথে হয়তো কোথাও আটকা পড়েছে।

"আহ্, কি দুর্ভাগ্য! ভেবেছিলাম তিনি কাজে যাবার আগে বাড়িতেই ধরবো তাঁকে।"

"আজ কাজে যাননি তিনি, স্যার। ছুটিতে চলে গেছেন," মেয়েটি জানালো।

মিলারের বুকে আতংকের ঢেউ। "ছুটিতে? বছরের এই সময়ে? তাছাড়া – " তাড়াতাড়ি বানিয়ে বললো, "আমার সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিলো আজ সকালে। এখানে আমাকে আসতে বলেছিলেন।"

"ইস্, কি লজ্জার কথা!" মেয়েটিরও যেনো কষ্ট হচ্ছে, "আর কি তাড়াতাড়িই না চলে গেলেন! লইব্রেরিতে ফোন পেলেন, তারপর ওপরে উঠে এলেন। আমাকে বললেন, 'বারবারা – ওটাই হলো আমার নাম, বুঝলেন? বারবারা আমি অস্ট্রিয়ায় ছুটিতে যাচ্ছি; মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে।' দেখুন তো, আগে কক্ষণো শুনিনি যে

www.boiRboi.blogspot.com

তিনি ছুটিতে যাবার মতলব করছেন। আমাকে বললেন যে কারখানায় ফোন ক'রে যেনো জানিয়ে দেই তিনি এক সপ্তাহ যাবেন না।ব্যস্, তারপর তিনি রওনা দিলেন। মোটেই হের উইনজারের মতো আচরণ নয়, এমন শান্ত ভদ্রলোক তিনি!"

মিলারের অন্তরের মধ্যে আশার আলো নিভে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলো, "কোথায় যাচ্ছেন ব'লে গেছেন?"

"উঁহু, কিছু না। শুধু বললেন যে অস্ট্রিয়ান আল্পসে যাচ্ছেন।"

"কোন ঠিকানা রেখে যাননি? যোগাযোগ করবার কোন উপায় নেই?"

"না, সেটাই খুব অদ্ভুত। কারখানার লোকজন খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো...কতো অর্ডার আছে সেগুলো শেষ করতে হবে না।"

মিলার চটপট মনে মনে হিসাব ক'রে নিলো। আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছে উইনজার। ৮০ মাইল বেগে চললে ইতিমধ্যে চল্লিশ মাইল পেরিয়ে গেছে। মিলার যদি একশো মাইল বেগে গাড়ি চালায় তো ঘণ্টায় বিশ মাইল ক'রে এগিয়ে যাবে, অর্থাৎ দু ঘণ্টা সময় লাগবে উইনজারের গাড়িটা ধরতে। অনেক সময়। দু ঘণ্টায় যেকোন জায়গায় চলে যেতে পারে সে। তাছাড়া দক্ষিণ মুখে যে অস্ট্রিয়ার দিকেই চলেছে তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, "ফ্রাউ উইনজারের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো বারবারা। কটাক্ষ ক'রে বললো, "কোন ফ্রাউ উইনজারই নেই। কেন, আপনি কি হের উইনজারকে চেনেন না?"

"না, কখনো দেখিনি।"

"বিয়ে করার মতো লোকই নন তিনি। এমনিতে খুব ভালো লোক, কিন্তু মেয়েমানুষের ব্যাপারে কোন আগ্রহই নেই। বুঝলেন তো?"

"তাহলে উনি এখানে একাই থাকেন?"

"প্রায় তাই, অবশ্য আমিও এখানে থাকি। একেবারে নিরাপদ, সেদিক থেকে।" খিলখিল ক'রে আবার হেসে যেনো লুটিয়ে পড়ে মেয়েটি।

"ও! আচ্ছা, ধন্যবাদ," এই ব'লে মিলার যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

"স্বাগত আপনাকে।"

মেয়েটি দেখলো মিলার পথের প্রান্তে গিয়ে তার জাগুয়ারে গিয়ে বসলো। গাড়িটা তার আগেই খুব মনে ধরেছিলো। এদিকে হের উইনজার তো নেই, কোন সুপুরুষ যুবককে কি রাতে বাড়িতে আনা যায় না? সশব্দে স্টার্ট তুলে জাগুয়ারটা পথ পেরিয়ে গেলো। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বারবারা দরজা বন্ধ ক'রে দিলো।

মিলার বুঝতে পারলো বেয়ার তার বাঁধন কোনমতে খুলে ফেলে স্টুটগার্টের হোটেল থেকে উইনজারকে টেলিফোন ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছে। লক্ষ্যবস্তুর

এতো কাছে এসে এতো দূরে চলে গেলো! আর ভাবতে পারে না; ঘুমানোর দরকার তার, ভীষণ।

পুরনো শহরের মধ্যযুগের প্রাচীর পেরিয়ে নক্শা দেখে থিওডোর হেউস গ্লৎজে এসে পৌছালো। জাগুয়ারটাকে স্টেশনের সামনে রেখে স্কয়ারের অপরদিকে হোহেনজোলার্ন হোটেলে এসে উঠলো।

ভাগ্য খুব ভালো, একটা ঘর খালি ছিলো। ওপরতলায় গিয়ে জামাকাপড় খুলে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। মনের কোণে কি যেনো একটা খচখচ ক'রে বিঁধছিলো...সামান্য একটু সংশয়...কি যেনো একটা অনুসন্ধান করবার ছিলো অথচ করেনি। কিছুতেই মনে ক'রে উঠতে পারলো না; চোখ জুড়ে শুধু ঘুম নেমে এলো। সাড়ে দশটার মধ্যেই ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো।

অসনাব্রুখ শহরের কেন্দ্রে এসে ম্যাকেনসেন পৌছালো; জাগুয়ারের কোন চিহ্ন নেই সেখানে ওয়েরউলফকে ফোন ক'রে জেনে নিতে চাইলো আর কোন খবর আছে কিনা।

সৌভাগ্যবশত অসনাব্রুখের ডাকঘর থিওডোর হেউস গ্লাৎজের একটা পাশ ঘেঁষেই। বড় রেলস্টেশনটা আরেকটা পাশে দাঁড়িয়ে আছে; তৃতীয় দিকটায় হোহেনজোলার্ন হোটেল। ডাকঘরের পাশ ঘেঁষে তার গাড়ি রাখতে রাখতে ম্যাকেনসেনের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। ওই তো জাগুয়ারটা রাখা আছে শহরের বড় হোটেলের সামনেই।

ওয়েরউলফের মেজাজও একটু ভালো। "সব ঠিক আছে; জালিয়াতকে খবর দিয়ে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। এইমাত্র তার বাড়িতে ফোন করলাম। পরিচারিকাই বোধহয় ধরেছিলো। বললো যে তার মালিক চলে যাওয়ার প্রায় মিনিট বিশ পরে তাঁর খোঁজে এসেছিলো।"

"আমারও কিছু খবর আছে," ম্যাকেনসেন জানালো, "জাগুয়ারটা ঠিক আমার চোখের সামনে স্কয়ারের ওইদিকে দাঁড় করানো আছে। খুব সম্ভব হোটেলে আছে সে। আমি ওকে হোটেলের কামরাতেই শেষ ক'রে দিতে পারি, সাইলেন্সার লাগিয়ে নেবো।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও, অতো তাড়াহুড়ো কোরো না," ওয়েরউলফ সাবধান ক'রে দিলো, "আমি ভেবে দেখলাম যে অসনাব্রুখ শহরের মধ্যে ওকে খুন চলবে না। পরিচারিকা ওকে দেখে ফেলেছে, গাড়িটাকেও। ঝট ক'রে পুলিশের কাছে গিয়ে জানিয়ে দেবে। তাহলেই সবার নজর গিয়ে পড়বে জালিয়াতের ওপর। তার ওপর লোকটা অল্পতেই ঘাবড়ে যায়। না, তাকে জড়ানো যাবে না। পরিচারিকার সাক্ষ্যে তার ওপর ভীষণ সন্দেহ জাগবে। প্রথমত একটা টেলিফোন পেয়ে হুট ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেলো লোকটা, তারপর একজন যুবক এলো তার সঙ্গে দেখা করতে আর সেই

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

যুবকটাই হোটেল-ঘরে বন্দুকের গুলিতে খুন হলো। না, এটা হবে না...মহা ঝামেলা হয়ে যাবে।"

ম্যাকেসেনের ভুরু কুঁচকে ভাবলো।"হু, ঠিক বলেছেন আপনি। তাহলে হোটেল ছাড়ার পর করবো।"

"হয়তো কয়েক ঘণ্টা ওখানেই থাকবে, জালিয়াতের খবর নেবার চেষ্টা করবে। পাবে না কিছুই। হ্যা, আরেকটা কথা, মিলারের কাছে কি কোন বৃফকেস আছে?"

"হ্যা," ম্যাকেনসেন জানালো, "কাল রাতে ক্যাবারে ছাড়ার সময় তার হাতে ছিলো, আমি দেখেছি; সঙ্গে ক'রে হোটেলে নিয়ে গেলো।"

"তবেই বোঝো...গাড়িতে রাখলো না কেন, হোটেলের কামরায়ই বা রেখে এলো না কেন? কারণ ওটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে – বুঝলে?"

"বুঝেছি।"

"ব্যাপারটা হলো কি জানো," ওয়েরউলফ বললো, "আমাকে তো সে দেখেছে, নাম-ঠিকানাও জানে। বেয়ার আর জালিয়াতের মধ্যে সংযোগের সূত্রটাও যে কি তা জানে। সাংবাদিকরা আবার এইসব তথ্য লিখে রাখে। অতএব, বৃফকেসটা ভীষণ প্রয়োজনীয়। মিলার মরলেও ওটা যেনো পুলিশের হাতে না পড়ে।"

"বুঝেছি, বাক্সটাও চান আপনি?"

"হয় সেটা হাতাও, নয়তো উড়িয়ে দাও।"

ম্যাকেনসেন একমুহূর্ত ভাবলো। "দুটো কাজ একসঙ্গে করতে হলে আমাকে গাড়িতে বোমা বসানোই উচিত। সাসপেনশনের সঙ্গে লাগিয়ে রাখবো, তাহলেই জাতীয় সড়ক ধরে যখন প্রচণ্ডবেগে ছুটে যাবে, রাস্তায় সামান্য ঝাকি খেলেই বোমাটা ফাঁটবে।"

"বাহ্," ওয়েরউলফ জিজ্ঞেস করলো, "বাক্সটা গুঁড়িয়ে যাবে তো?"

"যে ধরনের বোমার কথা আমি ভাবছি তাতে বাক্স তো দূরে থাক, মিলার আর তার গাড়ি সব আগুন লেগে কয়েক মিনিটের মধ্যে ছাই হয়ে যাবে। অথচ অতো স্পিডে চলেছিলো, মনে হবে যেনো কোন দুর্ঘটনা। সাক্ষীরা বলবে, পেট্রল ট্যাংক ফেঁটে গিয়েছিলো – কি পোড়া কপাল!"

"করতে পারবে তুমি?" ওয়েরউলফ জানতে চাইলো।

ম্যাকেনসেন হাসলো। তার গাড়ির বুটে যা আছে তা হলো হত্যাকারীর স্বপ্ন। অপূর্ব যন্ত্র বানিয়ে নিতে পারবে সে। এক পাউন্ড প্লাস্টিক বিস্ফোরক আর দুটো ডেটোনেটর রয়েছে তার কাছে।

"নিশ্চয়ই," বেশ খুশি হয়ে বললো সে, "কোন সমস্যা নেই। তবে গাড়িতে

www.boiRboi.blogspot.com

লাগানোর জন্যে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

হঠাৎ কথা বলা থামিয়ে ডাকঘরের জানলায় গলা বের ক'রে দেখে নিয়ে ফোনে গর্জে বললো, "পরে আবার ফোন করছি।"

পাঁচ মিনিট পরে আবার যোগাযোগ করলো। "দুঃখিত, তখন মিলার হাতে অ্যাটাচিকেসটা নিয়ে যাচ্ছিলো কিনা তাই ফোনটা ছেড়ে দিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। গাড়িতে উঠে সোজা চলে গেলো। হোটেলে খোঁজ নিয়ে জানলাম রুম বুক করা আছে তার। মালপত্র রেখে গেছে, কাজেই ফিরে আসবে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আজ রাতে বোমা বসিয়ে দিতে পারবো।"

বেলা একটার একটু আগে মিলারের ঘুম ভাঙলো। বেশ ঝরঝরে লাগছে। ঘুরে মধ্যেই কথাটা মনে পড়েছিলো। গাড়ি নিয়ে সোজা উইনজারের বাড়িতে চলে গেলো। ওকে দেখে পরিচারিকার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

গদগদ হয়ে বললো, "হ্যালো, আবার এসেছেন?"

"এই পথ দিয়েই বাড়ি ফিরছিলাম," মিলার বললো, "তা ভাবলাম...আচ্ছা, কতোদিন ধরে তুমি এখানে কাজ করছো?"

"উমমম...প্রায় মাস দশেক হবে...কেন?"

"মানে, হের উইনজার তো বিয়ে করবার লোক নন, তুমিও এতো অল্পবয়সী, আগে এ বাড়ির দেখাশোনা কে করতো?"

"ও, বুঝেছি কি জানতে চান। উনার আগের পরিচারিকা, ফ্রাউলিন ওয়েন্ডেল।"

"সে কোথায় আছে এখন?"

"হাসপাতালে, স্যার। মরতে বসেছে, বাঁচবে না বোধহয়। বুকের ক্যান্সার ভয়ংকর রোগ, জানেন তো! সেইজন্যেই তো আরো আদ্ভুত লাগলো...হের উইনজার অমন ক'রে ছুটে চলে গেলেন। প্রত্যেকদিন ওকে তিনি দেখতে যান। তার প্রতি খুব মমতা রয়েছে হের উনিজারের। ওরা কিন্তু কিছু করেনি জানলেন, তবে এতোদিন থেকে একসঙ্গে ছিলেন, সেই ১৯৫০ থেকে, উনার সম্পর্কে দারুণ ভালো ধারণা তাঁর। সব সময় আমাকে খালি বলেন, ফ্রাউলিন ওয়েন্ডেল এই কাজটা এইভাবে করতো, ওইভাবে করতো ইত্যাদি ইত্যাদি..."

"কোন্ হাসপাতালে আছে?" মিলার জানতে চাইলো।

"আরে, নামটা ভুলে যাচ্ছি যে। দাঁড়ান এক মিনিট, টেলিফোনের খাতায় লেখা আছে, দেখে আসছি।"

দু'মিনিটের মধ্যে চলে এলো। শহরতলীর বেশ উঁচুদরের প্রাইভেট স্বাস্থ্যনিবাসের নাম-ঠিকানা জানিয়ে দিলো সে।

www.boiRboi.blogspot.com

ম্যাপ দেখে মিলার তিনটার একটু পরে ক্লিনিকে গিয়ে হাজির হলো।

পুরো বিকেলটা ম্যাকেনসেন তার বোমার মালমসলা কিনলো। তার শিক্ষক এক সময় তাকে শিখিয়েছিলো যে অন্তর্ঘাতী কাজকর্মে সফলতা লাভ করতে হলে মালমসলাগুলোকে খুব সহজ ধরনের রাখতে হয়, এমন ধরনের সব জিনিস যা সাধারণ দোকানে পাওয়া যায়।

হার্ডওয়ারের দোকান থেকে কিনলো একটা সল্ডারিং আয়রন আর একটি এককাঠি সল্ডার; কালো ইনসুলেটিং টেপের একটা রোল; এক গজ পাতলা তার ও একটা কাটার; একটা ফুট হ্যাক্‌শ ব্লেড ও ইনস্ট্যান্ট গ্লু'র একটা টিউব। ইলেকট্রিকের দোকান থেকে নিলো নয় বোল্টের একটা ট্রানজিস্টার ব্যাটারি; এক ইঞ্চি ব্যাসের একটা ছোট বাল্ব; তিন গজ লম্বা দুটো সূক্ষ্ম একপরতের পাঁচ অ্যাম্পের তার প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া, যেটার একটার রঙ নীল আরেকটার লাল, যাতে পজিটিভ ও নেগেটিভ টার্মিনাল দুটো আলাদা ক'রে বোঝা যায়। মুদি দোকান থেকে পাঁচটা বড় সাইজের স্কুলের ছেলেদের রাবার কিনলো, প্রায় দু ইঞ্চি চওড়া, সিকি ইঞ্চি মোটা। কেমিস্টের দোকান থেকে এক টিন সুন্দর চা কিনলো। ২৫০ গ্রামের টিনে মুখ লাগানো শক্ত ঢাকনা। বারুদগুলো যাতে ভিজে নষ্ট না হয়ে যায় সেই সম্ভাবনা রোধ করার জন্যেই মুখ লাগানো চায়ের টিনটা কিনলো, চা'টা শুধু উপলক্ষ্য।

কেনাকাটা হয়ে গেলে হোহেনজোলার্ন হোটেলে গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলো। তার ঘর থেকে স্কয়ারটা স্পষ্ট দেখা যায়। কাজ করতে করতেও চোখ রাখতে পারবে মিলার ফিরলো কিনা গাড়ি নিয়ে।

হোটেলে ঢুকবার আগে ম্যাকেনসেন তার গাড়ির বুট খুলে আধ পাউন্ড প্লাস্টিক বিস্ফোরক আর একটা ডিটোনেটর নিয়ে এলো।

জানালার সামনে ব'সে স্কয়ারের দিকে চোখ রেখে ম্যাকেসেন কাজে লেগে গেলো। অবসাদ দূর করার জন্যে এক মগ কড়া ব্ল্যাক কফি রেখে দিলো।

অতি সহজ একটা বোমা তৈরি ক'রে ফেললো। পায়খানার ফুটো ফুটো দিয়ে সমস্ত চা ঢেলে ফেলে টিনটাকে রেখে দিলো। কাটার দিয়ে ঢাকনিতে একটা ফুটো করলো। নয় ফুট লম্বা লাল তারটার দশ ইঞ্চি পরিমাণ ছেঁটে ফেলে ছোট তারটার একটা প্রান্ত ব্যাটারির সঙ্গে লাগিয়ে দিলো। দুটো যাতে স্পর্শ না ক'রে সেজন্যে ব্যাটারির দুটো দিক দিয়ে তার দুটোর মাঝে ইনসুলেটিং টেপ লাগিয়ে দিলো।

লাল তারটার অপর প্রান্ত ডেটোনেটরের কনট্যাক্ট-পয়েন্টের সাথে জুড়ে দিলো। সেই একই কনট্যাক্ট-পয়েন্টে আট ফুট লম্বা লাল তারের একটা প্রান্ত লাগিয়ে দিলো।

তারসুদ্ধ ব্যাটারিটা রাখলো চারকোনা টিনের তলার দিকে। ডিটোনেটরটাকে

www.boiRboi.blogspot.com

প্লাস্টিক বিস্ফোরকে ভালো ক'রে গুঁজে নরম বিস্ফোরক পদার্থটাকে ব্যাটারির ওপর চেপে রাখলো। টিনটা এবার প্রায় ভরেই গেলো।

সার্কিট প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। ব্যাটারি থেকে একটা তার গেছে ডিটোনেটরে। অন্য তারটা ডিটোনেটর থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি, সেটারও খোলা প্রান্ত শূন্যে ঝুলে আছে। ব্যাটারি থেকে আরেকটা তারও কোথাও যায়নি, সেটারও খোলা প্রান্ত শূন্যে ঝুলছে কিন্তু যখন এই খোলা প্রান্ত দুটো স্পর্শ করবে – আট ফুট লম্বা লাল তারের এবং নীল তারটার – তখন সার্কিট পুর্ণ হয়ে যাবে। ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎশক্তি এসে ডিটোনেটরে চার্জ করলে ফট্ ক'রে সেটা ফাঁটবে। কিন্তু সেই শব্দ ডুবে যাবে প্লাস্টিক বিস্ফোরকের বিশাল বিস্ফোরণের শব্দে, হোটেলের দু-তিনটা ঘর চুর্ণ ক'রে দিতে পারে এমন তার ক্ষমতা।

বাকি রইলো ট্রিগারের কৌশলটা। সেটা বানানোর জন্যে রুমালে হাত জাড়িয়ে নিয়ে হ্যাক্‌শ ব্লেড বাঁকিয়ে চাপ দিলো। মাঝখান থেকে ভেঙে গেলো সেটা, প্রত্যেকটি টুকরো প্রায় ছয় ইঞ্চি হয়ে কেটে গেলো, এবং দুটোরই প্রান্তে ছোট্ট ছিদ্র যেগুলো ব্লেডটাকে ফ্রেমের সঙ্গে সেঁটে রাখতো।

রাবার পাঁচটাকে একের ওপর এক রেখে মোটা রবারের ব্লক বানালো একটা। ব্লেডের অংশ দুটোকে আলাদা ক'রে রাখবার জন্য সে দুটোকে সমান্তরাল ক'রে পেতে কোণার দিকে রাবারের ব্লকটাকে বেঁধে দিলো। ব্লেডের প্রায় ইঞ্চি চারেকের ভেতরে শুধু এখন হাওয়ার ব্যবধান। হাওয়ার চেয়েও গুরুভার কিছু প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্যে দুটোর মাঝখানে বাল্বটাকে লাগিয়ে দিলো যথেষ্ট পরিমাণ ইনস্ট্যান্ট-গ্লুয়ের সাহায্যে। কাঁচ তো বিদ্যুৎ পরিবহণ করে না।

এখন সে প্রায় তৈরি। তার দুটোর খোলা প্রান্ত – একটা লাল আরেকটা নীল – টিনের ঢাকনির ভেতর দিয়ে গলিয়ে বের ক'রে শক্ত ক'রে ঢাকনিটা আটঁকে দিলো। একটা তার ওপরের হ্যাকশ ব্লেডের প্রান্তে সল্ডার ক'রে দিলো, আরেকটা নিচের ব্লেডটার সঙ্গে। বোমাটা এখন জীবন্ত হয়ে গেলো।

ট্রিগারটার ওপরে হঠাৎ যদি চাপ লাগে কাঁচের বাল্ব ফেঁটে যাবে আর ইস্পাতের ফলা দুটো পরস্পরকে স্পর্শ করবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুতের বর্তনী সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আরো একটু সাবধানতা নিলো সে। অন্য কোন ধাতুস্পর্শেও বিদ্যুৎপথ জীবন্ত হয়ে পড়তে পারে। তাই ট্রিগারটার ওপরে ছয়টা কনডম একের ওপর এক সেঁটে দিলো। বাইরের ধাতুস্পর্শ থেকে প্রতিবন্ধক রইলো ছয় পরতের পাতলা কিন্তু অপরিবাহী রাবারের। দুর্ঘটনা অন্তত রুখা যাবে এতে।

বোমা বানানো হয়ে গেলে পুরো জিনিসটাকে ওয়ার্ডরোবের নিচে রেখে দিলো; বাঁধবার জন্যে কিছু তার, ক্লিপার, কিছু টেপও রাখলো, এগুলো লাগবে মিলারের গাড়িতে যন্ত্রটাকে লাগাতে। আরো কালো কফির অর্ডার দিলো যাতে জেগে থাকতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারে। তারপর জানালার সামনে চেয়ার টেনে সটান ব'সে রইলো মিলারের আগমন প্রতীক্ষায়।

মিলার কোথায় গেছে তার জানা নেই, দরকারও নেই জানার। ওয়েরউলফ তো বলেইছে জালিয়াতের কোন খোঁজই পাবে না মিলার, অতএব সে নিশ্চিন্ত। ম্যাকেনসেন হলো কামলা, ভালো ক'রে নিজের কাজটুকু করাই তার কর্তব্য, তারপর দায় যাদের তাদের ওপর ছেড়ে দাও সব। ধৈর্য ধরতে জানে সে। জানে মিলার শেষ পর্যন্ত ফিরে আসবেই।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১৫

ডাক্তার বিরক্তমুখে তাকালো ওর দিকে। মিলারের পরনে শার্ট, টাই কিছু নেই। সাদা গোলগলা নাইলনের সোয়েটারের ওপর কালো পুলওভার পরে তার ওপর একটা কালো ব্লেজার চাপিয়ে চলে এসেছে। ডাক্তারের দৃষ্টি দেখে মনে হলো সে ভাবছেন যে রুগী দেখতে এসেছে হাসপাতালের তার এমন পোশাক কেন, ভদ্রলোকের মতো শার্ট-টাই পরলে কি হোতো!

অবাক বিস্ময়ে সে জানতে চাইলো, "তাঁর বোনের ছেলে আপনি? অদ্ভুত তো! কোনদিনও শুনিনি যে ফ্রাউলিন ওয়েন্ডেলের ভাগ্নে রয়েছে।"

"যতোদূর জানি আমিই তাঁর একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছে," মিলার বললো, "খালার যে এরকম অবস্থা আগে জানলে নিশ্চয়ই আরো তাড়াতাড়ি আসতাম। কিন্তু হের উইনজার কেবল আজ সকালেই আমাকে টেলিফোন ক'রে এবস জানালেন, খালাকে দেখে যেতে বললেন।"

"হের উইনজার সাধারণত এইরকম সময়ে নিজেই আসেন এখানে," ডাক্তার জানিয়ে দিলো।

"শুনলাম বাইরের কোথাও নাকি তাঁর ডাক পড়েছে," নির্ভেজাল মিথ্যেগুলো ব'লে চললো মিলার, "সকালে তাই বললেন। ক'দিন এখানে থাকবেন না তিনি, তাই আমাকে তাঁর বদলে রুগীর সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে বলেছেন।"

"চলে গেছেন? অ্যা! কী আশ্চর্য!" এক মিনিট ইতস্তত করলো ডাক্তার, তারপর যেনো মনস্থির ক'রে ফেলেছে সেইরকম সুরে বললো, "দাঁড়ান একটু।"

হাসপাতালে ঢুকেই বড় হলঘরটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা হচ্ছিলো এতোক্ষণ। মিলার দেখলো ডাক্তার একপাশে একটা ছোট্ট অফিস-ঘরে গিয়ে ঢুকলো। খোলা দরজা দিয়ে ফোনের কথাবার্তা টুকরো টুকরো ভেসে এলো তার কানে।

www.boiRboi.blogspot.com

"সত্যি চলে গেছেন? আজ সকালে? কয়েক দিনের জন্যে...না না, ধন্যবাদ ফ্রাউলিন... শুধু জানতে চাইছিলাম আজ বিকেলে তিনি আসছেন কিনা।"

ফোন রেখে দিয়ে সে হলঘরে ফিরে এলো।

"আশ্চর্য!" অস্ফুটস্বরে বললো, "সেই যখন থেকে ফ্রাউলিন ওয়েন্ডেল এখানে এসেছেন, প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটা ধরে হের উইনজার এখানে আসেন, কোন ব্যতিক্রম হয়নি কোনদিন। রোগীর ওপর খুব মমতা তাঁর। অথচ এখন, যাক্‌গে, আশা করি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন, নইলে আর হয়তো দেখতেও পাবেন না। অবস্থা এখন খারাপের দিকে, বুঝলেন।"

মিলারের মুখটা বিষাদ হয়ে উঠলো। "হ্যা, ফোনে তো তাই বললেন তিনি। আহা! বেচারী খালা আমার!"

"উনার আত্মীয় হিসাবে অবশ্য আপনি কিছু সময় কাটাতে পারেন তাঁর সঙ্গে, কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়। আপনাকে জানিয়ে দেয়া উচিত যে তাঁর কথাবার্তা প্রায় প্রলাপের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে, কাজেই যতোটা কম সময় পারেন থাকবেন। আসুন এদিকে।"

মিলার ভেতরে ঢুকতেই ডাক্তার বাইরে থেকে আস্তে ক'রে দরজাটা ভিজিয়ে দিলো, কানে এলো ডাক্তারের পায়ের শব্দ।

ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকার। পর্দার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে শীতের অপরাহ্নের একটু মৃদু আলো এসে পড়েছে। অন্ধকারে চোখ সয়ে যাবার পর মিলার দেখতে পেলো যে বিছানার ওপর একটি কঙ্কালসার নারীমূর্তি। কয়েকটা বালিশ দিয়ে তার মাথাটা উঁচু ক'রে রাখা হয়েছে। কিন্তু পরনের পোশাক আর মুখ দুটো এমন ফ্যাঁকাশে রঙের যে একটার থেকে আরেকটাকে পৃথক ক'রে চিনে নেয়া মুশকিল। বিছানায় যেনো মিশে গেছে একেবারে। চোখ দুটো বন্ধ। মিলারের মন থেকে সব আশা ভরসা মুহূর্তে উবে গেলো। এর কাছ থেকে পলাতক জালিয়াতের কোন খবর পাওয়ার চিন্তা করাও বাতুলতা। ফিস্‌ফিস্ ক'রে সে ডাকলো, "ফ্রাউলিন ওয়েন্ডেল!"

রোগিণীর চোখের পাতা দুটো কেঁপে কেঁপে খুলে গেলো। তাকিয়ে রইলো মিলারের দিকে কিন্তু দৃষ্টিতে কোনরকম ভাবান্তর নেই। সন্দেহ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে কিনা তাকে। চোখ দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। বিড়বিড় ক'রে অস্ফুটস্বরে কী সব বলতে লাগলো, প্রায় অর্থহীন প্রলাপ। রক্তহীন ঠোঁট দুটোর কাছে নিয়ে কান পাতলো মিলার, যাতে অসংলগ্ন কথাগুলো ধরতে পারে।

কিন্তু কিছু কিছু বোঝা গেলেও মিলারের কাছে তার কোনই মূল্য নেই। রোজেনহাইম সম্বন্ধে কিছু কথা... সে জানে সেটা বাভারিয়ার একটা ছোট্ট গ্রাম, হয়তো সেখানেই জন্মেছে। আবার কয়েকটি কথা..."পরনে সাদা পোশাক, কী

www.boiRboi.blogspot.com

সুন্দর, কী অপূর্ব সুন্দর!" তারপর আবার কিছু অসংলগ্ন কথাবার্তা।

মিলার আরো সামনে ঝুঁকে আসলো। "ফ্রাউলিন ওয়েন্ডেল, আমার কথা শুনতে পেচ্ছেন?"

মৃতপ্রায় নারী বিড়বিড় ক'রে কথা বলেই চলেছে। মিলার শুনতে পেলো..."সবার হাতে প্রার্থনার পুঁথি, সব ধবধবে সাদা, কী সরল নিষ্পাপ তখন!"

চিন্তায় ভুরু কুঁচ্‌কে উঠলো মিলারের। ভাবতে ভাবতে যেনো দিশা ফিরে পেলো। প্রলাপের মধ্যে রমণীটি তার প্রথম কমিউনিয়নের কথা ব'লে যাচ্ছে। মিলারও তার মতো রোমান ক্যাথলিক, তাই বুঝতে পারলো।

"আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ফ্রাউলিন ওয়েন্ডেল?" আবার বললো মিলার। ভরসা নেই। রোগিণীর চোখ দুটো আবার খুলে গেলো। দৃষ্টি এসে থমকে দাঁড়ালো তার গলার সাদা গোল ব্যান্ডের ওপর, বুকের কালো পোশাকে এবং কালো জ্যাকেটে। অবাক হয়ে দেখলো যে চোখ দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেলো। সমতল বক্ষদেশ হঠাৎ দম্‌কে দম্‌কে ফুলে ফুলে কাঁপতে লাগলো। ভয়ানক চিন্তা হলো মিলারের। ডাক্তারকে ডেকে আনাই বোধ হয় উচিত। তারপর দেখলো বন্ধ দুটো চোখের কোণ থেকে দু'বিন্দু অশ্রু তার শুকনো গালে গড়িয়ে পড়লো। কাঁদছে মুমূর্ষু নারী।

চাদরের ওপর দিয়ে আস্তে এগিয়ে এসে ওর একটা হাত মিলারের কব্জি মুঠি ক'রে জড়িয়ে ধরলো। অদ্ভুত শক্তি সেই মুঠিতে। মিলার ঝট্‌কা মেরে হাতটা সরিয়ে দিতে চাইলো, কিন্তু তার আগেই কানে এলো অস্ফুট আর্তনাদ, "আশীর্বাদ করুন ফাদার, আমি পাপ করেছি।"

কয়েক সেকেন্ড মিলার ঠিক বুঝতে পারলো না, এদিক ওদিক তাকালো। কিন্তু নিজের পোশাকের দিকে নজর পড়তেই বুঝতে পারলো এই সামান্য আলোতে মহিলা তাকে যাজক ব'লে ভুল করছে। মিনিট দুয়েক মিলার তার বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করলো, সব ফেলে দিয়ে আবার হাম্বুর্গেই ফিরে যাবে নাকি পাপের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবে জালিয়াতের মাধ্যমে এডুয়ার্ড রশম্যানের খবর পাওয়া যায় কিনা।

মিলার আরেকবার ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে: "বাছা, স্বীকারোক্তি করো, শুনবার জন্যে আমি প্রস্তুত।"

কথা বলতে শুরু করলো মহিলা। একঘেয়ে ক্লান্ত সুরে জীবনের কাহিনী ব'লে গেলো। জন্মেছিলো ১৯১০ সালে; বাভারিয়ার বনে-প্রান্তরে বেড়ে উঠেছিলো। মনে পড়ে প্রথম যুদ্ধে বাবা চলে গিয়েছিলেন। তিন বছর পরে ১৯১৮ তে আর্মিস্টিস হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু মনে তখন তাঁর চরম ক্ষোভ আর দুঃখ বার্লিনের নেতাদের বিরুদ্ধে, যারা দেশটার সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

বিশ দশকের গোড়ার দিকে দেশে যে রাজনৈতিক আলোড়ন হয়েছিলো সে কথাও মনে আছে এই মহিলার। কাছাকাছি মিউনিখ শহরে 'পুট্শ' করবার চেষ্টা হয়েছিলো, সরকার উলটে দেবার চেষ্টা করেছিলো এমন একজন লোক যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্ষোভ ক'রে বেড়াতো, নাম অ্যাডলফ হিটলার। বাবাও সেই লোকটার পার্টিতে যোগ দেন। তেইশ বছর যখন বয়স হলো, দেখলো বিক্ষোভকারীটি দেশে সরকার বনে গেছে। জার্মান কুমারী-সঙ্ঘের সদস্য হয়ে গ্রীষ্মকালে কতো জায়গায় আনন্দভ্রমণ ক'রে কাটিয়েছে...বাভারিয়ার গউলেইটারের কাছে সেক্রেটারির কাজ করেছে...কতো সুন্দর সুন্দর স্বর্ণকেশ যুবকের সঙ্গে নেচেছে, তাদের কালো কালো ইউনিফর্মগুলো উচ্ছল হিল্লোল তুলেছে প্রাণে।

তবে রূপ ছিলো না একদম; লম্বা ঢ্যাঙা হাড্ডিসার চেহারা, মুখটা ঘোড়ার মতো। ঠোটের ওপর লোম। পাতলা চুলগুলোকে পেছনের দিকে টেনে বেঁধে রাখতো। নিজের যে কি ছিরি তা ভালোমতই জানতো, তাই বিশ বছরে পা দিয়েই বুঝে ফেলেছিলো যে তার আর কোনদিন বিয়ে হবে না। চোখের সামনে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলো, সে শুধু দাওয়াতই পেতো। ধীরে ধীরে বিক্ষোভ আর ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে উঠলো, জগতের ওপর তার যতো রাগ। ১৯৩৯ সালে র‍্যাভেন্সব্রুখ নামে একটা শিবিরে ওয়াড্রেস হয়ে এলো।

সেখানে কতো লোককে যে সে ডাণ্ডা মেরেছে, পিটিয়েছে তার হিসেব নেই। ব্রান্ডেনবুর্গের ক্যাম্পে অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলতে বলতে দু'গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে গেলো। জোর ক'রে চেপে ধ'রে রইলো মিলারের কব্জি যাতে বিরক্ত হয়ে পালিয়ে না যায় সে।

আস্তে ক'রে জিজ্ঞেস করলো মিলার, "তারপর...যুদ্ধের পর?"

কয়েক বছর ধ'রে অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হলো, এদিক-এদিক পালিয়ে পালিয়ে। এসএস'রা ত্যাগ ক'রে চলে গেছে, মিত্রশক্তিরাও খুঁজে ফিরছে। রান্নাঘরে ঝিয়ের কাজ করতো, বাসন ধুতো, রাতে গিয়ে স্যালভেশন আর্মির হোস্টেলে ঘুমাতো। তারপর একদিন ১৯৫০ সলে উইনজারের সঙ্গে দেখা হলো। অসনাব্রুখে হোটেলে উঠেছিলো সে তখন, কেনবার মতো বাড়ি কিনলো, হ্রস্বকায় ক্লীব মানুষটা। ওকে আহ্বান জানালো বাড়ির কাজকর্ম দেখতে।

কাহিনী থামতেই মিলার জিজ্ঞেস করলো, "ব্যস এই?"

"হ্যা, ফাদার।"

"তুমি জানো তো বাছা, সম্পূর্ণ পাপ স্বীকার না করলে আমি তোমাকে মুক্তিদান করতে পারবো না।"

"সবই বলেছি ফাদার।"

গভীর ক'রে দম নিলো মিলার। "কিন্তু জাল পাসপোর্টগুলো? যেগুলো

পলায়মান এসএস-দের জন্যে সে বানিয়ে দিতো?"

ক্ষণিকের জন্যে বৃদ্ধা নির্বাক হয়ে গেলো। মিলারের ভয় হলো হয়তো আবার অচেতন হয়ে গেছে।

"আপনি তা জানেন, ফাদার?"

"হ্যা জানি।"

"আমি তো সেগুলো বানাইনি।"

"কিন্তু তুমি তো জানতে, ক্লস উইনজার কি কাজ করতো?"

"হ্যা।" অস্ফুট শব্দ বের হলো শুধু।

"সে চলে গেছে এখন, চলে গেছে," মিলার বললো।

"না, যায়নি, ক্লস যেতে পারে না, আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না, আবার ফিরে আসবে।"

"জানো কোথায় গেছে?"

"না, ফাদার।"

"তুমি কি নিশ্চিত? ভেবে দেখো বাছা। পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। কোথায় যেতে পারে?"

শীর্ণ মাথাটা বালিশের ওপরেই দুলে উঠলো। "জানি না ফাদার। ওরা ভয় দেখালে ফাইলটা ব্যবহার করবে ব'লে আমাকে বলেছিলো, তাই করবে।"

মিলার চম্‌কে উঠলো। বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে রইলো সে, চোখ দুটো এখন বুজে এসেছে।

"কোন্ ফাইল, বাছা?"

আরো পাঁচ মিনিট ধ'রে কথাবার্তা চললো। তারপর দরজায় আস্তে ক'রে টোকা পড়লো। মিলার তার কব্জি থেকে ধীরে ধীরে মহিলার হাত সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো যাবার জন্যে।

"ফাদার..."

ডাকটা খুবই করুণ। ফিরে তাকালো মিলার। দুটি আর্ত চোখের পূর্ণ দৃষ্টি তার দিকে।

"আমাকে আশীবাদ করুন, ফাদার।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো মিলার। ভয়ানক অপরাধ করতে যাচ্ছে, তবু মনে মনে আশা যে কোথাও কেউ কোনদিন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ডান হাত তুলে ক্রসের চিহ্ন আঁকলো..."*ইন নমিনে পাত্রিস, অৎ স্পিরিতাস স্যাঙ্কতি, এগো তে অ্যাবসলভো আ পেক্কাতিস তুইস।*"

গভীর নিঃশ্বাস ফেললো বৃদ্ধা তারপর চোখ বুজে চেতনার ওপারে চলে গেলো।

www.boiRboi.blogspot.com

বাইরে ডাক্তার অপেক্ষা করছিলো। মিলারকে দেখেই বললো, "যথেষ্ট সময় নিলেন আপনি।"

মিলার শুধু মাথা নাড়লো।

দরজা দিয়ে রোগিণীকে এক পলক দেখে নিয়ে ডাক্তার বললো, "ঘুমাচ্ছে।" মিলারকে সঙ্গে ক'রে আবার হলঘরে ফিরে এলো সে। মিলার জানতে চাইলো, "ক'দিন বাঁচবে ব'লে আপনি মনে করেন ডাক্তার?"

"বলা খুব মুশকিল। দু'দিন নয় তো তিন দিন, তার বেশি নয়। মনে করবেন না কিছু...আমি দুঃখিত।"

"হু," গভীর শ্বাস ফেললো মিলার, "যাক, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ, আপনার জন্যেই দেখা হলো।"

ডাক্তার সামনের দরজাটা খুলে ধরলে মিলার যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। "শুনুন, একটা কথা আছে। আমাদের পরিবারে আমরা সবাই ক্যাথলিক। খালা যাজকের কথা বলছিলেন। মানে শেষকৃত্য, বুঝলেন তো?"

"হ্যা, হ্যা, বুঝেছি।"

"দেখবেন একটু ব্যাপারটা?"

"নিশ্চয়ই," ডাক্তার বললো, "আপনাকে অতো ক'রে কিছু বলতে হবে না। ব্যাপারটা আমি জনতাম না। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবো। আচ্ছা, গুডবাই।"

দিনের আলো তখনো শেষ হয়ে যায় নি। মিলার যখন থিওডোর হেউস প্লাৎজে পৌছে হোটেল থেকে বিশ গজ দুরে তার জাগুয়ারটা দাঁড় করালো তখন কিন্তু গোধুলির শেষ আলো আঁধারে মিশে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে তার ঘরে গেলো মিলার। আরো দু-তলা উচু থেকে ম্যাকেনসেন তার আগমন লক্ষ্য করছে। হাতব্যাগে বোমাটা ভরে নিয়ে হোটেলের সামনে নেমে এলো। খুব ভোরে রওনা দেবে এই অজুহাতে রাতের ভাড়া মিটিয়ে নিজের গাড়িতে এসে উঠলো। গাড়িটাকে অনেক ধস্তাধস্তি ক'রে এমন একটা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করালো যেখান থেকে হোটেলের প্রবেশপথ এবং জাগুয়ার দুটোর ওপরেই দৃষ্টি রাখা যাবে।

তারপর গাড়িতে ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলো। এখনো বহু লোকের যাতায়াত, মিলারও যে কোন মুহূর্তে হোটেলের বাইরে আসতে পারে, অতএব জাগুয়ারে গিয়ে কাজ করার সময় এখনো আসেনি। যদি গাড়িতে বোমা বসানোর আগেই মিলার গাড়ি নিয়ে কেটে পড়ে তাহলে ম্যাকেনসেন তাকে অসনাব্রুখ থেকে বেশ কিছু মাইল দূরে খোলা সড়কের ওপরেই শেষ ক'রে দেবে; বৃফকেসটাও তখন হাতিয়ে নেবে। কিন্তু মিলার যদি রাতে হোটেলে ঘুমায় তাহলে ম্যাকেনসেন গভীর রাতে তার গাড়িতে বোমাটা পুঁতে দেবে, যখন রাস্তায় কেউ থাকবে না।

মিলার তার ঘরে ব'সে একটা নাম মনে করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

লোকটার মুখ স্পষ্ট মনে ভাসছে অথচ নামটা কিছুতেই মনে আসছে না।

১৯৬১-র ক্রিসমাসের সময়। হাম্বুর্গের জেলা-আদালতে প্রেসবক্সে ব'সে আছে; একটু পরে যে মামলাটা উঠবে সেটাতেই তার আগ্রহ, অপেক্ষা করছে সেটার জন্যে। এখন কিন্তু যে মামলাটা চলছে তার শেষের দিকে সে এসে আদালতে ঢুকেছে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে শুকনো মতোন একটা লোক। আসামী পক্ষের উকিল আদালতের দয়া ভিক্ষা ক'রে বক্তৃতা দিচ্ছে; বলছে যে ক্রিসমাসের পর্বন চলছে এখন, মঙ্কেলের ওপর ছয়টি প্রাণীর জীবন নির্ভর করে – তার স্ত্রী এবং পাঁচ ছেলেমেয়ের।

মিলারের মনে পড়লো তার দৃষ্টি চকিতে গিয়ে পড়েছিলো এক শীর্ণ নারীমূর্তির ওপর। স্ত্রীলোকটি চরম হতাশায় দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসেছিলো। জজসাহেব তাঁর রায়ে জানালেন যে শাস্তি আরো কঠোর হতে পারতো কিন্তু আসামীপক্ষের কৌসুলির আবেদন মেনে নিয়ে তিনি আসামীকে শুধু আঠারো মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো যে লোকটির হাম্বুর্গে অন্যতম দক্ষ সিঁদেল চোর, সিন্দুক ভাঙতে তার জুড়ি মেলা ভার।

দিন পনেরো পরে রিপারবান থেকে সামান্য দুরে একটা বারে বসেছিলো মিলার। আন্ডারওয়ার্ল্ডের সংবাদদাতাদের সঙ্গে ব'সে ক্রিসমাস ড্রিংকস হচ্ছিলো। পকেট তখন তার বেশ গরম, বড়সড় একট সচিত্র কাহিনীর জন্যে অনেকগুলো টাকা পেয়েছে। বারের ওদিকটাতে এক মহিলা মেঝে সাফ করছিলো। তাকে দেখেই চিনতে পারলো মিলার যে এই সেই মহিলা, সেই সিঁদেল চোরের বৌ যার জেল হয়ে গেলো দু সপ্তাহ আগে। দয়া উথলে উঠলো তার, পকেট থেকে একটা একশো মার্কের নোট বের ক'রে মহিলাটাকে দিয়ে বার থেকে বের হয়ে গেলো।

জানুয়ারিতে তার কাছে একটা চিঠি এলো হাম্বুর্গ জেল থেকে। কোনমতে ধরে ধরে লেখা। মহিলাটি নিশ্চয়ই বারম্যানের কাছ থেকে তার নাম জেনে নিয়ে স্বামীকে জানিয়েছিলো। চিঠিটা একটা পত্রিকার অফিসে এসেছিলো যেখানে কখনো কখনো মিলার লেখা দেয় । তারা ওকে সেটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

চিঠিতে লেখা ছিলো :

'হের মিলার, আমার স্ত্রী আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে আপনি ক্রিসমাসের আগে কতোখানি করেছিলেন আমার পরিবারের জন্যে। আপনার সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি, জানি না কেন করেছেন, তবে আপনাকে আমি প্রচুর ধন্যবাদ দিতে চাই। আপনি সত্যিকারের ভদ্রলোক। টাকাটা খুব কাজে এসেছে; ডোরিস এবং ছেলেমেয়েরা ক্রিসমাস ও নববর্ষ কাটাতে পেরেছে বেশ ভালোমতো। যদি কোনদিন আমি আপনার কোন সাহায্যে লাগতে পারি, শুধু মুখে বলবেন। আমার শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি...

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু ইতির নিচে নামটা কি লেখা ছিলো? কোপেল কি? হ্যা, তাই, ঠিক, কোপেলই হবে। ভিক্টর কোপেল। মনে মনে ঈশ্বরের নাম নিলো মিলার, কোপেল যেনো এখন আবার জেলখানায় না ব'সে থাকে। পকেট থেকে ছোট্ট খাতাটা বের করলো যেটাতে নানা ধরনের চর-অনুচর-সংবাদদাতাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর লেখা আছে। হোটেলের টেলিফোনটা টেনে নামিয়ে হাঁটুর ওপর রেখে হাম্বুর্গের আন্ডারগ্রাউন্ডের বন্ধুদের টেলিফোন করতে থাকলো।

সাড়ে সাতটায় কোপেলের সন্ধান পেলো। শুক্রবার সন্ধ্যা, তাই একদল বন্ধু নিয়ে বারে বসেছে সে। টেলিফোনের ভেতর দিয়েও জ্যুক-বক্সের গান ভেসে আসছিলো, সেই হাজারবার শোনা গান – বিটলসের 'আই ওয়ানা হোল্ড ইওর হ্যান্ড'।

অনেক খুঁটিয়ে পুরনো কথা বলার পর কোপেল তাকে চিনতে পারলো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কয়েক দফা মদ খাওয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

"খুব ভালো কাজ করেছিলেন, মহান কাজ, হের মিলার।"

"দ্যাখো, জেলখানা থেকে তুমি লিখেছিলে যে কোনদিন যদি কোন কাজ করতে বলি তোমাকে তুমি ক'রে দেবে। মনে আছে সে কথা?"

কোপেলের কণ্ঠে ভয়ের সুর। "হ্যা, মনে আছে –"

"আমার কিছু সাহায্যের দরকার। সামান্যই। করতে পারবে?"

হাম্বুর্গের লোকটার ভয় কাটেটি তখনো। "আমার কাছে তো বিশেষ কিছু নেই, হের মিলার।"

"আরো না, ধার চাইছি না," মিলার বললে। "শোনো, একটা কাজ আছে, তোমার জন্যে, টাকা পাবে অবশ্য। সামান্যই কাজ।"

এতোক্ষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো কোপেলের। "ও, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তা কোত্থেকে বলছেন আপনি?"

মিলার তাকে তার অবস্থানের কথাটা জানিয়ে দিলো। "হাম্বুর্গ স্টেশনে চলে যাও সোজা, অসনাব্রুখের যে ট্রেনটা প্রথমে ছাড়ে সেটাতেই চ'ড়ে বোসো। স্টেশনে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। হ্যা, শোনো, তোমার যন্ত্রপাতিগুলো সঙ্গে নিয়ে এসো।"

"কিন্তু হের মিলার, এলাকার বাইরে তো আমি কাজ করি না। অসনাব্রুখের কিছুই আমি চিনি না।"

হাম্বুর্গের কথ্য ভাষায় বললো মিলার। "একেবারে মাখন, কোপেল; ফাঁকা মাঠ। মালিক হাওয়া হয়ে গেছে। আমি নিজে দেখেছি, কোন সমস্যা নেই, মামুলি কাজ। হাম্বুর্গে ফিরে গিয়ে সকালের খাবার খেয়ো, আরাম ক'রে। লোকটা এক সপ্তাহ বাইরে থাকবে, ফিরে আসবার আগেই মাল সরিয়ে নেবে, মামুরা ভাববে

শহরের মাস্তানরা কাজটা করেছে।"

"আমার রেলভাড়া কে দেবে?" কোপেল জানতে চাইলো।

"এখানে আসো, আমিই দেবো। হাম্বুর্গ থেকে ন'টায় গাড়ি ছাড়ে। হাতে মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে তোমার, জলদি করো।"

কোপল বড় ক'রে শ্বাস টানলো। "আচ্ছা আসছি।"

ফোন রেখে দিলো মিলার। হোটেলের সুইচবোর্ড অপারেটরকে বললো রাত এগোরোটায় ডেকে দিতে। তারপর একটু ঘুম দেয়ার জন্যে শুয়ে পড়লো।

বাইরে ম্যাকেনসেন তখনো একা একা পাহারা দিয়েই চলেছে। মনে মনে সে ঠিক ক'রে রেখেছে যে মিলার যদি না বের হয় তো মাঝরাতে জাগুয়ারের ওপর কাজ শুরু ক'রে দেবে।

কিন্তু রাত সোয়া এগারোটার মিলার হোটেল থেকে বেরিয়ে চত্বর পেরিয়ে স্টেশনে গিয়ে ঢুকলো। ম্যাকেনসেন অবাক। মার্সিডিজ থেকে নেমে সেও গেলো স্টেশনে। প্রবেশমুখ থেকে দেখলো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে মিলার ট্রেনের অপেক্ষায়।

একটা কুলিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "এই প্ল্যাটফর্মে এখন কোন্ ট্রেন আসছে?"

এগারোটা তেত্রিশের মুনস্টার," সে বললো।

ম্যাকেনসেন কিছু বুঝতে পারলো না, নিজের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও মিলার ট্রেন ধরছে কেন! মহা ফাঁপরে পড়লো সে। মার্সিডিজে ফিরে এসে চুপচাপ ব'সে রইলো।

এগারোটা পঁয়ত্রিশে তার সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। মিলার স্টেশন থেকে একজন রোগা-পাতলা নোংরা মতো লোককে সঙ্গে ক'রে ফিরে এলো, লোকটার হাতে আবার একটা কালো চামড়ার ঝোলা। দু'জনে কথা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। ম্যাকেনসেন মনে মনে শাপান্ত ক'রে উঠলো। সঙ্গে লোক নিয়ে যদি জাগুয়ারে ক'রে মিলার ভাগে তবেই হয়েছে। দু'জনে মরলে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে উঠবে। কিন্তু সে দেখলো ওরা দু'জনে মিলে একটা ট্যাক্সি নিলো, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো ম্যাকেনসেন। বিশ মিনিট সময় দেবে ওদের, তারপর বিশ গজ দূরে দাঁড় করানো জাগুয়ারটার ওপর কাজ শুরু ক'রে দেবে।

রাতের বেলায় স্কয়ারটা প্রায় খালি হয়ে গেলো। গাড়ি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো ম্যাকেনসেন, হাতে পেনসিল টর্চ আর তিনটা ছোট হাতিয়ার। জাগুয়ারের কাছে এসে চারদিকে দেখে নিয়ে গাড়িটার তলায় ঢুকে পড়লো। জানতো যে কাদা আর তুষারে পরনের সুটটার দফারফা হয়ে যাবে, তাতে পরোয়া করলো না সে। পেনসিল টর্চের আলোয় জাগুয়ারের সামনের দিকটার নিচে বনেটের ঢাকনি লকিং

www.boiRboi.blogspot.com

স্যুইচ খুঁজে পেলো বিশ মিনিটেই খুলে ফেললো সেটা। এক ইঞ্চি লাফিয়ে উঠলো বনেটের ঢাকনি। পরে বন্ধ করার সময় ওপর দিক থেকে চাপ দিলেই হবে। বনেট খোলার জন্যে সে গাড়ির দরজাটা ভাঙতে চাচ্ছে না।

মার্সিডিজে ফিরে গিয়ে বোমাটা নিয়ে আবার এলো স্পোর্টস গাড়িটার কাছে। গাড়ির বনেট খুলে কেউ ঝুঁকে প'ড়ে কাজ করছে সেটা দেখে তো আর লোক জমে যায় না! অতি স্বাবাবিক দৃশ্য, নিজের গাড়ির টুকটাক মেরামত করছে হয়তো কেউ।

তার আর প্লায়ার দিয়ে বিস্ফোরকের চার্জ চালকের আসন থেকে তিন ফুট দূরে বসিয়ে দিলো ইঞ্জিনের ভেতর দিকে। ট্রিগার মেক্যানিজম থেকে শক্তির আধারে পৌছে দুটো যে আট ফুট লম্বা তার ঝুলে রয়েছে সেগুলো ইঞ্জিনের কলকাজাগুলোর ফাঁক দিয়ে মাটিতে গলিয়ে দিলো। আবার গাড়ির তলায় ঢুকে টর্চের আলোয় সামনের সাসপেনশনটাকে ভালো ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাঙ্খিত স্থানটা খুঁজে পেলো। ট্রিগারের পেছন অংশটাকে ব্রেসিং-বারের সঙ্গে শক্ত ক'রে তার দিয়ে বেঁধে পাতলা রাবার-ঢাকা চোয়াল দুটোকে সামনের মোটা সাসপেনশন স্প্রিংয়ের পাতের মধ্যে বসিয়ে দিলো। শক্ত ক'রে লাগিয়ে দু-চারবার ভালো ক'রে ঝাঁকিয়ে যখন গাড়ি চলবে, রাস্তার সাধারণ কোন উঁচু অংশে লাগলেই সামনের চাকা দুটোর সাসপেনশনের পাত বেঁকে যাবে, ট্রিগারের খোলা চোয়াল দুটোর ওপর তখন চাপ পড়বে, আর তাহলেই পাতলা কাঁচের বাল্বটা ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবাহিত হ্যাক্‌শ ব্লেডটার দুটো অংশে ছোঁয়া লেগে যাবে। আর তা লাগামাত্র মিলার ও তার হাতব্যাগ টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়বে কে জানে।

তারপরে খোলা তারের বাড়তি অংশগুলোকে গোল ক'রে পাকিয়ে ইঞ্জিনের নিচে টেপ দিয়ে আটকিয়ে দিলো, যাতে সেগুলো রাস্তার ওপর না লাগে। কাজটা হয়ে গেলে চাপ দিয়ে বনেটটা বন্ধ ক'রে ম্যাকেনসেন নিজের মার্সিডিজে গিয়ে বসে রইলো। এখন আর ঘুমাতে কোন আপত্তি নেই, রাতে বেশ ভালোই কাজ হয়েছে।

মিলার ট্যাক্সিওলাকে বলেছিলো সার প্লাৎসে যেতে। সেখানে পৌছে ভাড়া চুকিয়ে তাকে বিদায় দিলো। সারাক্ষণ কোপেল চুপ ক'রে ছিলো। ট্যাক্সি শহরের দিকে ফিরে চলে গেলে মিলারকে জিজ্ঞেস করলো, "জানেন নিশ্চয়, হের মিলার, আপনি কি করতে যাচ্ছেন? মানে, এমন ধান্দায় তো আপনার থাকার কথা নয়। আপনি কাগজে-টাগজে লেখালেখি করেন –"

"ঘাবড়াও মাত কোপেল। আমি খুঁজছি শুধু কিছু কাগজপত্র ওই বাড়ির সিন্দুকে যা রাখা আছে। সেগুলো আমি নেবো, তাছাড়া যদি আর কিছু থাকে তো সব তোমার। বুঝেছো?"

www.boiRboi.blogspot.com

"ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন। চলুন, কোথায় যেতে হবে।"

"হ্যা আরেকটা কথা, বাড়িতে একজন পরিচারিকা থাকে কিন্তু।"

"সে কি?" কোপেল প্রতিবাদ ক'রে ওঠে, "আপনি যে বলেছিলেন বাড়ি খালি! যদি আগে আমি কিন্তু ভাগবো। মারামারির মধ্যে আমি নেই।"

"না, না. দুটো পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো, তারপর যাবো। ততোক্ষণে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়বে।"

উইনজারের বাড়ি পর্যন্ত এক মাইল পথ ওরা হেঁটেই চলে এলো। বাড়ির সম্মুখে পৌছে রাস্তার এদিক-ওদিক একবার দেখে নিয়ে চট্ ক'রে গেটের ভেতরে ঢুকে পড়লো তারা। জুতার শব্দ যাতে না হয় সেজন্যে ওরা পথের কিনারা ঘেঁষে ঘাসের ওপর দিয়ে চললো। লন পেরিয়ে রডোডেনড্রন ঝোপে গিয়ে লুকালো। সামনের জানালা দিয়ে যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে সেটা বোধহয় পড়ার ঘর।

নিশাচর প্রাণীর মতো ঝোপের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চলে গেলো কোপেল, বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখে আসতে। মিলারকে বললো যন্ত্রপাতির থলেটা যেনো পাহারা দেয়।

কিছুক্ষণ পর কোপেল ফিরে এসে মিলারকে জানালো, "পরিচিকার ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। ওই দিকটায় দেখে এলাম।"

চিরহরিৎ গাছের ঘন পাতার আড়ালে ওরা ব'সে রইলো এক ঘণ্টা। ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে। সিগারেট ধরানোরও কোন উপায় নেই। রাত একটার সময় কোপেল আবার গেলো সরেজমিনে তদন্ত করতে। এসে জানালো যে আলো নিভে গেছে। আরো ঘণ্টা দেড়েক ওরা ব'সে রইলো। তারপর মিলারের কব্জিতে একটা চিমটি দিয়ে থলে হাতে ক'রে কোপেল এগিয়ে গেলো। জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে লন পেরিয়ে চলে গেলো পড়ার ঘরের জানালার দিকে। বড় রাস্তায় দূরে কোথাও একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠলো, আরো দূরে একটা পথচলতি গাড়ির চাকার শব্দ ভেসে আসছে।

ওদের কপাল ভালো। পড়ার ঘরের জানালার নিচটা অন্ধকার। বাড়ির এদিকটায় চাঁদেও আলো এখনো আসেনি। কোপেল তার পেনসিল টর্চের আলো দিয়ে জানালার পুরো ফ্রেমটা দেখে বুঝতে পারলো যে জানালাটা শক্ত কিন্তু কোন অ্যালর্ম লাগানো নেই। থলে থেকে কিছু আঠালো ফিতা, লাঠির ডগার ওপরে একটা বায়ুশোষক প্যাড, হীরা-বসানো কাঁচ কাটার একটা কলম আর একটা রাবারের হাতুড়ি বের করলো। অত্যন্ত ক্ষিপ্রহাতে জানালার ছিটকিনিটার ঠিক নিচে কাঁচের ওপর দিয়ে একটা বৃত্ত কেটে দিলো। বায়ুশোষকটাকে চেপে ধরে রাবারের হাতুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিতেই গোল অংশটা খুলে এসে শোষকের সঙ্গে সেঁটে রইলো। জানালা দিয়ে নজর বুলিয়ে দেখলো পাঁচ ফুট দূরে ঘরের মেঝেতে মোটা

www.boiRboi.blogspot.com

কার্পেট বিছানো। কাঁচের গোল অংশটা সেখানে তাক্ ক'রে ছুঁড়ে ফেলে ভেতরে হাত ঢুয়িয়ে জানালাটা খুলে ফেললো। তারপর নিঃশব্দে জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে চলে এলো। মিলারও সন্তর্পণে ওর পিছু পিছু এলো। বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবনের তুলনায় ঘরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তবু কোপেল ঠিক দেখতে পাচ্ছে, যেনো ভূতুরে চোখ ওর। ঘরের ভেতর দিয়ে খুব সহজেই চলে এলো প্যাসেজের দরজাটার দিকে। সেটা বন্ধ ক'রে তবে পেনসিল-টর্চটা জ্বালালো।

আলোর রেখাটা সারা ঘর ঘুরে বেড়ালো, যেনো সন্ধানী চোখের দৃষ্টি। ডেস্ক, টেলিফোন, বইয়ের আলমারি, হাতালওলা একটা চেয়ার – সব একে একে পর্যবেক্ষণ ক'রে আলোর বিন্দু এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালো একটা সুদৃশ্য ফায়ারপ্লেসের ওপর।

মিলারের পাশে হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে কোপেল এসে হাজির হলো।

"এইটাই পড়ার ঘর হবে। এক বাড়িতে তো আর দুটো ঘরে ফায়ার প্লেস থাকবে না। তা ইটের সাজ খোলে কোন্ যন্ত্রে?"

"জানি না," বিড়বিড় ক'রে বললো [illegible] কোপেলের দেখাদেখি সেও এখন বিড়বিড় ক'রে কথা বলছে। তস্কর ধুরন্ধরটি তো বহু দুঃখে শিখেছে যে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলার চাইতে বিড়বিড় করা অনেক নিরাপদ।

"তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"হায় ঈশ্বর, তাতে তো অনেক সময় লাগবে," কোপেল বললো।

মিলারকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে সাবধান ক'রে দিলো যে হাতের দস্তানা যেনো কখনো না খোলে। থলেটা হাতে নিয়ে কোপেল চলে গেলো ফায়ারপ্লেসের পাশে। মাথায় একটা ব্যান্ড পরে নিয়ে তার খাঁজে পেনসিল টর্চটা আটকে দিলো। আলোর রশ্মি এখন ছোট্ট বিন্দুতে শুধু সামনের দিকে পড়ছে। ইঁটের সাজের ওপর দিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে প্রতিটি ইঞ্চি পরখ ক'রে দেখলো, কোথাও কোন উঁচুনিচু জায়গা বা খাঁজটাজ আছে কিনা। না পেয়ে তখন একটা তীক্ষ্ণ ফলাওলা ছুরি দিয়ে দিয়ে সরু ফাটল খুঁজলো। অবশেষেও পেলোও, সাড়ে তিনটা বেজে গেছে তখন।

দুটো ইটের মধ্যে চুলের মতো সরু একটা ফাটলে গিয়ে চাকুর ফলাটা পিছলে গেলো। অস্ফুট ক্লিক্ ক'রে শব্দ হলো। চার বর্গফুট পরিমাণ ইঁটের একটা ক্ষেত্র এক ইঞ্চি বেরিয়ে এলো। এমন সুন্দর কাজ যে খোলা চোখে ধরারই উপায় নেই ওখানে কোন গোপন আলমারি লুকিয়ে আছে। কোপেল দরজাটাকে আস্তে ক'রে খুললো। দেখা গেলো তার পেছনে আছে একটা ইস্পাতের ছোট দেয়াল-সিন্দুক।

টর্চের আলো জ্বালিয়েই রাখলো। ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিলো স্টেথেস্কোপ; ইয়ারপিস দুটোকে কানে লাগালো। চার চাকতির কম্বিনেশন তালার দিকে পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থেকে কাজ শুরু করলো, কান রইলো একাগ্র হয়ে আকাঙ্ক্ষিত শব্দটার জন্যে।

www.boiRboi.blogspot.com

দশ ফুট দূরে ব'সে মিলার কাজটা দেখতে দেখতে ক্রমশ ঘাবড়ে যাচ্ছিলো। কপাল থেকে টর্চের আলো গিয়ে ঝল্‌সে উঠলো একজোড়া রূপার বাতিদানি ও বেশ ভারি ওজনের একটা প্রাচীন নস্যি নেবার আধারের ওপর।

কোন কথা না বলে উঠে কোপেলের কাছে গেলো। তার কপালের আলো দিয়ে সিন্দুকের ভেতরটা পরীক্ষা ক'রে দেখলো। কয়েক বান্ডিল নোট ছিলো, সেগুলো বিনা বাক্যব্যয়ে কোপেলের হাতে দিয়ে দিলো। চোরটা সেগুলোর দিকে এক ঝলক দেখে আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি ক'রে উঠলো।

ওপরের তাকে ছিলো শুধুমাত্র একটা জিনিস – বেশ মোটা মতো খাকি রঙের একটা খাম। মিলার সেটা খুলে ভেতরের কাগজগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে গেলো। গোটা চল্লিশেক পৃষ্ঠা, প্রতিটাতে একটা ক'রে ছবি আঁটকানো আর টাইপ ক'রে কয়েকটা লাইন লেখা। আঠারো নাম্বার পৃষ্ঠায় এসে থম্‌কে দাঁড়ালো সে। লেখাটা পড়েই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, "হায় ঈশ্বর!"

"চু-প!" কোপেল তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে দিলো।

ফাইল বন্ধ ক'রে দিলো কোপেল। আবার ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কম্বিনেশনও বন্ধ করলো। ইটের দেয়াল জায়গা মতো রেখে চেপে দিতেই অস্ফুট আওয়াজ ক'রে সেটা খাপে খাপে ব'সে গেলো। নোটের বান্ডিলগুলো পকেটে ভরে ফেলেছে, ওগুলো উইনজারের শেষ চারটা নকল পাসপোর্টের ফসল। বাতিদানী ও নস্যির কৌটাটাও চট ক'রে থলেতে ভরে ফেললো কোপেল।

আলো নিভিয়ে ফেলে হাত ধরে মিলারকে নিয়ে এলো জানালার কাছে। দু'জনে জানালা টপকে ঘাসের ওপর এসে পড়লো। চাঁদ এখন মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। ঝোপের দিকে পা বাড়ালো তারা। মিলার তার গোল-গলা সোয়েটারের নিচে ততোক্ষণে ফাইলটা লুকিয়ে ফেলেছে।

ঝোপের পাশ দিয়ে দিয়ে গেটের কাছে এসে টুপ ক'রে গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে গেলো ওরা। রাস্তায় পৌছেই মিলার দৌড়াতে চেষ্টা করলো।

ওকে থামিয়ে দিলো কোপেল, "আহ্! আস্তে আস্তে হাটুন, যেনো আমরা কোন পার্টি থেকে ফিরে আসছি।"

রেলস্টেশন প্রায় তিন মাইলের পথ। পাঁচটা বাজে প্রায় তখন। রাস্তায় দু'একটা লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। স্টেশনে পৌছে দেখলো সাতটার আগে হাম্বুর্গ যাওয়ার কোন ট্রেন নেই। কোপেল বুফেতেই অপেক্ষা করার প্রস্তাব করলো। কফি আর ডবল-পেগ কর্নলিকার খেয়ে শরীর ততোক্ষণে গরম করে নেয়া যাবে।

"বেশ ভালোই মালকড়ি, হের মিলার," সে বললো, "আপনি যা খুঁজছিলেন পেয়েছেন বোধহয়।"

"হ্যা হ্যা, পেয়ে গেছি।"

www.boiRboi.blogspot.com

"আচ্ছা, তাহলে এবার কেটে পড়া যাক। গুডবাই, হের মিলার।"

স্কয়ারটা পেরিয়ে হোটেলে চলে এলো মিলার। জানতেও পারলো না যে দাঁড়-করানো মার্সিডিজ থেকে একজোড়া চোখ তাকে লক্ষ্য করতে থাকলো।

মিলারের কিছু খোঁজখবর নেয়ার ছিলো কিন্তু এখন খুব বেশি সকাল। তাই শুয়ে পড়বার সিদ্ধান্ত নিলো। তিন ঘণ্টা পরে সাড়ে ন'টার সময় জাগিয়ে দেবার জন্যে হোটেল বয়কে নির্দেশ দিয়ে রাখলো।

ঠিক সাড়ে ন'টায় ফোন বাজলো। কফি আর রোল্‌সের অর্ডার দিয়ে দিলো সে। গরম পানিতে গোসল ক'রে বেরিয়ে আসতেই দেখলো খাবার হাজির। কফি খেতে খেতে কাগজগুলো দেখতে লাগলো। প্রায় পাঁচ-ছয়টা মুখ চেনা-চেনা লাগলেও নামগুলো কখনও শোনেনি। অবশ্য জানে যে নামগুলো সব অর্থহীন।

আঠারো নম্বর পৃষ্ঠাটা খুলে দেখলো। লোকটা একটু বয়স্ক, চুলও কিছুটা লম্বা, ঠোঁটের ওপরে গোঁফ। কিন্তু কান দুটো ঠিক সেই রকম, মুখের আদলও। তেমনি সরু নাক আর ফ্যাকাশে চোখ। নামটা খুব সাধারণ নাম। ঠিকানাটা খুঁটিয়ে দেখলো; পোস্টাল নাম্বার দেখে মনে হলো শহরের কেন্দ্রস্থল সেটা, খুব সম্ভব কোন ফ্ল্যাট বাড়ি।

দশটার সময় ঠিকানায় বর্ণিত শহরের টেলিফোন এনকোয়ারিতে ফোন করলো মিলার। জিজ্ঞেস করলো যে অমুক ঠিকানার ফ্ল্যাট বাড়ির ম্যানেজারের ফোন নম্বর তো। আন্দাজে ঢিল মারলো, কিন্তু লেগে গেলো ঠিকই। ফ্ল্যাট বাড়িই সেটা এবং বেশ অভিজাত অ্যাপার্টমেন্ট।

ম্যানেজারকে ফোন করলো। সবিনয়ে তার সাথে কথা বলতেই গলে গেলো সে। জার্মানরা এমনিতেই উপাধির খুব ভক্ত, কাজেই তার সঠিক প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া যায়। বললো যে একজন ভাড়াটেকে বারবার টেলিফোন ক'রে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে কারণ ভদ্রলোক নিজেই ওই সময়ে টেলিফোন করতে বলেছিলেন। ম্যানেজার সাহেব কি একটু সাহায্য করতে পারেন? তার টেলিফোন কি বিকল হয়ে আছে?

ওই প্রান্তের লোকটি খুবই সদাশয়। হের ডিরেক্টর হয়তো ফ্যাক্টরিতে রয়েছেন বা সপ্তাহান্ত কাটাতে গ্রামের বাড়িতেও যেতে পারেন।

কোন্ ফ্যাক্টরি? কেন তাঁর নিজের...রেডিও ফ্যাক্টরি? ওহ্ হো, কি বোকা আমি, দেখুন তো, টেলিফোন ছেড়ে দিলো মিলার। এনকোয়ারি থেকে ফ্যাক্টরির নম্বর পেয়ে গেলো। ফোন ধরলো লোকটির সেক্রেটারি। বললো, হের ডিরেক্টর সপ্তাহ শেষে তাঁর গ্রামের বাড়িতে গেছেন, সোমবার সকালে ফিরবেন। না না, সেই বাড়ির নম্বর বলা নিষেধ, একান্তে থাকতে পারবেন না নইলে।

www.boiRboi.blogspot.com

মিলার মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিলো।

অবশেষে রেডিও কারখানাটির মালিকের গোপন ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর জানতে পারা গেলো এক পুরনো সতীর্থের কাছ থেকে। লোকটি হাম্বুর্গের এক বড় সংবাদপত্রের শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক সংবাদদাতা।

মিলার ব'সে রইলো কিছুক্ষণ। একদৃষ্টিতে রশম্যানের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। নতুন নাম ও গোপন ঠিকানাটা নোট বইয়ে লিখে নিয়েছে। এখন মনে পড়ছে, এ নামও আগে শুনেছে, রুহ্'র অঞ্চলের একজন উঠতি শিল্পপতি; দোকানেও দেখেছে এই কোম্পানির রেডিও। জার্মানির ম্যাপ খুলে গ্রামের ঠিকানাটাও খুঁজে পেলো।

ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বিল মিটিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো মিলার। হাতে শুধু বৃফকেস। ভয়ানক খিদে পেয়েছে, তাই বিশাল একটা স্টেক নিয়ে বসলো।

খেতে খেতে ভাবলো সারাটা বিকেল গাড়ি চালিয়ে রাতে কোথাও আশ্রয় নিয়ে সকালে গিয়ে মোকাবিলা করবে। লুভিগসবুর্গের জেড-কমিশনের সেই উকিলটির নিজস্ব টেলিফোন নম্বর লেখা কাগজটাও তার কাছে আছে। খবর পাঠিয়ে দেয়া যায় এক্ষুনি কিন্তু রশম্যানের মুখোমুখি হতে চায় সে নিজে, এতোদিনের কষ্ট তবেই সার্থক হবে। রবিবারের সকালটা এদিক দিয়ে বেশ সুসময়ও বটে, চমৎকার হবে।

বেরুতে বেরুতে দুটো বাজলো। সুটকেসটাকে জাগুয়ারের বুটে ছুঁড়ে দিয়ে, নিজের পাশে বৃফকেসটা রেখে, চালকের আসনে বসলো মিলার। অসনাব্রুখ শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পেছনে পেছনে এলো একটা মার্সিডিজ। লক্ষ্যও করলো না তা। জাতীয় সড়কে উঠে জাগুয়ারটা গতি বাড়াতেই পেছনের গাড়িটা শহরের দিকে আবার ফিরে এলো।

রাস্তার পাশের একটা বুথ থেকে ম্যাকেনসেন নুরেমবার্গে ওয়েরউলফকে ফোন করলো।

"রওনা হয়ে গেলো এক্ষুনি। তাড়া-খাওয়া বাদুড়ের মতো ছুটছে দক্ষিণ দিকে।"

"তোমার যন্ত্র ওর সঙ্গে যাচ্ছে তো?"

হাসলো ম্যাকেনসেন। "অবশ্যই যাচ্ছে। সামনের দিকের সাসপেনশনে লাগানো আছে। পঞ্চাশ মাইল যেতে হবে না, টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে শালা, লাশ চিনতেও পারবেন না।"

"বাহ্!" খুব খশি নুরেমবার্গের লোকটি, "নিশ্চয়ই খুব খাটুনি গেছে তোমার, কামেরাড। যাও, শহরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও এবার।"

দ্বিতীয়বার আর বলতে হলো না ম্যাকেনসনকে। বুধবারের পরে আর ঘুম হয় নি তার।

www.boiRboi.blogspot.com

মিলার কিন্তু অনায়াসে পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে গেলো, তারপর আরো একশো, কিছুই হলো না। কারণ ম্যাকেনসেন একটা জিনিস উপেক্ষা করেছিলো। কন্টিনেন্টাল গাড়ির সাসপেনশনে লাগালে তার বোমা এতোক্ষণে ফেঁটেই যেতো, কিন্তু জাগুয়ারের সাসপেনশন মারাত্মক রকমের সুদৃঢ়। জাতীয় সড়ক ধরে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে মিলারের গাড়ি ফ্রাংকফুর্টের দিকে। রাস্তার ঝাকুনিতে সামনের চাকা দুটোর উপরিস্থিত ভারি স্প্রিংয়ের পাতগুলো সামান্য একটু এগিয়ে আসে; বোমার ট্রগারে রাখা ছোট্ট বাল্বটা কখন ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে অথচ বিদ্যুৎবাহিত ইস্পাত খণ্ড দুটো পরস্পরকে স্পর্শ করলো না। রাস্তার ওপরে উচ্চ স্ফীতির ধাক্কা লাগলে এর এক মিলিমিটার পর্যন্ত কাছাকাছি এসেছে, তারপর আবার সরে গেছে।

মিলার জানতে ও পারলো না মৃত্যুর কতো কাছে কতোবার সে এসে দাঁড়িয়ে ছিলো। ছুটে চললো মুনস্টার, ডর্টমুন্ড, ওয়েৎজলার, বাড হাম্বুর্গ পোরিয়ে। ফ্রাংকফুর্টে এসে পৌছালো তিন ঘণ্টারও কম সময়ে। তারপর রিং রোড ধ'রে কোয়েননিগস্টাইন হয়ে টউনাস পাহাড়ের তুষারবৃত বনজঙ্গলের দিকে ধেয়ে চললো।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১৬

পর্বতমালার পূর্ব পাদদেশে ছোট্ট একটা শহরে যখন জাগুয়ারটা এসে পৌছালো তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাহাড়ি ঝরনার স্বাস্থ্যকর পানির জন্যে শহরটা বিখ্যাত। ম্যাপ দেখে মিলার বুঝলো যে আর মাইল বিশ পথ গেলেই লক্ষ্যস্থানে পৌছে যাবে। অতএব রাতে আর বেশি দূর যাবে না মনস্থ করলো, বরং একটা হোটেল খুঁজে রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দেবে।

হাউপ্ট স্ট্রাস ও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্ট্রাসের মোড়ে একটা হোটেল দেখলো, তার নাম *পার্ক*। ঘর খুঁজতেই পেয়ে গেলো পাহাড়ের স্বাস্থ্যান্বেষীর দল গরম কালেই আসে, ফেব্রুয়ারি মাসে কন্‌কনে ঠাণ্ডা পানিতে কেউ আর স্বাস্থ্য ভালো করতে আসে না। তাই বেশির ভাগ ঘরই খালি ছিলো। পোর্টার জানালো হোটেলের পেছন দিকে গাড়িটাকে রাখতে হবে। সেটার পরেই আছে হোটেলের সীমানা পেরিয়ে বড় বড় গাছ আর ঘন ঝোপ। স্নান ক'রে রাতের খাবার খেতে বের হলো। আসবার সময় হাউপ্ট স্ট্রাসে *এঙ্গ বউম* নামে একটা ভোজশালা দেখে মনে মনে পছন্দ ক'রে এসেছিলো।

খেতে ব'সে মনে হলো কেমন অবশ লাগছে নিজেকে। ক্লান্ত তো বটেই, গত চার দিনে ভালো ক'রে ঘুমও হয়নি, কিন্তু তাছাড়াও বোধহয় আরো কিছু কারণ আছে। হয়তো স্নায়ুর দুর্বলতা। এইতো গত রাতে সিন্দুক ভেঙে এসেছে তার আগে হাসপাতালে মুমূর্ষু বৃদ্ধার সামনে ধর্মের নামে বিশ্রী মিথ্যাচার করলো। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, উইনজারের বাড়িতে আবার ফিরে গেলো, পুরনো পরিচারিকার সাক্ষাৎ পেলো, ফাইলের কথা জানতে পেলো, সিঁদে চোরটাকে খুঁজে পেলো, ফাইলও পেয়ে গেলো, সব যেনো কেমন সুন্দর মিলে যাচ্ছে ঠিক ঠিক। অথচ তাকে বারবার সাবধান ক'রে দেয়া হয়েছে ওডেসার লোকেরা মারাত্মক। ওরা তো জানে যে তার নাম মিলার ড্রিসেন হোটেলের সেই ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। বেয়ারকে মারবার পর কলবের পরিচয় নির্ঘাত ফাঁস হয়ে গেছে। তবু কেউ তো ওর

www.boiRboi.blogspot.com

পিছু নেয় নি। কাউকে দেখতেও পায়নি সে।

তবু ফাইল তো পেয়েছে। উইনজারের গোপন কথাগুলো একেবারে বিস্ফোরক। পশ্চিম জার্মানিতে এই দশকের সবচেয়ে বৃহত্তম সংবাদ। নিজের মনে মনে হাসলো সে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওয়েরট্রেসটা ভাবলো হাসিটি বোধ হয় তার জন্যে। পরের বার ওর টেবিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় পাছা আরো দুলিয়ে চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সিগির কথা মনে পড়ে গেলো মিলারের। ভিয়েনার পরে আর তার সঙ্গে কোন কথা হয়নি, গত জানুয়ারিতে একটা চিটি লিখেছিলো, সেই শেষ। ছয় সপ্তাহ হয়ে গেলো। ওকে কাছে পেতে খুব ইচ্ছে করছে।

মনে মনে ভাবলো, কী আশ্চর্য, ভয় পেলেই নারীসঙ্গের স্পৃহা পুরুষদের মনে আরো প্রবল হয়। ভয় যে পেয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য। কৃতকর্মের জন্যে ভয় তো রয়েছেই, তার ওপর রয়েছে আগামীকাল সকালে নির্জন পাহাড়ি বাংলোতে সেই গণহত্যাকারীটির সঙ্গে চরম সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভয়ের ছায়াটাকে সরিয়ে ফেলতে চাইলো মিলার। দমে যাবার এটা সময় নয়। জীবনে সবচেয়ে বড় সংবাদ স্কুপ করতে চলেছে, তার সঙ্গে শোধবোধের পালাও। আরো আধ বোতল ওয়াইনের অর্ডার দিলো।

দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে পরিকল্পনাটা আরেকবার ভেবে নিলো। সহজ-সরল জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর লুডভিগসবুর্গের উকিলের কাছে একটা টেফিফোন, আধ ঘণ্টা পরে পুলিশ-ভ্যান এসে লোকটাকে ধ'রে নিয়ে যাবে, বিচার এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্যে। শক্ত ধাতের মানুষ যদি হোতো মিলার, তবে এসএস ক্যাপ্টেনকে সে নিজের হাতেই খুন করতো। কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে হলো নিজের কাছে তো কোন অস্ত্র নেই। যদি রশম্যানের কাছে কোন দেহরক্ষী থাকে? একা হয়তো নেই সে, তবে? সাময়িক চাকরির সময় মিলারের এক বন্ধু রাত ক'রে ক্যাম্পে ফেরার জন্যে গার্ড-রুমে বন্দী হয়েছিলো সেই রাতটা, আসবার সময় মিলিটারি পুলিশের হাতকড়া চুরি ক'রে নিয়ে চলে এসেছিলো। পরে তার ভাবনা হলো যে তার কিটব্যাগে যদি মাল খুঁজে পাওয়া যায় তো সর্বনাশ, তাই চুপিচুপি সে সেই হাতকড়া মিলারকে দিয়ে দিয়েছিলো। মিলার সেটা তার কাছে রেখে দিয়েছে সৈন্যজীবনের স্মারক হিসাবে। এখনো তার হাম্বুর্গের ফ্ল্যাটের ট্রাঙ্কের তলায় সেটা আছে।

বন্দুকও আছে একটা – ছোট্ট একটা সাউয়ের অটোমেটিক। সম্পূর্ণ বৈধভাবেই কিনেছিলো সেটা; ১৯৬০ সালে যখন হাম্বুর্গের অপরাধ-চক্র প্রকাশ ক'রে দেবার কাজে ব্যাপৃত ছিলো, তখন ছোট পাউলি দল তাকে ভয় দেছিয়েছিলো, সেটা তখনই কেনা হয়েছিলো। সেটাও হাম্বুর্গে তার টেবিলের দেরাজে তালাবন্ধ আছে।

মদের প্রভাবে সামান্য মাথা ঘুরছিলো। বিল মিটিয়ে হোটেলে চলে এলো। ঘরে ঢুকে ফোন করবে ভেবেছিলো, কিন্তু হোটেলে ঢুকতেই দুটো পাবলিক বুথ দেখে সেখান থেকে ফোন করাই ঠিক করলো। অনেক বেশি নিরাপদ হবে সেটা।

www.boiRboi.blogspot.com

দশটা বাজে প্রায়। সে ক্লাবে কাজ ক'রে সেখানেই সিগিকে পাওয়া গেলো। ব্যান্ডের গান-বাজনার জন্য চেঁচিয়ে ডাকতে হলো মিলারকে।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে গেলো সিগি। কোথায় ছিলো, কি করছে, এতোদিন কোন খবর দেয়নি কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলো সব এড়িয়ে মিলার তাকে বললো সে কি চায়। না, এখন যেতে পারবে না, সিগি বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু মিলারের গলার স্বরে যেনো কি ছিলো, থম্‌কে গেলো সিগি।

লাইনের ভেতর দিয়ে চিৎকার ক'রে প্রশ্ন করলো, "ভালো আছো তো তুমি?"

"হ্যা, ভালোই আছি, কিন্তু তোমার সাহায্য দরকার। লক্ষ্মীটি, না কোরো না। অন্তত এখন না, আজ রাতে না।"

সামান্য বিরতি দিয়ে সিগি শুধু জানালো, "আচ্ছা, আসবো। ওদের না হয় ব'লে দেবো যে ভীষণ জরুরি। নিকট-আত্মীয় বা কিছু।"

"গাড়ি ভাড়া করবার মতো পয়সা আছে তো?"

"আছে বোধহয়, নইলে কোন মেয়ের কাছ থেকে ধার ক'রে নেবো।"

সারারাত গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় ওরকম একটা দোকানের ঠিকানা জানিয়ে দিলো মিলার। বারবার বলে দিলো যেনো তার নাম বলে, মালিকের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে।

"কতো দূর এখান থেকে?" সিগি জানতে চাইলো।

"হাম্বুর্গ থেকে ৫০০ কিলোমিটার। পাঁচ ঘণ্টায় পৌঁছে যাবে, বড়জোর ছয় ঘণ্টা। ভোর পাঁচটায় এসে যাবে। জিনিসগুলো আনতে ভুলো না যেনো।"

"বেশ, আসছি তাহলে।" আবার একটু বিরতি হলো, তারপর বললো "পিটার, ডার্লিং..."

"কি?"

"তুমি কি ভয় পেয়েছো?"

মিটারের সময় শেষ হয়ে যাড়ে তখন, তার কাছে আর এক মার্কের কোন মুদ্রাও নেই।

"হ্যা," বলেই রেখে দিলো ফোনটা, তক্ষুণি সেটা নিজে থেকেও কেটে গেলো।

হোটেলের আপ্যায়ন-কক্ষে রাতের বেয়ারাকে জিজ্ঞেস ক'রে বাদামী রঙের একটা শক্ত বড় খাম আর বেশ কিছু ডাকটিকিট কিনে আনলো। ঘরে ফিরে এসে বৃফকেস খুলে সলোমন টউবেরের ডায়রি, উইনজারের সিন্দুক থেকে পাওয়া ফাইল আর দুটো ছবি বের করলো। ডায়রির সেই পাতা দুটো আবার নতুন ক'রে পড়লো, যা থেকে এই অভিযান স্পৃহা তার জন্মেছিলো। ছবি দুটোকে পাশাপাশি রেখে অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাক্স থেকে তারপরে সাদা কাগজ বের ক'রে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট লেখান লিখলো; যাতে পাঠকের মনে কোন দ্বিধাই না থাকে যে এই ছবিসহ কাগজগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য কি। চিঠি লিখে,

www.boiRboi.blogspot.com

সবগুলো টিকেট লাগিয়ে দিলো। দ্বিতীয় ছবিটা নিজের বুকপকেটে রাখলো।

তারপর বন্ধ খাম আর ডায়রিটা বৃফকেসে রেখে সেটা বিছানার তলায় রেখে দিলো।

সুটকেসের মধ্যে ছোট একটা ফ্লাস্কে ব্র্যান্ডি ছিলো। তা থেকে সামান্য পরিমাণ ঢেলে নিলো। হাত দুটো থরথর ক'রে কাঁপছিলো, কিন্তু তরল আগুন পেটে পড়তেই স্থির হয়ে গেলো তা। বিছানায় শুয়ে পড়লো। মাথাটা ঘুরছে একটু। কিন্তু ক্রমেই নিদ্রায় ঢলে পড়লো সে।

মিউনিখে আন্ডারগ্রাউন্ড কক্ষে জোসেফ জোরে জোরে পায়চারি করছে। ভীষণ রেগে গেছে সে, অধীরও তেমনি। টেবিলে ব'সে ব'সে লিও আর মোট্টি আবার ঘড়ি দেখলো। তেল আভিভ থেকে আসার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেছে।

মিলারকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। টেলিফোনে অনুরোধ করার পর আলফ্রেড অস্টার বেরোথের কারপার্ক ঘুরে এসে জানিয়েছে যে জাগুয়ার গাড়িটা নেই।

খবরটা শুনে জোসেফ গজগজ ক'রে উঠেছিলো। "গাড়িটা দেখতে পেলে ওরা ঠিক বুঝতে পারবে যে ব্রেমেনের রুটি-কারখানার শ্রমিক সে হতেই পারে না। পিটার মিলার ব'লে চিনতেও যদি না পারে তাতে কি?"

পরে স্টুটগার্ট থেকে লিওকে তার এক বন্ধু জানিয়েছিলো যে স্থানীয় পুলিশ বেয়ার নামে একজন নাগরিককে হোটেল-কামরায় হত্যা করবার জন্য জনৈক যুবককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিবরণ শুনে স্পষ্টই বোঝা গেলো যে নিরুদ্দিষ্ট খুনি আর কেউ নয়, কলবের ছদ্মবেশে মিলার। তবে ভাগ্য ভালো যে হোটেলের খাতায় কলব বা মিলার কোন নামই সে লেখায়নি। স্পোর্টস গাড়িরও কোন উল্লেখ নেই।

"অন্তত নাম এড়িয়ে হোটেলে ওঠবার মতো বুদ্ধি তো করেছিলো," লিও বললো।

মোট্টি জানালো, "তা তো করবেই। কল্‌ব যে যুদ্ধ-অপরাধের দায়ে ফেরারী; ব্রেমেনের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরকম অভিনয় তো করতে হবেই।"

কিন্তু তাতে ওদের লাভ কি? স্টুটগার্টের পুলিশ মিলারকে খুঁজে পায়নি ঠিকই, কিন্তু লিও'র দলও তো পায়নি! ওদের মনে বরং আরো ভয় যে ওডেসা হয়তো এতোক্ষণে আরো কাছে এগিয়ে এসেছে।

"বেয়ারকে মারবার পর বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে তার ছদ্মপরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে, তাই আবার মিলার নামে ফিরে গেছে," লিও যুক্তি দেখায়, "কাজেই রশম্যানে অনুসন্ধান ছেড়ে দিতে হয়েছে তাকে, অবশ্য যদি না বেয়ারের কাছ থেকে এমন কোন সূত্র থাকে যা তাকে রশম্যানের পথ সঠিক বাতলে দিয়েছে।"

"তাহলে খবর দিচ্ছে না কেন?" ফুঁসে উঠলো জোসেফ, "গর্দভটা ভাবছে সে

নিজেই একা একা রশম্যানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে, নাকি?"

মোট্টি একটু কেশে উঠে দাঁড়ালো। "ও তো আর ওডেসায় রশম্যানের গুরুত্ব জানে না।"

"জানবে এবার, যদি আরো কাছে এগিয়ে যায়, তবে," লিও বললো।

"ততো দিনে লাশ হয়ে প'ড়ে থাকবে আর আমরা আবার যেখানে ছিলাম সেখানেই এসে পড়বো," জোসেফ গজ গজ ক'রে বললো, "বোকাচোদাটা টেলিফোন করছে না কেন?"

কিন্তু সে রাতে ফোনের লাইন অন্য এলাকায় বেশ ব্যস্ত ছিলো। ক্লস উইনজার টেলিফোন করলো রেগেন্সবুর্গের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নুরেমবার্গে ওয়েরউলফের কাছে। খবর পেয়ে আশ্বস্ত হলো সে।

"বাড়ি ফিরে যেতে পারো তুমি," ওডেসার প্রধান তাকে জানিয়ে দিলো, "যে লোকটা তোমাকে প্রশ্ন করতে এসেছিলো, এতোক্ষণে তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।"

জালিয়াত তাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে এক দিন রাতের বিল মিটিয়ে অন্ধকারের রাজ্য ছেড়ে চললো পরিচিত আলোকের উদ্দেশ্যে – উত্তর দিকে, অসনাব্রুখের পথে। প্রাতরাশের সময়ে পৌঁছে যাবে; বেশ আয়েস ক'রে খেয়ে-দেয়ে গোসল ক'রে একটা ঘুম দেয়া যাবে। সোমবার সকালে আবার ছাপাখানায় পৌঁছে যাবে, আবার নিজের ব্যবসায় গিয়ে সিংহ বনে যাবে।

শোবার ঘরের দরজায় করাঘাতের শব্দে মিলারের ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মিটমিট ক'রে চাইলো, শোবার আগে আলো নেভাতেও ভুলে গিয়েছিলো সে। দরজা খুলে দেখে রাতের বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে সিগি।

মিলার ওকে আশ্বস্ত করলো; ভদ্রমহিলা তার বৌ, বাড়ি থেকে জরুরি কাগজপত্র নিয়ে এসেছে, কাল সকালে ব্যবসার মিটিং আছে তো সেজন্যে। বেয়ারা ছেলেটা সরল সোজা পাহাড়ী বালক, উচ্চারণে এখনো তার দুর্বোধ্য হোসিয়ান টান, হাতের মুঠোয় বখশিশ নিয়ে কেটে পড়লো।

দরজা বন্ধ হতেই সিগি ওর গলা জড়িয়ে ধরলো। "কোথায় ছিলে এতো দিন? এখানে কি করছো? "

প্রশ্নের বাণ থেকে আত্মরক্ষা করলো খুব সহজ উপায়ে। দু'জনে যখন সরে এলো তখন সিগির ঠাণ্ডা গাল দুটোয় রক্তোচ্ছ্বাস আর মিলারের মনে হচ্ছে সে যেনো একটা উত্তেজিত মোরগ ঝুঁটি উচিঁয়ে আছে।

সিগির কোটটা নিয়ে দরজার হুকে ঝুলিয়ে দিলো। কিন্তু আবার প্রশ্ন শুরু হলো।

"উঁহু, এখন নয়, প্রথম জিনিস প্রথমে করা ভালো," মিলার বললো। টেনে

www.boiRboi.blogspot.com

নিয়ে তাকে বিছানায় নিয়ে আসলো। মোটা পালকের গদি তখনো মিলারের দেহের উত্তাপে উষ্ণ। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে সিগি। "একটুও বদলাওনি দেখছি।"

ক্যাবারের পোশাক পরেই চলে এসেছিলো। সামনের দিকে অনেকটা খোলা, তলায় শুধু এক চিলতে ব্র্যা। পিঠের পেছনে জিপ খুলে নিয়ে কাঁধের ফিতা নামিয়ে দিলো মিলার। ঘন নিশ্বাস, শিৎকার, সরব হর্ষধ্বনি...মিলার জানে কিভাবে নারীকে তৃপ্ত করা যায়, সেই সঙ্গে নিজেকেও।

শুরু করলো সিগির পিঠ থেকে। আল্‌তো ক'রে দু'হাতের আঙুল বোলালো সিগির ভেলভেটের মতো নরম শরীরে। শিহরিত হলো সিগি। মেয়েদেরকে আদর করতে হয় বেড়ালের মতো। নরম তুলতুলে শরীরে, আল্‌তো স্পর্শে, ধৈর্য সহকারে। মিলার জানে এ সময় অধৈর্য হতে নেই। সিগির শরীরের আবেশ ছড়িয়ে দেবার জন্যে দু'হাতের আঙুলগুলো আস্তে আস্তে পিঠ থেকে বুকের কাছে নিয়ে এলো। সিগির সুডৌল স্তন দুটো প্রথমে আঙুলের ডগা দিয়ে, পরে একটু শক্ত ক'রে পেষণ করতে শুরু করলো। সিগির শরীরটা বেঁকিয়ে গেলো উত্তেজনায়। স্তনবৃন্তে আঙুলের খেলা চললো কিছুক্ষণ, তার পর, বাম হাতাট নিচের দিকে চলো গেলো। ওখানে আঙুলের সাহায্যে মিলার যা করলো তাতে সিগি এতোটাই কামার্ত হলো যে মিলারকে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, "এসো, আমাকে নাও, মিলার, আর পারছি না"।

এক ঘণ্টা কেটে গেলো। দু'জনেই সুখী, উৎফুল্ল, ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়ছে। ছোট্ট গ্লাসটায় ব্র্যান্ডি আর পানি ঢাললো মিলার। সিগি শুধু দু'চুমুক খেলো, তার এমন পেশা সত্ত্বেও কড়া পানীয়ে সে অভ্যস্ত নয়। বাকিটুকু মিলার গিলে ফেললো নিমেষে।

"তাহলে," সিগি এবার ফোড়ন কাটে, "প্রথম জিনিসটা যখন হয়ে গেলো, তখন..."

"কিছুক্ষণের জন্য," মিলার মাঝখানে বললে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলো সিগি।

"আচ্ছা, না হয় কিছুক্ষণের জন্যই হলো। এখন বলো, ওইরকম একটা রহস্যপূর্ণ চিঠি, ছয় সপ্তাহ একেবারে চুপচাপ, এইরকম অদ্ভুত চুলের ছাঁট আর এখানে এই হেস অঞ্চলের হোটেল – এসবের মানে কি?"

মিলার গম্ভীর হয়ে পড়লো। বৃফকেসটা নিয়ে বিছানার প্রান্তে বসলো, সম্পূর্ণ নগ্ন এখন সে। "জলদিই যখন জানতে পারবে, তখন না হয় বলেই দিচ্ছি।"

এক ঘণ্টা ধ'রে বলে গেলো। ডায়রিটা আবিষ্কারের কথা থেকে আরম্ভ ক'রে জালিয়াতের বাড়িতে সিন্দুক ভাঙা পর্যন্ত। কাগজপত্রগুলোও দেখালো। শুনতে শুনতে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়লো সিগি।

"পাগল তুমি, একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। মারা পড়তে পারতে, জেলে যেতে পারতে, ...কী আশ্চর্য!"

"করতেই হয়েছিলো আমাকে, উপায় নেই।"

www.boiRboi.blogspot.com

"একটা পচা পুরনো নাৎসির জন্যে? তোমার মাথার ঠিক আছে তো? কী অদ্ভুত! এসব তো কবেই চুকেবুকে গেছে পিটার, শেষ হয়ে গেছে। তার জন্যে তুমি সময় নষ্ট করছো...কেন?" অবাক দৃষ্টিতে সিগি চেয়ে রইলো তার দিকে।

"হ্যা, করছি" জেদ ধরে গেছে যেনো মিলারের।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে সিগি। মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চাইলো যে সে বুঝতে পারছে না।

"আচ্ছা তা না হয় হলো," আবার বললো সিগি, "সব তো এখন শেষ। তুমি লোকটার পরিচয় জানো, কোথায় থাকে তাও জানো, হাম্বুর্গে চলে এসো, টেলিফোন ক'রে পুলিশকে জানিয়ে দাও, তারা বাকি কাজ করবে, পুলিশ আছেই তো সেইজন্যে।"

মিলার বুঝতে পারলো না কী বলবে। শুধু বললো, "না, অতো সহজ না। আমি সকালেই ওখানে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাচ্ছো?"

জানালার দিকে দেখিয়ে দিলো মিলার। বাইরে এখনো পুঞ্জীভূত আঁধারের মতো পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে। "ওর বাড়িতে।"

"ওর বাড়িতে? কেন?" ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে সিগির চোখ, "ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছো, অ্যা?"

"হ্যা। কেন তা জিজ্ঞেস করো না, কারণ আমি বলতে পারবো না। তবে কাজটা আমাকে করতেই হবে।"

সিগির প্রতিক্রিয়া তাকে আশ্চর্য ক'রে দিলো। ঝট ক'রে উঠে হাঁটু ভেঙে ব'সে মিলারের দিকে তীব্রবৃষ্টিতে চাইলো মেয়েটি। মিলার তখন বালিশে মাথা উঁচু ক'রে শুয়ে-শুয়ে সিগারেট টানছে।

"সেইজন্যেই তোমার পিস্তলটা দরকার, না?" কথাগুলো ছুঁড়ে দিলো যেনো মিলারের দিকে। রাগে উত্তেজনায় বুকদুটো ওঠা নামা করছে।

"ওকে মারতে যাচ্ছো তুমি..."

"না, ওকে আমি মারতে যাচ্ছি না..."

"তাহলে ও-ই তোমাকে মারবে। আর তুমি সেখানে যাচ্ছো একা, হাতে একটা বন্দুক নিয়ে, ওইরকম একটা লোক, তার ওপর ওর দলবল আছে নিশ্চয়। তুমি একটা খচ্চর, একটা পচা, একটা অদ্ভুত..."

অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকালো মিলার। "অতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন, রশম্যানের জন্যে?"

"ওই বুড়ো নাৎসি শুয়োরটার জন্যে আমার চিন্তা হবে কেন? ওর জন্যে হচ্ছি না। আমি আমার কথা বলছি। তোমার এবং আমার কথা...উজবুক কোথাকার। ওখানে যাচ্ছো খুন হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও কেন না কোন একটা কথা প্রমাণ

www.boiRboi.blogspot.com

করবে, তোমার গবেট পত্রিকার পাঠকদের জন্যে গল্প লিখবে। আমার কথা কি মুহূর্তের জন্যেও তোমার মনে হচ্ছে না...”

কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললো। দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন ঝ'রে গেলো। দু'গাল দিয়ে মাসকারা গড়িয়ে পড়লো কালো রেললাইনের মতো রেখায়।

“আমার দিকে চেয়ে দেখো তো, কী দেখছো? একটা ভোগের মাল, ভোগ ক'রে খুব সুখ, না? সত্যিই কি মনে করো কোন মাথা-খারাপ রিপোর্টারের সঙ্গে রোজ রাতে শুয়ে পড়বো যাতে সে আত্মগরিমায় স্ফীত হয়ে দুলতে দুলতে তার কোন অর্থহীন কাহিনীর পেছনে ছুটবে নিজের প্রাণকেও বিপন্ন ক'রে? সত্যিই তাই ভাবো? তাহলে শোনো বোকা ছেলে, আমি বিয়ে করতে চাই। ফ্রাউ মিলার হতে চাই। সন্তান চাই আমি। আর তুমি কিনা নিজেকে মৃত্যুর হাতে শপে দিতে যাচ্ছো...হায় ঈশ্বর...”

বিছানা থেকে লাফিয়ে এক দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ভেতর থেকে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো সিগি।

মিলার স্থির হয়ে শুয়ে রইলো। সিগারেটটা জ্বলতে জ্বলতে তার আঙুলে এসে লাগলো। সিগিকে কখনো এতো রাগ করতে দেখেনি, হতবুদ্ধি হয়ে গেলো সে।

সিগারেটটা ফেলে বাথরুমের দরজার কাছে চলে এলো মিলার। “সিগি!”

কোনো উত্তর নেই।

“সিগি!”

কলের আওয়াজটা থেমে গেলো। “চলে যাও।”

“সিগি, দরজাটা খোলো, তোমার সঙ্গে কথা আছে!”

একটু পরে দরজার ছিটকিনিটা খুলে গেলো। দাঁড়িয়ে আছে সিগি, সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ, থম্‌থমে মুখ। গাল থেকে মাসকারার কালো রেখা ধুয়ে ফেলেছে।

“কি চাও,” জিজ্ঞেস করলো।

বিছানায় এসো, কথা বলতে চাই। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনেই আমরা ঠাণ্ডায় জ'মে যাবো।”

“না, আবার তুমি ওইসব শুরু করবে।”

“না, কথা দিচ্ছি। কথা বলবো শুধু।” হাত ধরে ওকে বিছানায় নিয়ে এলো। উষ্ণতার স্পর্শে গুঁটিসুটি মেরে সে শুয়ে পড়লো। বালিশের ওপর থেকে দুটো সাবধানী চোখ মেলে মিলারকে দেখতে লাগলো।

সন্দেহঘন কণ্ঠে জানতে চাইলো, “কি কথা, বলো?”

পাশে এসে শুয়ে প'ড়ে মিলার কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞসা করলো, “সিগ্রিড রাহ্‌ন, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?”

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগি বললো, “সত্যি বলছো?”

“হ্যা, সত্যিই বলছি। আগে কখনো কথাটা ভাবিনি, তবে আগে তো তুমি

www.boiRboi.blogspot.com

কখনো এমন রেগেও ওঠোনি।"

"ইশ্..." এমন ভাবে শব্দ ক'রে উঠলো যেনো নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না, "তাহলে তো প্রায়ই রাগ করতে হয় দেখছি!"

আবার জানতে চাইলো মিলার, "আমার প্রশ্নের উত্তর পাবো কি?"

"হ্যা। বিয়ে করবো। দু'জনে আমরা কতো ভালো থাকবো পিটার, দেখো।"

ওকে আবার আদর করতে আরম্ভ ক'রে দিলো মিলার।

"বলেছো কিন্তু, আর ওসব করবে না," সিগি মৃদু প্রতিবাদ জানালো।

"শুধু একবার, ঠিক আছে?"

বেডসুইচটা টিপে আলোটা নিভিয়ে দিলো মিলার।

বাইরে তুষারের প্রান্ত বেয়ে পূব আকাশে সোনালী আলোর রেখা ফুঁটে উঠেছিলো। মিলার যদি তখন ঘড়ি দেখতো তবে বুঝতে পারতো সকাল ছয়টা পঞ্চাশ বেজে গেছে। কিন্তু সে তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

আধ ঘণ্টা পর ক্লস উইনজার তার বাড়ির সামনে বন্ধ গ্যারেজের কাছে এসে গাড়িটা দাঁড় করালো। ভয়ানক পরিশ্রান্ত, কিন্তু বাড়ি পৌছে গেছে। দেখে ভালো লাগছে।

বারবারা তখনো ওঠেনি। মনিবের অনুপস্থিতিতে একটু বেশিই ঘুমিয়ে নিচ্ছে। উইনজার হলঘরে ঢুকে ডাকাডাকি করতেই বেরিয়ে এলো সে। গায়ে স্বচ্ছ নাইটগাউন। অন্য কোন পুরুষ হলে তার শরীর জেগে উঠতো। কিন্তু সে বালাই নেই উইনজারের; তার বদলে সে চাইলো শুধু ভাঁজা ডিম, টোস্ট, জ্যাম, এক কাপ কফি এবং গোসলের ব্যবস্থা। কিন্তু কোনটাই জুটলো না তার ভাগ্যে। বারবারা এক আতংকর কাহিনী বললো। শনিবার সকালে পড়ার ঘরে ঝাড়ামোছা করতে গিয়ে দেখে জানালার কাঁচ ভাঙা, রুপার বাতিদানীটাও নেই। তখনই পুলিশে খবর দিয়েছিলো। তারা কাঁচের ওপর গোলাকার বৃত্তটি দেখে বলেছিলো, নিঃসন্দেহে এটা কোন পেশাদারের কাজ। বারবারার কাছ থেকে যখন তারা শুনলো যে বাড়ির মালিক বাইরে গেছে, বলে গেলো—এলেই যেনো তাদের খবর দেয়া হয়, চুরি-যাওয়া জিনিসপত্র সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার আছে।

মেয়েটির অনর্গল কথা উইনজার চুপচাপ শুনে গেলো। বিবর্ণ হয়ে উঠলো মুখের রঙ, রগের কাছে একটিমাত্র শিরা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। ওকে কফি বানাতে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পড়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো। বুঝতে আধ মিনিটও সময় লাগলো না যে, সিন্দুক থেকে ফাইল উধাও হয়ে গেছে, চল্লিশ জন ওডেসা অপরাধীর নথি আছে যেটাতে। পাগলের মতো সিন্দুক হাতরালো। হতাশ হয়ে যখন সিন্দুকের কাছ থেকে ফিরে আসছে, টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ক্লিনিক থেকে ডাক্তার জানালো, রাতে ফ্রাউলিন ওয়েন্ডেলের মৃত্যু হয়েছে।

www.boiRboi.blogspot.com

পুরো দু'ঘণ্টা উইনজার চেয়ারে ব'সে রইলো। আগুনও জ্বালানো হয়নি। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের হিম ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঘরে ঢুকছে। কোন খেয়াল নেই তার, শুধু মনে হচ্ছে যেনো কঠিন শীতল ক'টা আঙুল তাকে চেপে ধরছে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বারবারা তাকে ডাকছিলো নাস্তা খেয়ে নেবার জন্যে, কিন্তু কে কার কথা শোনে। চাবির ফুটোয় কান পেতে মেয়েটি শুধু শুনলো তার মনিব বারবার ব'লে চলছে, "আমার কোন দোষ নেই, আমার কোন দোষ নেই, আমার কোন দোষ নেই।"

মিলার ভুলে গিয়েছিলো। হাম্বুর্গে সিগিকে ফোন করবার আগে হোটেলে ব'লে দিয়েছিলো যেনো ওকে ন'টায় ডেকে দেয়া হয়। সেই নির্দেশ নাকচ আর করা হয়নি। তাই ঠিক ন'টায় কর্কশ স্বরে ফোনটা বেজে উঠলো। আধখোলা চোখে ফোন ধ'রে বিড়বিড় ক'রে ধন্যবাদ জানিয়ে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামলো। জানতো যে না লাফালে আবার হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। সিগি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ধকল তো কম যায়নি। অতোটা পথ গাড়ি ক'রে এসেছে, তার ওপর আবার প্রেমের ঠ্যালা, এতো দিন পরে বাগদত্তা হতে পারার জন্যে গর্ব এবং আনন্দ, সব মিলিয়ে কাহিল অবস্থা।

গোসল ক'রে নিলো মিলার। শেষের কয়েক মুহূর্ত হিমঠাণ্ডা পানির নিচে দাঁড়িয়ে চট ক'রে সরে গিয়ে গরম তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেললো শরীরটা। সারা রাত তোয়ালেটাকে সে রেডিয়েটারের ওপর রেখে দিয়েছিলো। নিজেকে এখন লক্ষ-কোটি ডলারের মতো দামি মনে হচ্ছে। রাতের চিন্তাভাবনা কোথায় দূর হয়ে গেছে। আত্মবিশ্বাসে এখন ভরে উঠেছে মন।

স্ল্যাক্স আর অ্যাঙ্কেল-বুট পরে নিলো। গলাবন্ধ মোটা সোয়েটার পরে তার ওপরে একটা ডবল ব্রেস্টের নীল ডুফেল ওভারজ্যাকেট চড়িয়ে নিলো। এটি একটি বিশুদ্ধ জার্মান শীতবস্ত্র, নাম *জপ্পে*। কোট আর জ্যাকেটের মাঝামাঝি। দু'দিকে দুটো বেশ গভীর পকেট রয়েছে। পিস্তল আর হাতকড়াটা সেটার মধ্যে বেশ ঢুকে যাবে। ভেতরের পকেটে ছবিটা রাখা যাবে। সিগির ব্যাগ থেকে হাতকড়াটা বের ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখলো। চাবি নেই কোন, আঙটা দুটো ঘুরিয়ে দিলেই বন্ধ হয়ে যাবে, হয় পুলিশ এসে খুলবে, নইলে হ্যাক্‌শ দিয়ে কাটতে হবে।

পিস্তলটাও খুলে পরীক্ষা করলো। কোনদিনও গুলি করেনি, এখনো ভেতরে নির্মাতাদের লাগানো সেই গৃজটুকু রয়ে গেছে। ম্যাগাজিনে গুলি ভরা আছে, সেরকমই রেখে দিতো। অভ্যাস ক'রে নেয়ার জন্যে বৃচটাকে কয়েকবার খুললো, বন্ধ করলো। তারপর সেফটি-ক্যাচের নিয়ন্ত্রণটাও ভালো ক'রে দেখে নিলো। ম্যাগাজিন ভেতরে ভরে চেম্বারে একটা রাউন্ড ঘুরিয়ে সেফটি-ক্যাচ 'অন' ক'রে রাখলো। প্যান্টের পকেটে লুডভিগস্‌বুর্গের উকিলের টেলিফোন নম্বর লেখা

চিরকুটটা রেখে দিলো।

বিছানার তলা থেকে বৃফকেসটাকে তুলে নিয়ে সাদা কাগজে একটা চিঠি লিখলো সিগির জন্যে। ঘুম থেকে উঠলে যাতে দেখতে পায়। লিখলো : 'ডার্লিং, যে মানুষটার পিছু পিছু এতোদূর এসেছি, তার সঙ্গে আমি দেখা করতে যাচ্ছি। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখবার এবং পুলিশ যখন তাকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাবে, তখন সেখানে উপস্থিত থাকবার দরকার আছে আমার। দরকারটা সত্যিই গুরুতর, আজ বিকেলের দিকে তোমাকে জানাতে পারবো। তবে যদি বিশেষ কিছু ঘ'টে যায়, তাহলে তুমি যা করবে তা হলো..."

সংক্ষিপ্ত কিন্তু নির্ভুল নির্দেশ। মিউনিখের যে নম্বরে টেলিফোন করতে হবে সে নম্বরটা লিখে দিয়েছে, ওদিককার লোককে কী বলতে হবে সেটাও লিখে রাখলো। চিঠিটার শেষে লিখলো : 'কোন অবস্থাতেই আমাকে অনুসরণ ক'রে পাহাড়ের ওপরে আসবে না। এলে আরো জটিল পরিস্থিতি হয়ে যাবে, অবস্থা যাই হোক। কাজেই আমি যদি দুপুরের মধ্যে না ফিরি বা তোমাকে কোন টেলিফোন না করি; তুমি ওই নম্বরে টেলিফোন করবে, খবরটা জানাবে, হোটেল থেকে বিদায় নেবে, খামটা ফ্রাংকফুর্টের যেকোন ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে গাড়ি নিয়ে হাম্বুর্গে চলে যাবে। ইতিমধ্যে আর কারো বাগদত্তা হয়ে পোড়ো না যেনো। অনেক ভালোবাসা রইলো তোমার জন্য, পিটার।'

সাড়ে ন'টায় হোটেলের বাইরে চলে এলো সে। অবাক হয়ে দেখলো প্রচুর তুষার পড়েছে রাতে। গাড়ির বুট থেকে একটা ব্রাশ বের ক'রে ছাদ, বনেট আর উইন্ডস্ক্রিন থেকে তুষারের পুরু আস্তর ঝেড়ে ফেললো। স্টার্ট দিলো জাগুয়ারের ইঞ্জিনটা। কয়েক মিনিট সময় লাগলো ইঞ্জিন গরম হয়ে স্টার্ট নিতে। গিয়ারটা তুলে নিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো। রাস্তা ভর্তি বরফ—যেনো তুষারের গদির ওপর দিয়ে গাড়ি চলছে। চাকার তলায় নরম বরফ ভাঙার মচ্‌মচ্‌ শব্দ কানে আসতে লাগলো। ম্যাপে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে লিমবুর্গের দিকে রওনা হয়ে গেলা সে।

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১৭

সেদিনের সকালটা ছিলো খুব ছোট। আকাশ আবার মেঘে ঢেকে গেলো; সকালে ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে গেলো ধূসরতায়। মেঘের তলায় গাছের নিচে ঝক্‌মক্ করছে তুষার, এলোমেলো হাওয়া বইছে পাহাড়ের ওপর থেকে।

শহর থেকে বেরিয়ে রাস্তাটা পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠেছে। তারপরেই হারিয়ে গেছে বৃক্ষরাজির বিশাল সাগরে, রমবার্গ ফরেস্টে। গ্লাসুট্রেনের লিংক রোডটা ধরলো মিলার। উচ্চশীর্ষ ফেল্ডবার্গ পর্বতের কোল বেয়ে চলে এলো স্মিট্রেন-এর পথে। উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে পাইনের বন থেকে হু-হু ক'রে ছুটে আসছে ঝোড়ো বাতাস।

বিশ মিনিট খুব সাবধানে গাড়ি চালিয়ে মিলার আবার ম্যাপ খুলে বসলো। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকালো, কোন ব্যক্তিগত এস্টেটের নির্দেশনামা দেখতে পায় কিনা। যখন পেলো, দেখলো দু'পাল্লার একটা ফটক, লোহার চেইন দিয়ে আঁটকানো; একপাশে ফলক লাগানো *ব্যাক্তিগত সম্পত্তি, প্রবেশ নিষেধ*। ইঞ্জিন চালু রেখে, ঝুকে প'ড়ে হাত বাড়িয়ে পাল্লাটা খুলে ঠেলে দিলো ভেতরের দিকে।

এস্টেটের মধ্যে ঢুকে পথ ধরে এগিয়ে চললো ভেতরে। পথের তুষার সরানো হয়নি। একেবারে লো গিয়ারে চালালো, কারণ বরফের নিচে আছে শুধু জমাট বালি। দুশো গজ এগিয়ে গিয়ে দেখলো বিশাল ওক্ গাছের বড় একটা ডাল প্রায় আধ টন বরফের ভারে ভেঙে পড়েছে। ডান দিকের ঝোপঝাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। গাছের নিচে একটা কালো খাম্বা ছিলো, সেটা উপড়ে প'ড়ে আছে পথের ওপর আড়াআড়িভাবে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে ওটাকে সরানোর চেষ্টা না ক'রে, অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে খাম্বাটার ওপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেলো। সামনের চাকা দুটো পেরিয়ে যাবার পর পেছনে চাকায় সামান্য বাম্প লাগলো।

বাঁধা পেরিয়ে সোজা বাড়ির দিকে চললো। ঝোপঝাড় এখন শেষ হয়ে গেছে, পরিষ্কার একটু জায়গা। তার ওপাশে বাংলো বাড়িটা; দু'পাশের বাগান, সামনে

www.boiRboi.blogspot.com

বৃত্তাকার কাঁকর-বিছানো পথ। সদর দরজার সামনে এসে গাড়িটা থামিয়ে নেমে পড়লো মিলার। ঘণ্টা বাজালো।

মিলার যখন গাড়ি থেকে নামছিলো তখন ক্লস উইনজার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো যে ওয়েরউলফকে ফোন ক'রে জানিয়ে দেবে কি হয়েছে। ওডেসা'র নেতার মেজাজ বিগড়ে আছে। এতোক্ষণে খবর পাওয়া উচিত ছিলো অসনাব্রুখের সড়কে কোন গাড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে পড়ে আছে। খুব সম্ভবত পেট্রল ট্যাংকে আগুন লেগে এমনটি হয়েছে। কিন্তু সেরকম কোন খবর আসেনি। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। টেলিফোনের ওপাশে কথাটা শুনে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

"তুমি কি করছিলো? কি? মূর্খ অকর্মা ঢেঁকি একেকটা। কি অদ্ভুত! ফাইলটা যদি উদ্ধার করা না যায় তোমার কি হবে, জানো?"

ওয়েরউলফ শেষ কিছু কথা বলার পাই অসনাব্রুখে ক্লস উইনজার ফোনটা রেখে টেবিলে গিয়ে বসলো। এখন বেশ শান্ত সে। তার জীবনে দুটো বড় সর্বনাশ ঘটেছে। একবার, যখন হ্রদের পানিতে তার সব যন্ত্রপাতি ডুবিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলো, আর দ্বিতীয়বারটা হলো আজকে। দেরাজ থেকে পুরনো অথচ সক্রিয় লুগার পিস্তলটা বের ক'রে কোন সময়ক্ষেপন না করেই মুখে ঢুকিয়ে ট্রিগারটা টিপে দিলো। সীসার যে গুলিটা তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিলো সেটা কিন্তু নকল ছিলো না।

নিরবে টেলিফোনটার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ওয়েরউল্‌ফ। ক্লস উইনজারের হাত দিয়ে যেসব এসএস ফেরারীদের পাসপোর্ট বানিয়ে দিতে হয়েছে, তাদের নামগুলো একে একে মনে পড়লো। সবাই কোন না কোন অপরাধের জন্যে চিহ্নিত, গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও আছে সবার নামেই, ধরা পড়লে প্রচুর ধরপাকড় হবে; সাধারণ মানুষের মনে এসএস-দের গ্রেপ্তর করা সম্বন্ধে এতোদিনে যে অনীহা জন্মেছে সেটা দূর হয়ে যাবে, লোকে আবার উদগ্র হয়ে উঠবে...দুর্ভোগের পরাকাষ্ঠা!

কিন্তু সবচেয়ে আগে তার কাজ হলো রশম্যানকে বাঁচানো। সে জানে যে উইনজারের তালিকায় তার নাম আছে। তিন বার ফ্রাংকফুর্টের আঞ্চলিক নম্বর ঘুরিয়ে গোপন পাহাড়ী নিবাসের নম্বরটা ঘোরালো, কিন্তু প্রতিবারেই সংকেত পেলো নম্বর পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে অপারেটরকে ব'লে নম্বর চাইতে সে জানলো যে লাইন নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে।

অসনাব্রুখে হোহেনজোলার্ন হোটেলে তখন ফোন ক'রে ঠিক সময়মত ম্যাকেনসেনকে ধরলো। আরেকটু দেরি হলেই সে বেরিয়ে যেতো। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় খবরগুলো জানিয়ে দিয়ে রশম্যানের বাড়ির নির্দেশ দিয়ে দিলো। বললো, "তোমার বোমা কাজ করেনি মনে হচ্ছে। এখন প্রাণপণ শক্তিতে গাড়ি

www.boiRboi.blogspot.com

চালিয়ে ওখানে যাও। গাড়িটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে রশম্যানের কাছে থাকবে। ওখানে অস্কার নামে একজন দেহরক্ষীও আছে। মিলার যদি ফাইল নিয়ে সোজা পুলিশের কাছে যায় তো আমাদের বারোটা বেজে যাবে, কিছুই করার নেই। তবে সে যদি রশম্যানের কাছে আসে, জীবন্ত অবস্থায় তাকে ধরবে, জেনে নেবে কাগজগুলো নিয়ে সে কি করেছে। মারবার আগে খবরগুলো তার কাছ থেকে জেনে নেবেই যে ক'রে হোক।"

ফোন বুথে টাঙানো রাস্তার ম্যাপের দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে ম্যাকেনসেন বললো, "একটার দিকে আমি পৌঁছে যাচ্ছি সেখানে।"

ঘণ্টাটা দু'বারের বার বাজতেই দরজাটা খুলে গেলো। হল থেকে গরম হাওয়ার ঝলক এলো। লোকটা নিশ্চয়ই পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, কারণ মিলার দেখলো হলের ওপাশে একটা দরজা খোলা, পড়ার ঘরে যাবার জন্যে।

একহারা চেহারার সেই এসএস অফিসারটি এখন মোটাতাজা হয়ে গেছে। বহু বছরের আরামে মেদ জুগিয়েছে ভালোই। মুখটা ফোলা-ফোলা, হয় মদের মাত্রার জন্যে, নইলে খোলা হাওয়ার প্রভাবে। দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে। দেখলেই মনে হয়ে মধ্যবয়স্ক, উচ্চমধ্যবিত্ত, স্বাস্থ্যবান এবং বেশ সৌভাগ্যশালী একজন ব্যক্তি। কিন্তু খুঁটিনাটির ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও টউবেরের বর্ণনার সাথে মিলে যাচ্ছে।

গম্ভীর মুখে মিলারকে নিরীক্ষণ ক'রে বললো, কোন ভাবপ্রকাশ নেই চেহারায়, "বলুন?"

কথা বলতে প্রায় দশ সেকেন্ড লেগে গেলো মিলারের। যেগুলো আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছিলো, সেগুলোই মুখ দিয়ে হুট ক'রে বেরিয়ে পড়লো।

"আমার নাম মিলার, আর আপনার নাম এডুয়ার্ড রশম্যান।"

নাম দুটো শোনামাত্র লোকটার চোখে সামান্য ঝিলিক খেলে গেলো কিন্তু দুর্ধর্ষ সংযম তার। মুখে একটুকুও ভাবলেশ হলো না। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো অবশেষে, "অদ্ভুত কথা বলছেন দেখছি। জীবনেও আমি এই নাম শুনিনি।"

এসএস অফিসারটির আপাত শান্ত মুখচ্ছবির পেছনে প্রচণ্ড বেগে তার মন ধেয়ে চলছে। ১৯৪৫-এর পর থেকে জীবনের বহুবার সংকটের সামনাসামনি হতে হয়েছে তাকে। বিপদে তার মাথা ঠিক থাকে ভালোই। মিলারের নামটা চিনতে পারলো, কয়েক সপ্তাহ আগে ওয়েরউল্‌ফের সঙ্গে তার এই বিষয়ের আলোচনাও হয়েছিলো। প্রথমেই মনে হয়েছিলো মিলারের মুখের ওপর দরজাটা লাগিয়ে দেবে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি কোনমতে দমন করলো।

"বাড়িতে একা আছেন আপনি?" মিলার প্রশ্ন করলো।

"হ্যা।" সত্যি কথাই বললো রশম্যান।

"পড়ার ঘরে যাই চলুন," চাঁছাছোলা গলায় মিলার বললো তাকে।

রশম্যান কোন আপত্তি করলো না। কারণ সে জানে মিলারকে আঁটকে রেখে এখন সময় কাটাতে হবে, যতোক্ষণ না...

জুতার গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে ঘুরে গেলো রশম্যান। গটগট ক'রে এগিয়ে গেলো হলঘরের মেঝে দিয়ে। সামনের দরজাটা একটানে বন্ধ ক'রে মিলারও

www.boiRboi.blogspot.com

চললো পিছু পিছু। প্রায় রশম্যানের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। চমৎকার আরামপ্রদ ঘর। দরজায় পুরু ক'রে প্যাড দেয়া আছে, মিলার ঘরে ঢুকেই সেটা বন্ধ ক'রে দিলো। ফায়ারপ্লেসের কাঠের গুঁড়ি জ্বলছিলো।

ঘরের মাঝখানটায় এসে রশম্যান হঠাৎ থেমে গিয়ে মাথা নাড়লো।

"সপ্তাহ-শেষে অবকাশে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেছে।" কাথাটা সত্যি। গত সন্ধ্যায় মুহূর্তের নোটিশে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় গাড়িটা নিয়ে গেছে সে। প্রথম গাড়িটা আবার দূর্ভাগ্যক্রমে গ্যারেজে গেছে মেরামতের জন্যে। মিলারকে এখন তাই কথাবার্তার মধ্যে ব্যস্ত রাখতেই হবে যতোক্ষণ না অস্কার ফিরে আসে।

মিলারের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো সাংবাদিকটির হাতে পিস্তল; সেটা সোজা তার পেটের দিকে উঁচিয়ে আছে। ভয় পেলো রশম্যান কিন্তু দাপট দেখিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

"আমার বাড়িতে আমাকেই পিস্তল তুলে ভয় দেখাচ্ছো?"

"তাহলে পুলিশ ডাকো," তাচ্ছিল্যের সুরে মিলার বললো। হাত দিয়ে ডেস্কের টেলিফোনটা দেখিয়ে দিলো। রশম্যান কিন্তু সেদিকে গেলোই না।

"দেখছি তুমি এখনো সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটো," মিলার মন্তব্য করলো, "অর্থোপেডিক জুতাতে ঢাকা পড়েছে, তবে সবটা নয়। পায়ের আঙুলগুলো হারিয়ে গেলো, রিমিনি শিবিরের অপারেশনে। অস্ট্রিয়ার মাঠে মাঠে ঘুরেই ফ্রস্ট-বাইট হয়েছিলো...তাই না?"

রশম্যানের চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে উঠলো, কিন্তু কোন কথা বললো না।

"পুলিশ যদি আসে তারা সহজেই তোমাকে সনাক্ত ক'রে নেবে, হের ডিরেক্টর। একই রকম মুখ, বুকে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন, বাম বগলের নিচে ক্ষতচিহ্ন, কারণ তুমি সেখান থেকে নিশ্চয়ই ওয়াফেন এসএস-এর ব্লাডগ্রুপের উল্কি তুলে ফেলতে চেষ্টা করেছিলে। ডাকবে নাকি পুলিশকে?"

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রশম্যানের। "কি চাও তুমি মিলার?"

"বোসো," রিপোর্টারটি বললো, "টেবিলে নয়, হাতাওয়ালা চেয়ারটায় যাতে তোমাকে আমি চোখে চোখে রাখতে পারি। হাত দুটোকে হাতলের ওপর রাখো। গুলি করার মতো কোন অজুহাত তৈরি ক'রে দিও না আমায়, কারণ বিশ্বাস করো গুলি করতে আমার খুব ভালো লাগবে।"

হাতাওয়ালা চেয়ারে বসলো রশম্যান। পিস্তলের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। টেবিলের প্রান্তে ব'সে রইলো মিলার তার দিকে চেয়ে। বললো, "আলাপ শুরু করা যাক তাহলে।"

"কি নিয়ে?"

"রিগা। আশি হাজার লোকের সম্বন্ধে—স্ত্রী পুরুষ শিশু—যাদের তুমি সেখানে জবাই করেছিলে, হত্যা করেছিলে।"

মিলার বন্দুক ব্যবহার করতে যাচ্ছে না দেখে রশম্যান আবার স্বস্তি ফিরে পেলো। মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা চলে গেলো তার। মিলারের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলে

www.boiRboi.blogspot.com

বললো, "মিথ্যে কথা। রিগাতে কখনোই আশি হাজারের সমস্যার সমাধান হয়নি।"

"সত্তর হাজার তাহলে? ষাট? সত্যিই কি মনে করো নাকি কতো জনকে হত্যা করেছো তাতে কিছু এসে যায়?"

"সেটাই তো কথা," রশম্যান বললো আন্তরিকভাবেই, "কিছুই এসে যায় না তাতে, না তখন, না এখন। দেখো যুবক, আমি জানি না তুমি আমার পেছনে কেন লেগেছো, তবে আন্দাজ করতে পারি। কেউ নিশ্চয়ই তোমার মাথায় ভাবালুতার প্রচুর বাষ্প ঢুকিয়ে দিয়েছে, যুদ্ধ-অপরাধ আর ওই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে। ওগুলো সব বাজে কথা, স্রেফ বাজে কথা। কতো বয়স তোমার?"

"ঊনত্রিশ।"

"তাহলে মিলিটারি সার্ভিসের জন্যে আর্মিতে ছিলে নিশ্চয়ই?"

"হ্যা। যুদ্ধোত্তর আর্মির প্রথম জাতীয় সেবক দলে ছিলাম। দু'বছর ইউনিফর্ম পরে কাটিয়েছি।

"তাহলে তো তুমি জানো আর্মি জিনিসটা কি। হুকুম যা দেয়া হয়, তোমাকে সেটা পালন করতেই হবে। কোন প্রশ্নই নেই, ভালো না মন্দ। আমিও হুকুম পালন করেছি মাত্র।"

"না," ধীর স্বরে মিলার বললো, "তুমি তো সৈনিক ছিলে না। তুমি ছিলে জল্লাদ। আরো সহজ ক'রে বলতে গেলে কসাই, পাইকারিভাবে হত্যা করবার কসাই। কাজেই সৈন্যদের সঙ্গে নিজের তুলনা কোরো না।"

"বাজে কথা," রশম্যান আবার বললো, "একেবারেই বাজে কথা। আমরাও অন্যদের মতোন সৈন্যই ছিলাম। তাদের মতো আমরাও হুকুম পালন করতাম। তোমরা তরুণ জার্মানরা সবাই একরকম। কেউ বুঝতেও চাও না, তখন কি অবস্থা ছিলো।"

"বেশ, বলো শুনি, কি অবস্থা ছিলো?"

কথাগুলো বলতে বলতে রশম্যান চেয়ার থেকে একটু ঝুঁকে এগিয়ে এসে আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। বেশ আয়েসী ভঙ্গি, বিপদের সম্ভাবনা তো কেটে গেছে।

"কি অবস্থা ছিলো? জগৎকে শাসন করবার মতো মানসিকতা। আমরা জার্মানরা তো পৃথিবীকে শাসন করেও ছিলাম। ওরা যতো আর্মি পারে সব আমাদের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছে কিন্তু সবাই আমাদের সামনে পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। বহু বছর ধ'রে ওরা আমাদের দাবিয়ে রেখেছিলো, আমরা হতভাগ্য জার্মানরা। কিন্তু আমরা ওদের শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দিয়েছিলাম—ওদের সবাইকেই—যে আমরা এক মহান জাত। তোমরা আজকালকার ছেলেমেয়েরা বুঝতেও চাও না, জার্মান হবার মধ্যে অহংকার করবার কী আছে।

"হৃদয়ে আগুন জ্বলে ওঠা। দামামার আওয়াজ, বাদ্যের বাজনা, পত্‌পত্‌ ক'রে দুলছে নিশান, একটি মাত্র লোকের পেছনে গোটা জাতি এক হয়ে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমরা মার্চ ক'রে চলে যেতে পারতাম। এরই নাম হলো মহান জাতীয়তা, বুঝলে যুবক, যে জাতীয়তার উপলব্ধি তোমরা কখনো করোনি,

www.boiRboi.blogspot.com

কখনো করতে পারবেও না। আর আমরা এসএস-এর লোকেরা ছিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ, এখনো সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্য এখন ওরা আমাদের ধাওয়া ক'রে বেড়ায়, প্রথমে মিত্রশক্তিরা, তারপর বনের এই ছিচকাঁদুনে বুড়োগুলো। ওরা আমদের গুড়িয়ে দিতে চায়। তার কারণ ওরা জার্মানির মহত্ত্বকে ধ্বংস করতে চায়, আর সেই মহত্ত্বে আমরা দীক্ষিত ছিলাম, এখনো আছি।

"কয়েকটা শিবিরে কি ঘটেছিলো তাই নিয়ে কী নাচানাচি ওদের, কতো কথা, অথচ, যদি বুদ্ধিমান হোতো তো কবেই সেই সামান্য ঘটনাগুলো ভুলে যেতো। ইউরোপকে ইহুদি নোংরামি থেকে মুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলাম ব'লে কি কান্না তাদের! অথচ এই ইহুদি নোংরামির পঙ্কিলতা জার্মান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গিয়ে ঢুকেছিলো, তাদের সঙ্গে আমাদেরও নরকের কীট বানিয়ে রেখেছিলো। কাজেই মুক্তির জন্যে তাদেরকে দু'হাতে ধুয়ে সাফ করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। জার্মান জাত রক্তে এবং আদর্শে খাঁটি। জগৎকে শাসন করা ছিলো তাদের মৌলিক অধিকার, আমাদের মৌলিক অধিকার। অতএব সেই জার্মান জাতি এবং তাদের পিতৃভূমি জার্মানিকে আরো উন্নতর ক'রে তোলার যে মহান প্রচেষ্টা, তাতে ইহুদি নিষ্কাশন তো ছিলো এক নেহাত ক্ষুদ্র পার্শ্বভূমিকা। মিলার, জগতে আমরা সত্যিই শ্রেষ্ঠ হতাম যদি না ওই নারকীয় বৃটিশ কীটগুলো এবং চির মূর্খ আমেরিকানরা আমাদের কাজে নাক না গলাতো। ভুলে যেয়ো না, আমার বিরুদ্ধে যতো কলঙ্কের ইতিহাসই চাপিয়ে দাও না, তুমি এবং আমি দু'জনেই জার্মান। এবং আমরা জার্মানরা হচ্ছি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আমাদের একসময় যে মহত্ত্ব ছিলো এবং কোন-না কোন দিন যা আবার হবে, সেই সব গুণের বিশ্লেষণ করতে ব'সে কতোগুলো হতচ্ছাড়া ইহুদির ভাগ্যে কী ঘটেছিলো সেইটাই তোমার বিচারের সবচেয়ে বড় হয়ে উঠলো? বুঝতে পারছো না, বিপথচালিত মূর্খ, আমরা একই দিকে, তুমি এবং আমি, একই দলে আমরা, একই জাতি, একই ভাগ্য।"

পিস্তল তার দিকে উঁচিয়ে আছে জেনেও চেয়ার ছেড়ে উঠে রশম্যান টেবিল এবং জানালার মাঝামাঝি জায়গাটুকুতে পায়চারি ক'রে বেড়ালো।

"আমাদের মহত্ত্বের নিদর্শন চাও তুমি? তাকিয়ে দেখো আজ জার্মানির দিকে। ১৯৪৫-এ আমরা টুকরো টুকরো হয়ে গুড়িয়ে গিয়েছিলাম, আমাদের কাঁধের ওপর তখন পূর্বদেশ থেকে কতোগুলো বর্বর আর পশ্চিম থেকে কতোগুলো আহাম্মক চেপে বসেছে। আর আজ? জার্মানি আবার উঠছে, ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবেই উঠছে। যতোটুকু নিয়মানুবর্তিতা দেশের পক্ষে আবশ্যক তা দিতে না পারলেও, প্রতি বছর আমাদের শিল্প এবং আর্থিক ক্ষমতা আমরা বাড়িয়েই তুলছি। কোন সন্দেহ নেই তাতে। সামরিক প্রভাব আমরা একদিন ফিরে পাবোই। যেদিন ১৯৪৫-এর মিত্রশক্তির প্রভাব আমরা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারবো, আবার আমরা তেমনিই শক্তিধর হবো। সময় লাগবে বটে, নতুন নেতাও প্রায়োজন হবে, তবে আদর্শ থাকবে সেই একই—সেই চিরায়ত...হ্যা, আবার তা আসবে।

"আর জানো কি ক'রে তা সম্ভব হবে? আমি বলছি, শোনো। নিয়মনিষ্ঠা এবং ব্যাবস্থাপনা। কঠোর নিয়মনিষ্ঠা, যতো কঠোর ততো ভালো। আর ব্যবস্থাপনা...উচ্চ

www.boiRboi.blogspot.com

সদগুণ আছে জার্মান-চরিত্রে, সাহস তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম, ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয়। ব্যবস্থা করতে যে আমরা সুদক্ষ তার অগুণতি প্রমাণ আছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখো, কি দেখছো? এই বাড়ি, এই এস্টেট, রূঢ় অঞ্চলে এই কারখানা খনি এবং অযুত-নিযুত এই ধরনের বৈভব, দিনের পর দিন তারা শক্তি এবং ক্ষমতা উদগীরণ ক'রে চলেছে। চক্রের প্রতিটি ঘর্ষণে তিল-তিল শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে যা আবার জার্মানিকে ক্ষমতাবান ক'রে তুলবে।

"আর কারা এইসব ক'রে তুলেছে তুমি ভাবো? বানচোত ইহুদিগুলোর ওপর সহানুভূতি দেখিয়ে যারা বক্তৃতা দিচ্ছে তারা? যেসব কাপুরুষ দেশদ্রোহী সৎ দেশপ্রেমিক জার্মান সৈনিকদের ধাওয়া ক'রে বেড়াচ্ছে তারা? না, আমরা করেছি, আমরাই জার্মানিতে সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছি, সেই লোকগুলোই যারা বিশ-ত্রিশ বছর আগে দেশে ছিলো।"

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে মিলারের দিকে চাইলো, চোখগুলো ধক্‌ধক্ ক'রে জ্বলে উঠছে এখন। ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা ভারি লোহার শিকটা কতো দূরে আছে সে হিসাবও ক'রে নিলো চোখ দিয়ে। মিলার তার চোখের সেই দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে দেখলো।

"আর এখন জার্মান যুব সমাজের প্রতিনিধি হয়ে তুমি কিনা এসেছো একটা বন্দুক নিয়ে আমার কাছে? তোমার নিজের দেশ জার্মানি, তোমার নিজের জাত জার্মান জাত, তাদের সম্বন্ধে কোন আদর্শ নেই তোমার, কোন কর্তব্য নেই? তুমি হয়তো ভাবছো আমাকে ধরতে এসে তুমি জনগনের ইচ্ছাপূরণ করছো? সত্যিই কি তাই, জার্মানির জনগন কি তাই চায়?"

মিলার মাথা নাড়লো। "আমি তা মনে করি না।"

"তবে? পুলিশ ডেকে যদি আমাকে ধরিয়েও দাও তারা হয়তো একটা বিচারের অনুষ্ঠান করবে। 'হয়তো' বলছি এই কারণে যে সে সম্বন্ধে আমিও নিশ্চিত নই। করলেও এতোদিন পরে বিচার, সাক্ষীপ্রমাণ কোথায় চলে গেছে, মরেও গেছে অনেকে। অতএব লক্ষ্মীছেলেন মতো পিস্তলটা নামিয়ে রেখে বাড়ি চলে যাও। বাড়িতে গিয়ে সেইসব দিনের সত্য ইতিহাস পড়ো। দেখবে জার্মানির তৎকালীন মহত্ত্ব এবং আজকের সচ্ছলতার কারণ—আমার মতো দেশপ্রেমিক জার্মানরা।"

মিলার চুপচাপ ব'সে বক্তৃতা শুনছিলো। লোকটার ওপর বিতৃষ্ণা ক্রমে বেড়ে উঠছে, হতভম্ব হয়ে গেছে যে তাকে সেই পুরনো আদর্শবাদের পাঠ দিচ্ছে! উত্তরে অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলো; পরিচিত সাধারণ জার্মান মানুষদের কথা, যাদের কখনোই লক্ষ-কোটি মানুষকে হত্যা ক'রে মহান হবার কোন প্রয়োজনীয়তা বোঝে না বা চায়ও না। কিন্তু কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বের হলো না। দরকারের সময় সেগুলো আসেও না সাধারণত। তাই সে শুধু চুপচাপ ব'সে শুনে গেলো।

রশম্যানের কথা শেষ হবার পর কয়েক মিনিট স্তব্ধতা কাটিয়ে মিলার বললো, "টউবের-এর নামে কাউকে চেনো?"

"কে?"

"সলোমন টউবের। সেও জার্মান ছিলো, তবে ইহুদি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

লোকটা রিগাতে ছিলো।"

কাঁধ ঝাঁকালো রশম্যান। "মনে পড়ছে না, কতোদিনের কথা। কে সে?"

"ব'সে পড়ো," মিলার বললো, "আর এবার থেকে বসেই থাকবে, নড়াচড়া করবে না।"

অধীরভাবে কাঁধ দুলিয়ে চেয়ারে বসলো রশম্যান। মিলার যে গুলি করবে না সে বিষয়ে এখন সে নিশ্চিন্ত, তাই এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না সে।

"গত বছর ২২শে নভেম্বর তারিখে হাম্বুর্গে টউবের মারা গেছে। গ্যাসে আত্মহত্যা করেছিলো সে। শুনছো কি, কি বলছি?"

"হ্যা, শুনতে যখন হবেই, বলো।"

"সে একটা ডায়রি রেখে গেছে। তাতে লেখা আছে তার নিজের কাহিনী; তুমি এবং অন্যেরা কি কি করেছিলে তাদের ওপর, রিগাতে এবং অন্যান্য জায়গায়। মূলত রিগাতে। তবে জীবিত অবস্থায় আসতে পেরেছিলো সে। হাম্বুর্গে ফিরে আঠারো বছর সেখানে বাস করেছিলো। মরলো তার কারণ সে নিশ্চিত হয়েছিলো যে তুমি বেঁচে আছো আর তোমার কোনদিন বিচার হবে না। সেই ডায়রি আমার হাতে এসেছিলো এবং সেই থেকেই তোমার খোঁজ শুরু করেছিলাম। আর আজকে আমি তোমাকে তোমার নতুন নামে পেয়েছি।"

"মৃত ব্যক্তির ডায়রির কোন সাক্ষ্যমূল্য নেই," রশম্যান গর্জে উঠে বললো।

"কোর্টে না থাকলেও আমার কাছে আছে।"

"সত্যিই কি তুমি এসেছো একটা মৃত ইহুদির ডায়রি নিয়ে আমার সঙ্গে লড়াই করতে?"

"না, তা নয়। একটা পৃষ্ঠা আছে সেই ডায়রিতে, আমি চাই তুমি সেটা পড়ো।"

ডায়রির একটা পৃষ্ঠা খুলে ছুঁড়ে দিলো রশম্যানের কোলে।

"তুলে নাও," আদেশ করলো মিলার, "পড়ো, জোরে জোরে।"

রশম্যান পৃষ্ঠাটি খুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলো। এটা ডায়রির সেই অংশ যেখানে টউবের বর্ণনা দিয়েছে কি ক'রে রশম্যান একজন অজ্ঞাতনামা জার্মান আর্মি অফিসারকে হত্যা করেছিলো; অফিসারটি বুকে শোভা পাচ্ছিলো ওক্‌পাতার গুচ্ছসমেত নাইট্‌স্ ক্রশ।

পরিচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত প'ড়ে রশম্যান চোখ তুলে তাকালো। বুঝতে পারলো না যেনো কি ব্যাপার, হতভম্ভ ভাব। জিজ্ঞাসা করলো, "তাতে কি? লোকটা আমাকে মেরেছিলো। আদেশ লঙ্ঘন করেছিলো সে। ওই জাহাজ চালানোর অধিকার আমার ওপর ছিলো, বন্দীদের নিয়ে আসবার জন্যে।"

একটা ছবি রশম্যানের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিলো মিলার। "এই লোকটাকে হত্যা করেছিলে তুমি?"

"কি ক'রে বলবো? বিশ বছর আগের কথা।"

মিলারের মুখে ধীরে ধীরে সঙ্কল্পের দৃঢ় আভাস ফুঁটে উঠলো। পিস্তলের হ্যামার পেছন দিকে টেনে দিয়ে নলটাকে মুখের ওপর উঁচিয়ে ধরলো।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

"এই লোকটাই কি?"

"উনি আমার বাবা," মিলার বললো।

রশম্যানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। মুখটা ঝুলে পড়লো। চোখের সামনে শুধু দুই ফুট দূরে একটা উদ্যত পিস্তলের নল, আর তার পেছনে একটা দৃঢ় হাত।

"হায় ঈশ্বর," অস্ফুট কণ্ঠে বললো,

"না, তাদের জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু অতোটা দুঃখিত নই।"

"কিন্তু তুমি কি ক'রে জানতে পারলে? ওই ডায়রি থেকে কি ক'রে জানলে যে ওই লোকটা তোমার বাবা? আমি কোনদিন তার নাম জানতে পারিনি, যে ইহুদিটা এই ডায়রি লিখেছে সেও জানতো না, তুমি কি ক'রে জানলে?"

"আমার বাবা ১৯৪৪-এর ১১ই অক্টোবর অস্টল্যান্ডে নিহত হয়েছিলেন," মিলার বললো, "দীর্ঘ বিশ বছর ধরে শুধু এইটুকুই আমি জানতাম। তারপর আমি ডায়রিটা পড়ি। সেই একই জায়গা, একই তারিখ, দু'জনের একই র‍্যাংক। তাছাড়া দু'জনের বুকেই রয়েছে ওক্‌পাতার গুচ্ছওলা নাইট্‌স্ ক্রশ, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার জন্যে সর্ব্বোচ্চ পদক। খুব বেশি লোককে তো এই পদক দেয়া হয়নি, আর্মি ক্যাপ্টেনদের মধ্যে তো সামান্যই। কাজেই একই দিনে একই অঞ্চলে দু'জন এরকম লোকের মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা খুবই কাকতালীয় ব্যাপর।"

রশম্যান বুঝলো তর্ক ক'রে লাভ নেই। তাকিয়েই রইলো পিস্তলের দিকে।

"তুমি আমাকে হত্যা করবে? কোরো না, ঠাণ্ডা মাথায় এরকম হত্যা তুমি কোরো না। প্লিজ, মিলার, আমি মরতে চাই না।"

মিলার সামনে ঝুঁকে পড়ে বলতে শুরু করলো :

"শোন্, নরকের কীট! তোর বক্তৃতা শুনে আমার গা গুলাচ্ছে। এখন তুই শোন্, যতোক্ষণ না আমি তোকে না মারছি তুই বেঁচে থাকবি। জীবনের বাকি দিনগুলো জেলে পচে মরবি। শোন্...সাহস ক'রে তো খুব বলছিলি তোরা সব দেশপ্রেমিক জার্মান! বাগাড়ম্বরের অভাব নেই তোদের। আমি বলছি তোরা কি। নর্দমার পোকা তোরা, নালী থেকে উঠে দেশের ক্ষমতার আসনে বসেছিলি। বারো বছর ধ'রে তোদের নোংরামি এমন ক'রে দেশের মুখে মাখিয়েছিস যা ইতিহাসে কখনো ঘটেনি।

"তোরা যা করেছিলি তাতে সভ্যজগৎ শিউরে উঠেছিলো, আর আমাদের দিয়ে গেছিস সেই জঘন্য অপরাধের লজ্জা, সারা জীবন আমাদের তা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। জীবনভর তোরা জার্মানির ওপর থুথু ছিটিয়েছিস। তোদের মতো বেজন্মারা জার্মানির আর জার্মান জনগণকে শুষে শুষে ছিব্‌ড়ে ক'রে দিয়েছে। তারপর যখন আর শোষণ করা গেলো না, দিন থাকতে কেঁটে পড়লি। এতো নিচে আমাদের নিয়ে এসেছিলি যে, বিশ্বাস করা যায় না। সাহস কোথায় ছিলো তোদের? তোদের মতো কাপুরুষ জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায় আর কখনো জন্মায়নি। নিজেদের লাভের জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিনা দ্বিধায় খুন করেছিস। আর তারপর পালিয়ে এলি লেজ গুটিয়ে; আর্মির লোকদের ধ'রে ধ'রে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিস, গুলি করেছিস যাতে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যায়, আর তোরা পালালি।

"ইহুদি এবং অন্যদের ওপর যা করেছিলি তা যদি বিস্মৃতির তলে তলিয়ে যায়-ও, তবু কেউ ভুলবে না কি ক'রে তোরা কুকুরের মতো পালিয়ে গিয়ে গর্তে ঢুকেছিলি। দেশপ্রেমের কথা বলছিলি না, সেটার মানে জানিস? আর কামেরাড ব'লে ডাকছিস, আস্পর্ধা তোদের কম নয়।

"আরেকটা কথা আমি ব'লে দিচ্ছি জার্মান যুবসমাজের হয়ে, যাদের তোরা অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করিস। আমাদের আজ যে সচ্ছলতা এসেছে দেশে তাতে তোদের কোন হাত নেই। যে সমস্ত লক্ষ-লক্ষ লোক দিনভর খেটে মরে, জীবনে যারা কাউকে কোনদিন হত্যা করেনি, তাদেরই পরিশ্রমের ফসল এটা। কিন্তু তোদের মতো খুনি বদমাশ যারা এখনো সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে যদি সচ্ছলতার কমতি হয়ে যায় কোথাও একটু, পরোয়া নেই, তোদের আমরা উচ্ছেদ করবোই। তুইও আর বেশিক্ষণ টিকে থাকবি না।"

"আমাকে মেরে ফেলবে?" বিড়বিড় ক'রে বললো রশম্যান।

"না।"

পেছন দিকে গিয়ে টেলিফোনটা টেনে নিলো। দৃষ্টি এবং পিস্তল দুটোই রশম্যানের ওপর। ডায়াল ঘুরিয়ে বললো, "লুডভিগস্‌বুর্গে জনৈক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।" রিসিভার কানে তুলে নিলো। নিরব সেটা।

আবার ক্র্যাডলটা তুলে কানে লাগালো। কোন ডায়াল-টোন নেই।

"তার কেটে দিয়েছিস?"

রশম্যান মাথা দোলালো।

"যদি কানেক্‌শন কেটে দিয়ে থাকিস তো এখানেই আমি তোকে খুন করবো।"

"না, কাটিনি, সকাল থেকে ফোন ধরিনি, বিশ্বাস করো।"

ওক্‌গাছের ভূপাতিত শাখাটি আর মাটিতে প'ড়ে-থাকা টেলিগ্রাফ খাম্বার কথাটা মনে পড়লো মিলারের। মৃদু কণ্ঠে গালি দিয়ে উঠলো। একটু হাসলো রশম্যান। "লাইন নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে। গ্রামে যেতে হবে তোমাকে। তাহলে কি করতে যাচ্ছো এখন?"

"একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে যাচ্ছি তোর শরীরে যদি না আমার কথা শুনিস্।" গর্জে উঠলো মিলার। পকেট থেকে হাতকড়াটা বের ক'রে নিলো; আগে ভেবে রেখেছিলো ওটা দিয়ে দেহরক্ষীটাকে কাবু করবে।

ছুঁড়ে দিলো সেটা রশম্যানের দিকে।

"ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে যা।"

ঠিক ওর পেছনে পেছনে অনুসরণ ক'রে মিলারও এলো।

"কি করতে যাচ্ছো?"

"ফায়ারপ্লেসের সঙ্গে তোকে বেঁধে গ্রামে গিয়ে ফোন করবো।"

ফায়ারপ্লেসের চার দিকে পেটা লোহার বাঁকানো কারুকাজ দেখতে থাকে মিলার। ঠিক তক্ষুণি হাতকড়াটাকে পায়ের কাছে ফেলে দিলো রশম্যান। এসএস'র লোকটা সেটা তুলে নেবার জন্যে নিচু হলো, নিচু হয়েই চট ক'রে লোহার একটা শলাকা তুলে মিলারের হাঁটু লক্ষ্য ক'রে মারলো কিন্তু মিলার সরে গেলে শলাকাটি

www.boiRboi.blogspot.com

সাঁই ক'রে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, রশম্যানও টাল রাখতে গিয়ে একপাশে ঝুঁকে পড়লো। দু'পা সামনে এসে মিলার সঙ্গে সঙ্গে রশম্যানের নুয়ে পড়া মাথায় পিস্তলের বাট দিয়ে একটা আঘাত করলো। পিছিয়ে গিয়ে বললো, "আরেকবার চেষ্টা ক'রে দেখ, সোজা গুলি করবো।"

খাড়া হয়ে দাঁড়ালো রশম্যান, মাথার আঘাতের চোটটা সামলাতে চোখ মুখ কুঁচকে উঠলো তার।

"ডান কব্জিতে একটা কড়া আঁটকে নে," মিলার হুকুম করলো। রশম্যান ঠিক তাই করলো। "তোর সামনে ওই যে লোহার আঙুরলতা, দেখতে পাচ্ছিস? মাথা-সমান উঁচুতে। ওখানে একটা মোটা শাখা এসে লোহার পাতে আঁটকেছে, ওটার সঙ্গে দ্বিতীয় কড়াটা লাগিয়ে নে।"

টুক ক'রে দ্বিতীয় আঙটাটা লেগে গেলো। কাছে গিয়ে মিলার তখন আঙটা, শলাকা সব লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিলো যাতে রশম্যান সেগুলো নাগালে না পায়। রশম্যানের জ্যাকেটের ওপর বন্দুকটা ধ'রে তার দেহ তল্লাশি করলো। আশাপাশ থেকে ছোটখাটো জিনিসগুলোও সরিয়ে ফেললো যাতে ছুঁড়ে মেরে জানালা না ভাঙতে পারে রশম্যান।

পথ বেয়ে ঠিক তক্ষুণি অস্কার নামে একটি লোক সাইকেলে জোরে জোরে প্যাডেল করতে করতে আসছিলো। ফোনে লাইন অকেজো হয়ে যাবার সংবাদ দিয়ে এসেছে সে। জাগুয়ারটাকে দেখে পলকের জন্যে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। কারো তো আসবার কথা ছিলো না।

বাড়ির দেয়ালের গায়ে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে নিঃশব্দে সদর দরজা দিয়ে ঢুকলো। হলঘরে এসে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। পড়ার ঘরের আস্তর দেয়া দরজা ভেদ ক'রে কোন শব্দই আসে না। ভেতরের লোকেরাও তার অস্তিত্ব টের পায় না।

মিলার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। বেশ তৃপ্ত সে এখন। রশম্যান অক্ষম ক্রোধে ফুঁসছে। তার দিকে তাকিয়ে বললো, "প্রসঙ্গত একটা সংবাদ তোকে জানিয়ে রাখি। আমাকে যদি তখন কোনক্রমে আহত করতিও, তাহলেও কোন লাভ ছিলো না তোর। এখন এগারোটা বাজে; বারোটার মধ্যে আমি যদি কোন একটা জায়গায় না ফিরি বা টেলিফোন না করি, তবে আমি আমার এক লোককে বলে এসেছি, তোর সম্বন্ধে পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণসহ নথিটা ডাকবাক্সে ফেলে দেবে। কর্তৃপক্ষের ঠিকানাও লিখে রেখে এসেছি খামের ওপর। আমি এখন গ্রামে যাচ্ছি ফোন করতে, বিশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো। তুই কোনমতেই বিশ মিনিটে ছাড়া পেতে পারবি না, হ্যাক্‌শ দিয়ে ঘষলেও না। আমি ফিরে আসবার আধ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ চলে আসবে।"

মিলার যতোক্ষণ কথা বলে যাচ্ছে রশম্যানের মনে আশার আলো ততোই বেড়ে উঠছে, যেনো নেভার আগে প্রদীপের অন্তিম প্রচেষ্টা। জানতো একটি মাত্রই সুযোগ আছে অস্কার যদি ফিরে এসে মিলারকে জ্যান্ত অবস্থায় বন্দী করতে পারে, তাহলে গ্রামের কোথা থেকেও জোর ক'রে ওকে দিয়ে টেলিফোন করানো যাবে না আর। মাথার ওদিকে ম্যান্টেলপিসের ঘড়িতে তাকালো। দশটা চল্লিশ বাজে।

এক ঝট্‌কায় দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তেই দেখে চোখের সামনে গোল-গলা সোয়েটার গায়ে তার চেয়েও লম্বা একজন মানুষ। ফায়ারপ্লেসের পাশ থেকে রশম্যান মুহূর্তেই অস্কারকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলো, "ধরো ওকে।"

ঘরের মধ্যে দু'পা পিছিয়ে এসে মিলার বন্দুকটা তাক্ করতে গেলো কিন্তু খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। অস্কারের একটা ঘুষিতে তার হাত থেকে পিস্তলটা ছিট্‌কে মেঝের উপর পড়ে গেলো। অস্কার তার মনিবের চিৎকার ক'রে বলা কথাটা শুনেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ঘুষি এসে মিলারের চোয়ালে লাগলো। একশো সত্তর পাউন্ড ওজন সত্ত্বেও রিপোর্টারটি সেই ঘুষিতে ভারসাম্য হারিয়ে অনেকটা পেছনে গিয়ে ধরাশায়ী হলো। পড়তে পড়তে পা দুটো একটা নিচু কাগজ রাখবার তাকে আঁটকে যেতেই মাথাটা গিয়ে কাঠের আলমারির একটা কোণে ধাক্কা খেলো। কাগজের পুতুলের মতো গড়িয়ে পড়লো সে মেঝের কার্পেটের ওপর।

কয়েক মুহূর্ত সব চুপচাপ। অস্কার দেখলো, তার মনিব ফায়ারপ্লেসের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা আর রশম্যান দেখলো মিলারের অনড় দেহ পড়ে আছে কার্পেটের ওপর, মাথার পেছন থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে মেঝেতে পড়ছে।

সম্বিৎ ফিরে আসতেই রশম্যান চেঁচিয়ে বললো, "এদিকে আসো।"

বিশাল দানবটা হেলে-দুলে এসে ঘরের এপাশে দাঁড়ালো। রশম্যান খুব তাড়াতাড়ি ভেবে নিয়ে বললো, "এই হাতকড়াটা খোলার চেষ্টা করো। আগুনের লোহাগুলো কাজে লাগাও।"

কিন্তু ফায়ারপ্লেসেরটা সেই যুগের তৈরি যখন কারিগরেরা জিনিস বানাতো বেশি দিন টিকবে ব'লে। অস্কারের চেষ্টার ফলে শুধু একটা লোহার শলা থেব্‌ড়ে গেলো আর সাঁড়াশি জোড়া গেলো বেঁকে।

এটা দেখে রশম্যান বললো, "ওকে নিয়ে আসো তো এখানে।"

অস্কার মিলারের দেহটাকে তুলে ধরতে রশম্যান তার চোখের পাতা টেনে নাড়ি দেখে বললো, "এখনো প্রাণ আছে, তবে কাহিল হয়ে গেছে। ডাক্তার যদি দেখানো যায় তাহলে অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটু সেরে উঠবে। একটা পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে আসো।"

বাম হাত দিয়ে কাগজটায় দুটো ফোন নম্বর লিখলো। সিঁড়ির তলা থেকে অস্কার একটা হ্যাক্‌শ নিয়ে এসে রশম্যানকে দিলে রশম্যান তার হাতে কাগজটা দিয়ে বললো, "যতো তাড়াতাড়ি পারো গ্রামে যাও। নুরেমবার্গের এই নম্বরে টেলিফোন ক'রে ডাক্তারকে বলবে এক্ষুণি আসতে। বুঝলে? বলবে এমার্জেন্সি। যাও এখন, তাড়াতাড়ি যাবে।"

অস্কার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো। রশম্যান ঘরি দেখলো—দশটা পঞ্চাশ। যদি এগারোটার মধ্যে অস্কার গ্রামে গিয়ে পৌছাতে পারে, ডাক্তারকে নিয়ে আসতে আসতে অন্তত সোয়া এগারোটা বাজবে, তাহলেও মিলারকে ঠিক সময়মতো হয়তো জাগিয়ে তোলা যাবে যাতে তাকে দিয়ে ফোন করিয়ে তার সহযোগীকে থামানো যায়। অবশ্য বন্দুক উঁচিয়েই ডাক্তারকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। সময় একেবারেই কম। খুব দ্রুত হাতে রশম্যান হ্যাক্‌শ চালাতে

www.boiRboi.blogspot.com

থাকলো তার হাতকড়ির ওপর।

সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে অস্কার তার সাইকেলটা এক ঝটকায় তুলে নিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো জাগুয়ার গাড়িটা দেখে। দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো ইগনিশনে চাবিটা ঝুলছে। মনিব বলেছে তাড়াতাড়ি করতে। অতএব সাইকেল ছেড়ে সে গাড়িটাতে গিয়েই বসলো। নিমেষে স্টার্ট দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে স্পোর্টস কারটাকে সাঁই ক'রে নিয়ে চললো। থার্ড গিয়ারে তুলে যতো বেগে সম্ভব পিচ্ছিল রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালালো। চোখের পলকে রাস্তায় প'ড়ে থাকা টেলিগ্রাফ থামটার সঙ্গে গাড়িটার ধাক্কা লাগলো।

হাতকড়ার শিকলে করাত চালাচ্ছিলো রশম্যান, হঠাৎ শুনতে পেলো বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ। সেটা পাইন বন থেকে এসেছে। একটা দিকে হেলে ঘাড় উঁচু ক'রে গবাক্ষের ভেতর দিয়ে দেখলো বনের ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া উঠে আকাশে ছড়াচ্ছে। পথটা বা গাড়িটা তার দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেও বুঝতে দেরি হলো না, গাড়িটা গেছে। মনে পড়লো, তাকে জানানো হয়েছিলো মিলারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অথচ মিলার এখানে মেঝের ওপরে পড়ে আছে...তার দেহরক্ষী নিশ্চয়ই মারা গেছে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, আশার কোন আলো নেই। ফায়ারপ্লেসের ঠাণ্ডা লৌহময় কারুকাজে মাথাটাকে চেপে দু'চোখ বন্ধ করলো রশম্যান।

কয়েকবার নিঃশব্দে শুধু বিড়বিড় করলো, "তাহলে সব শেষ হয়ে গেছে!" কয়েক মিনিট পরে আবার করাত চালাতে আরম্ভ করলো। সৈন্যবাহিনীর জন্যে প্রস্তুত বিশেষ ধরনের ইস্পাত দু'টুকরো হয়ে আলগা হয়ে পড়তে এক ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় লাগলো। হ্যাক্‌শয়ের দাঁতগুলো এখন একেবারেই ভোঁতা হয়ে গেছে। মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এলো, ডান কব্জিতে শুধু একটা কড়া আঁটকানো। ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বাজলো।

হাতে সময় থাকলে নিশ্চয়ই মেঝেতে প'ড়ে থাকা দেহটাকে সজোরে লাথি মেরে যেতো, কিন্তু সময় একেবারেই নেই। দেয়াল-সিন্দুক থেকে পাসপোর্ট আর কয়েক বান্ডিল টাকা নিয়ে হাতব্যাগে কিছু কাপড়চোপড় ভরে সাইকেলে রওনা দিলো। জাগুয়ারের ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলো মৃতদেহটি তুষারে মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে, ধোঁয়া বের হচ্ছে তখনো। দু'পাশে কিছু পাইন গাছের ডালও ভেঙে পড়েছে।

গ্রামে পৌঁছে ট্যাক্সি নিলো সে; গন্তব্য ফ্রাংকফুর্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ফ্লাইট ইনফরমেশনের জানালায় এসে জানতে চাইলো :

"ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আর্জেন্টিনা যাবার ফ্লাইট আছে? না থাকলে..."

www.boiRboi.blogspot.com

অধ্যায় ১৮

ম্যাকেনসেনের মার্সিডিজটা যখন এস্টেটের ভেতরে এসে ঢুকলো তখন একটা বেজে দশ মিনিট। বাড়িটার উদ্দেশে যেতে গিয়ে অর্ধেক রাস্তায় এসে দেখলো পথ বন্ধ।

জাগুয়ারটার চাকাগুলো তখনো প্রান্ত দুটোকে একসঙ্গে আঁটকে রেখেছে। কিন্তু গাড়িটার মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত মাঝের পুরো অংশটা উধাও। সারা জায়গাটা জুড়ে সেগুলোর হাজার হাজার টুক্‌রো ছড়িয়ে আছে। গাড়িটার দুর্দশা দেখে ম্যাকেনসেনের মুখে হাসি ফুঁটে উঠলো। বিশ ফুট দূরে মাটির ওপরে পোড়া জামাকাপড়ের একটা স্তুপ পড়ে আছে। সেদিকে এগিয়ে গেলো ম্যাকেনসেন। লাশটার আকার দেখে তার কেমন সন্দেহ হলো। কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলো। তারপরেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটে চললো বাড়িটার দিকে। মার্সিডিজটা ওখানেই রইলো পড়ে।

সদর দরজায় ঘণ্টা না বাজিয়ে হাতল ধ'রে টান দিলে সহজেই খুলে গেলো সেটা। হলঘরের মাঝে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রইলো। কয়েক মুহূর্ত নাক টেনে ঘ্রাণ নিলো; যেনো সে একটা শ্বাপদজন্তু, জলাশয়ে পানি খেতে এসে বিপদের গন্ধ পেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। কোন শব্দ নেই কোথাও। বাম বগলের নিচ থেকে লুগার পিস্ত লটা বের ক'রে নিয়ে তার সেফটিক্যাচটা খুলে ফেললো। হল থেকে ভেতরে যাবার দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

প্রথম ঘরটা খাবারঘর, তার পরেরটা পড়ার। আধাখোলা দরজা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়লো মেঝের ওপরে একটা মনুষ্যদেহ। কিন্তু সেদিকে গেলো না। জানে এটা এক ধরনের কৌশল; টোপ সেজে একজন প'ড়ে থাকে আর দ্বিতীয়জন লুকিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা ক'রে। দরজার ফাঁক দিয়ে ভালো ক'রে ম্যাকেনসেন লক্ষ্য ক'রে দেখলো কেউ নেই। ঢুকে পড়লো ভেতরে।

মিলার চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা একদিকে হেলে রয়েছে। কয়েক মুহূর্ত তার ফ্যাকাশে সাদা মুখটার দিকে তাকিয়ে রইলো ম্যাকেনসেন। তারপ ঝুঁকে প'ড়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ নেবার চেষ্টা করলো। অনিয়মিত আর ক্ষীণ নিঃশ্বাস। মাথার পেছনে জ'মে থাকা চাপ-চাপ রক্ত, কার্পেটে রক্তের দাগ—ম্যাকেনসেন

www.boiRboi.blogspot.com

আন্দাজ ক'রে নিলো ব্যাপারটা কী ঘটেছিলো।

দশ মিনিট ধ'রে বাড়িটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলো সে। দেখলো শোবার ঘরের ড্রয়ারগুলো খোলা, টয়লেট থেকে দাড়ি কামানোর সরঞ্জামও উধাও। পড়ার ঘরে ফিরে এসে দেখলো দেয়াল সিন্দুকটাশূন্য।

ফোনটা তুলে নিলো সে। কয়েক মুহূর্ত কানে চেপে রেখে চাপা গলায় গালাগালি করলো। সিঁড়ির নিচে থেকে যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুঁজে নিতে কোন অসুবিধাই হলো না। যা যা দরকার সেগুলো নিয়ে মিলারের ওপর আরেকবার নজর বুলিয়ে খোলা জানালা টপকে নিচে নেমে গেলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো তার টেলিফোনের তারের ছেঁড়া প্রান্ত দুটো আবিষ্কার করতে। ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে সেগুলোকে টেনে বের ক'রে জোড়া লাগালো। নিজের হাতের কাজটুকু পরখ ক'রে নিয়ে যখন সন্তুষ্ট হলো, তখন আবার বাড়িটাতে ফিরে এসে ফোনটা তুললো। এবার ডায়ালটোন পেলো। নুরেমবার্গের নম্বরটা ঘোরালো সে।

ভেবেছিলো ওয়েরউল্‌ফ বোধহয় ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু ফোনে তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো যেনো বিশেষ কোন আগ্রহই নেই তার। যা যা দেখেছে সব তাকে জানিয়ে দিলো—ধ্বংস হয়ে যাওয়া গাড়ি, দেহরক্ষীর লাশ, কার্পেটে পড়ে থাকা ভোঁতা হ্যাক্‌শ ব্লেড, মেঝেতে অচেতন মিলার। বাড়ির মালিক যে নিরুদ্দেশ সে খবরও জানালো।

"বেশি কিছু নিয়ে যাননি তিনি, স্যার। রাত কাটাবার জন্যে কিছু জিনিসপত্র, আর খোলা সিন্দুক থেকে হয়তো কিছু টাকা। আমি সব পরিস্কার ক'রে রাখতে পারি, যদি চান তো উনি ফিরে আসতে পারেন।"

"না, উনি ফিরবেন না," ওয়েরউল্‌ফ জানালো, "তুমি ফোন করবার আগেই আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি ফোনে। ফ্রাংকফুর্ট বিমানবন্দর থেকে ফোন করেছিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে মাদ্রিদের ফ্লাইট ধরবেন। সেখান থেকে আজ সন্ধ্যাতেই বুয়েনোস আইরিসে..."

"কিন্তু তার দরকার কি?" ম্যাকেনসেন আপত্তি জানালো, "মিলারকে আমি কথা বলতে বাধ্য করবো, জেনে নেবো কাগজগুলো কোথায়। গাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তো কোন বৃফকেস নেই, ওর কাছেও না। শুধু মেঝেতে একটা ডায়রির মতো কিছু প'ড়ে আছে। বাকি কাগজগুলো নিশ্চয়ই কাছে কোথাও রেখে এসেছে।"

"না, বহু দূরে," ওয়েরউল্‌ফ বললো, "কোন একটা ডাকবাক্সে।"

ক্লান্ত বিষণ্ন সুরে ওয়েরউল্‌ফ ওকে জানিয়ে দিলো মিলার জালিয়াতটার কাছ থেকে কি জিনিস চুরি করেছিলো, আর ফ্রাংকফুর্ট থেকে ফোন ক'রে রশম্যান তাকে কি বলেছে। "ওই কাগজগুলো কাল সকাল অথবা মঙ্গলবারের মধ্যে কর্তৃপক্ষের হাতে গিয়ে পৌছাবে। তার পর থেকে ওই তালিকায় যাদের নাম আছে তারা সবাই যেকোন মুহূর্তে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পারে। তার মধ্যে আছে, তুমি এখন যে

www.boiRboi.blogspot.com

বাড়ি থেকে কথা বলছো তার মালিক রশম্যানের নাম, আমার নাম এবং আরো অনেকের। সারাটা সকাল ধ'রে আমি সবাইকে সাবধান ক'রে দিয়েছি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেনো তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়।"

"তাহলে...এখন আমরা কি করবো?" ম্যাকেনসেন জানতে চাইলো।

"স্রেফ উধাও হয়ে যাও। তোমার নাম নেই, কিন্তু তালিকায় আমার নাম আছে, অতএব আমাকে পালাতে হবে। তোমার ফ্ল্যাটে ফিরে যাও, যতোদিন না আমার লোক এসে তোমার সঙ্গে যোগযোগ করে। আপাতত, সব শেষ এখন। ভালকান পালিয়ে গেছে, আর ফিরবে না। তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিকল্পনাটা এখন বাতিল হয়ে গেছে, যদি না আর কেউ এসে সেটাকে সামাল দিতে পারে।"

"ভালকান কি? পরিকল্পনাটাই বা কি?"

"বলছি, এখন সবই শেষ হয়ে গেলো, বলতে আর আপত্তি কি? রশম্যানের ছদ্মনাম ভালকান, তাকেই মিলারের হাত থেকে বাঁচানোর ভার ছিলো তোমার ওপর..." সংক্ষিপ্ত কয়েকটা বাক্যে ওয়েরউল্‌ফ ওকে ভালকান, এবং প্রকল্পটি সম্বন্ধে সব বুঝিয়ে দিলো। শুনে শিস্ দিয়ে উঠলো ম্যাকেনসেন। মিলারের অনড় দেহের দিকে তাকিয়ে বললো, "আহ্, শালার বাচ্চা দেখছি সবাইকে একেবারে মেরে রেখে দিয়েছে।"

ওয়েরউল্‌ফ আবার তার গাম্ভীর্য যেনো খুঁজে পেলো। "ওখানকার সব কিছু পরিস্কার ক'রে রখো, কামেরাড, কোন চিহ্ন যেনো না থাকে। সেই যে একটা আবর্জনা পরিস্কারের দল তুমি একবার আনিয়েছিলে, মনে আছে?"

"হ্যা, তাদের কোথায় পাওয়া যাবে তাও আমি জানি। এখান থেকে বেশি দূরে নয়।"

"বেশ, তাদের ডেকে এনে সব সাফ করিয়ে রেখো। আবার বলছি, কোন চিহ্ন যেনো না থাকে। লোকটার বৌ আবার আজ রাতে ফিরে আসবে ওই বাড়িতে, সে যেনো কিছু টের না পায় কী ঘটেছিলো। বুঝেছো?"

"হ্যা, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"তারপরে তুমি হাওয়া হয়ে যাবে, বুঝলে? হ্যা, আরেকটা কথা, ওই খচ্চর মিলার শালাকে যাবার আগে খতম ক'রে যেও। একেবারে জন্মের মতো, বুঝেছো তো?"

ম্যাকেনসেন চোখ ছোট ক'রে মিলারের অচৈতন্য দেহের দিকে একবার তাকিয়ে, তারপর বললো, "হ্যা, বেশ আনন্দ পাবো তাতে।"

"আচ্ছা তাহলে বিদায়। তোমার সৌভাগ্য আশা করছি।"

ফোনটা নির্বাক হয়ে গেলো। ম্যাকেনসেন রিসিভারটা রেখে পকেট থেকে একটি নোটবুক বের ক'রে একটা নম্বর দেখে আবার ডায়াল করলো। ওদিকে থেকে জবাব এলে নিজের পরিচয় দিয়ে লোকটাকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে,

www.boiRboi.blogspot.com

কামেরাডশিপের জন্যে সে আগে কোন্ ভালো কর্ম করেছিলো, অতএব এবারেও আরেকবার তার সাহায্য বাঞ্ছনীয়। কোথায় আসতে হবে ব'লে জানিয়ে দিলো যে, এসে কি কি দেখতে পাবে।

"গাড়ি আর তার ভেতরের লাশটাকে পাহাড়ি রাস্তা থেকে অতল খাদের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। প্রচুর পেট্রোল ঢেলে দিও, বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয় যেনো। লোকটার দেহে কোন সনাক্ত-চিহ্ন রেখে যেয়ো না—পকেট হাতড়ে সব নিয়ে নিও, হাতঘড়িটাও।"

"বুঝলাম," ফোনের মধ্যে কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, "ট্রেলার আর উইঞ্চ নিয়ে আসবো।"

"হ্যা, আরেকটা কথা। বাড়ির পড়ার ঘরে দেখবে মেঝেতে আরেকটা লাশ। রক্তমাখা কার্পেটও পাবে। সেগুলো সরিয়ে ফেলবে। গাড়ির মধ্যে নয়, বড় একটা ঠাণ্ডা হ্রদের ভেতরে ফেলবে। ভালোমতো ওজন ঝুলিয়ে দেবে। কোন চিহ্ন যেনো না থাকে। বুঝলে?"

"হ্যা, ঠিক আছে। পাচটায় আসবো আমরা, সাতটায় চলে যাবো। দিনের আলোয় এ ধরনের মাল নিয়ে যেতে আমি রাজি নই।"

"বেশ," ম্যাকেনসেন বললো, "তোমরা আসার আগে কিন্তু আমি চলে যাবো। ঘাবড়ে যেয়ো না, যা ব'লে গেলাম ঠিক তাই দেখতে পাবে এখানে।"

টেলিফোন রেখে দিয়ে মিলারের কাছে এসে পিস্তলটা বের ক'রে গুলি আছে কিনা দেখে নিলো। নেহায়েতই অভ্যাসবশত, এর কোন প্রয়োজনই ছিলো না, জানতো গুলি ভরাই আছে।

এক হাত দূরে থেকে পিস্তলটা মিলারের অনড় কপালের ওপর তাক্ ক'রে ধরলো। দেহটাকে উদ্দেশ্য ক'রে শেষ গালি দিয়ে উঠলো, "শালা, শুয়োরের বাচ্চা!"

বছরের পর বছর ধরে বন্যজন্তুর জীবনযাপন ক'রে ম্যাকেনসেন আজ পেয়েছে বুনো চিতাবাঘের অনুভূতি, নইলে সেই কবেই তো শেষ হয়ে যেতো। তার অগুণতি বন্ধুবান্ধব আর শত্রুপক্ষের চর যেখানে মর্গের টেবিল শোভাবর্ধন করেছে সেখানে সে এখনও জীবিত, কারণ তার ওই হিংস্রজন্তুর প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তির বলে ঠিক এই মুহূর্তে সাই ক'রে ঘুরে গেলো খোলা জানালার দিকে, বন্দুক হাতে, অথচ জানালা থেকে যে অস্পষ্ট ছায়াটুকু এসে মেঝের কার্পেটে পড়েছিলো তা কিন্তু তার নজরেও পড়েনি। কিন্তু জানালার লোকটা নেহাতই অস্ত্রহীন।

"তুমি আবার কোন্ বানচোত?" চিৎকার ক'রে বললো ম্যাকেনসেন। বন্দুক উঁচিয়ে প্রতিরক্ষার ব্যূহের মধ্যেই নিজেকে কিন্তু ঢেকে রাখলো।

লোকটা নিচু খোলা জানালাটায় দাঁড়িয়ে ছিলো। মোটরসাইকেল আরোহীর মতো পরনে কালো চামড়ার প্যান্ট আর জ্যাকেট। বাম হাতে হেলমেটটা ধরে

www.boiRboi.blogspot.com

সেটাকে পেটের ওপর চেপে ধ'রে রেখেছে। ম্যাকেনসেনের পায়ের কাছে শায়িত দেহটার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে তার বন্দুকের দিকে চোখ রাখলো।

নির্দোষ ভঙ্গীতে শুধু বললো, "আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।"

"কে ডেকেছে?" চিৎকার ক'রে বললো ম্যাকেনসেন।

"ভালকান," লোকটা জানালো, "আমার কামেরাড, রশম্যান।"

ঢোক গিলে নিয়ে ম্যাকেনসেন বন্দুকটা নামিয়ে ফেললো।

"ওহ্! তা, তিনি তো চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন?"

"সব ফেলে চলে গেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার দিকে আছেন এখন। পরিকল্পনাটা পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেছে। আর এ সবের জন্যে দায়ি এই শালার রিপোর্টার।"

আবার বন্দুকের নলটা মিলারের দিকে তাক্ ক'রে ধরলো।

"ওকে শেষ ক'রে দিচ্ছো?" লোকটি জানতে চাইলো।

"নিশ্চয়ই। শালার বেজন্মার বাচ্চা আমাদের পরিকল্পনার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। রশম্যানের পরিচয় ফাঁস ক'রে দিয়ে অনেক কাগজপত্রও পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। হারামজাদা! তোমার নামও যদি ওই ফাইলে থাকে, কেটে পড়ো বাবা, এক্ষুণি।"

"কোন্ ফাইল।"

"ওডেসা ফাইল।"

"না, আমি সে ফাইলে নেই।"

"আমিও নেই।" ফুঁসে উঠলো ম্যাকেনসেন, "কিন্তু ওয়েরউল্ফ আছে, আর তার আদেশ হলো এই ব্যাটাকে খতম ক'রে দেয়া।"

"ওয়েরউল্ফ?"

ম্যাকেসেনের মনের মধ্যে ছোট্ট একটা বিপদঘণ্টা বাজতে শুরু করলো। তাকে একটু আগেই বলা হয়েছে, জার্মানিতে এক ওয়েরউল্ফ আর সে ছাড়া আর কেউই ভালকান প্রকল্পের খবর জানে না। আর যারা জানে তারা সবাই দক্ষিণ আমেরিকায় আছে। ধরেই নিয়েছিলো আগন্তুক সেখান থেকে এসেছে কিন্তু তাহলেও তো তার ওয়েরউল্ফের কথা জানা উচিত। চোখ দুটো কুঁচকে গেলো তার। প্রশ্ন করলো, "তুমি বুয়েনোস আইরিস থেকে এসেছো?"

"না।"

"কোত্থেকে এসেছো তাহলে?"

"জেরুজালেম।"

ম্যাকনসেনের আধ সেকেন্ড লাগলো কথাটার তাৎপর্য বুঝতে। কিন্তু মরার জন্য আধ সেকেন্ডই যথেষ্ঠ। লুগার তুলে গুলি ছুঁড়তে গিয়েছিলো সে কিন্তু তার আগেই

www.boiRboi.blogspot.com

হেলমেটের ভেতরকার ফোম রবার পুড়িয়ে ওয়ালথারের গুলি এসে লাগলো তাঁর বুকে। ৯ মিলিমিটারের প্যারাবেলাম গুলিটা একটুও গতি শ্লথ না ক'রে ফাইবার গ্লাসের ভেতর দিয়ে অবাধে এসে ম্যাকেনসেনের বুকে বিদ্ধ হলো। হেলমেটটা মাটিতে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো লোকটার ডান হাত থেকে নীল ধোঁয়ার কুয়াশা চিঁড়ে আবার গুলি বেরিয়ে আসছে।

ম্যাকেনসেনের দেহ যেমন বড়, তেমনি তার শরীরের শক্তি। বুকে গুলি লাগা সত্ত্বেও সে গুলি করতো। কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা এসে তার ডান ভুরুর দু'ইঞ্চি ওপরে কপাল ফুটো ক'রে ঢুকে গেলো। তাতেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো ম্যাকেনসেন, আর সেজন্যে মারাও গেলো।

সোমবার বিকেলের দিকে ফ্রাংকফুর্ট জেনারেল হাসপাতালের একটা প্রাইভেট ওয়ার্ডে মিলারের জ্ঞান ফিরলো। আধ ঘণ্টা চুপচাপ প'ড়ে থাকার পর একটু একটু ক'রে চেতনার উন্মেষ হলো। বুঝতে পারলো মাথায় পুরু ব্যান্ডেজ। বিছানার কাছে দেখলো একটা গোল সুইচ। দাবিয়ে দিতেই একজন নার্স এসে হাজির হলো। ওকে চুপচাপ শুয়ে থাকার উপদেশ দিয়ে গেলো সে, কারণ ওর মাথা থেকে নাকি প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

কাজেই নিরবে শুয়ে থাকলো। আস্তে আস্তে মাঝ সকাল পর্যন্ত গতকালের ঘটনাগুলো টুকরো টুকরো মনে পড়লো। তারপর সব ফাঁকা। কয়েকবার আবার ঘুম এলো। জাগলো যখন তখন বাইরে অন্ধকার আর বিছানার পাশে ব'সে আছে এক লোক। লোকটা তার দিকে চেয়ে হাসলো।

মিলার তার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো। তারপর বললো, "আপনাকে তো আমি চিনি না।"

"কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।"

মিলার ভাবতেই থাকলো। অল্প অল্প অস্ফুট ভাবনা মিলেমিশে একাকার। অবশেষে বললো, "হ্যা, আপনাকে আমি দেখেছি। অস্টারের বাড়িতে, লিও আর মোট্টির সঙ্গে।"

"ঠিক। আর কি মনে পড়ছে?"

"প্রায় সবকিছুই। স্মৃতি ফিরে আসছে।"

"রশম্যান?"

"হ্যা, তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। পুলিশকে ডাকতে যাচ্ছিলাম।"

"রশম্যান পালিয়ে গেছে। দক্ষিণ আমেরিকায়। সব কিছু এখন শেষ। কাহিনী সমাপ্ত! বুঝতে পারছেন?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো মিলার। "না, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বিরাট কাহিনী পেয়েছি আমি। লিখবো এখন।"

সাক্ষাৎপ্রার্থীটির মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো। ঝুঁকে পড়লো সে। "শুনুন, হের মিলার। আপনি নিতান্তই শৌখিন একজন, বেঁচে যে আছেন সেটা আপনার ভাগ্য। কিছুই লিখতে যাবেন না। তার একটা কারণ হলো, লেখার মতো কিছুই নেই আপনার কাছে। টউবেরের ডায়রি আমি পেয়েছি, সেটা আমি সঙ্গে ক'রে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, কারণ সেখানেই ওটাকে মানায়। কাল রাতে আমি সেটা পড়েওছি। আপনার জ্যাকেটের পকেটে একজন আর্মি ক্যাপ্টেনের ছবি পেয়েছি। আপনার...বাবা, তাই না?"

মাথা নাড়লো মিলার।

"তাহলে ওটাই কারণ। তাই না?" ইস্রায়েলের চরটি প্রশ্ন করলো।

"হ্যা।"

"ওহ্! যাক্, আমি কিন্তু দুঃখিত। মানে, আপনার বাবার ব্যাপারে। ভাবিনি কোন জার্মান সম্বন্ধে এই কথাটা আমি কোনদিন বলবো। হ্যা, এখন ফাইলের ব্যাপারটা কি, বলুন তো? ওটা কি জিনিস?"

মিলার তাকে বিস্তারিত বলে গেলো।

"যাক্‌গে, তাহলে আমাদের হাতে দিলেন না কেন? আপনি সত্যিই খুব অকৃতজ্ঞ। এতো কষ্ট ক'রে আপনাকে ওখানে ঢোকালাম আমরা, আর যেই কিছু পেলেন সোজা নিজের লোকের হাতে তুলে দিলেন। ওই খবরগুলো আমরা কতো কাজে লাগাতে পারতাম জানেন।"

"কারো না কারো কাছে তো ওগুলো পাঠাতে হোতোই, সিগির মাধ্যমে। তার মানে, ডাক মারফত। আপনারা আবার এতোই চালাক যে লিও'র ঠিকানাটা পর্যন্ত আমাকে দেননি।"

জোসেফ মাথা নাড়লো। "ঠিক আছে। আপনার কিন্তু কোন কাহিনী নেই বলবার মতো। কোন প্রমাণই নেই। ডায়রিটা চলে গেছে, ফাইল গেছে। শুধু আপনার মুখের কথাই রইলো। কেউ বিশ্বসা করবে না এদেশে, এক ওডেসা ছাড়া। আর তারা আবার তাহলে আপনার পেছনে লাগবে। হয়তো সিগি বা আপনার মা, তাঁরাই হয়ে উঠবে তাদের লক্ষ্যবস্তু। জানেন তো, ওরা কি নির্মম?"

এক মুহূর্ত কি যেনো ভাবলো মিলার। "আমার গাড়িটা কোথায়?"

"ওহ্! ভুলে গিয়েছিলাম, আপনি খবরটা জানেন না।"

গাড়িতে বোমা বসানোর কথাটা বললো জোসেফ। কেমন ক'রে সেটা ধসে গিয়েছিলো, সেই খবরও দিলো।

"বললাম না ওরা ভীষণ নির্মম, একেকটা বদমায়েশ। গাড়িটাকে খাদের মধ্যে পাওয়া গেছে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়। আরোহীর দেহ সনাক্ত করা যায়নি, তবে আপনার নয়। আপনার কাহিনী হলো, জনৈক ব্যক্তির অনুরোধে আপনি তাকে লিফট দিয়েছিলেন, সে আপনাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে মেরে আপনার গাড়ি নিয়ে পালায়।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

হাসপাতালের তারা স্বীকার করবে, একজন মোটরসাইকেল আরোহী রাস্তার পাশে আপনাকে প'ড়ে থাকতে দেখে অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছিলো। আমাকে অবশ্য তারা চিনতে পারবে না; তখন আমার মাথায় ছিলো হেলমেট, চোখে গগল্‌স্‌। সরকারী বিবৃতি এইটাই এবং এইটাই টিকে থাকবে। পাকাপাকি বন্দোবস্ত যাতে হয় সেজন্যে আমি ঘণ্টা দুই আগে জার্মান প্রেস এজেন্সিকে টেলিফোন ক'রে ভাব দেখিয়েছি যেনো আমি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ, এই কাহিনী তাদের বিবৃত করেছি। বলেছি, আপনি অজ্ঞাত কোন হিচহাইকার কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন, দুর্বৃত্তটি আপনার গাড়ি নিয়ে যখন পালিয়ে যাচ্ছিলো তখন দুর্ঘটনায় প'ড়ে গাড়িসহ ধ্বংস হয়ে গেছে।"

জোসেফ উঠে দাঁড়ালো, যাবার জন্যে তৈরি সে। মিলারের দিকে চোখ নামিয়ে বললো, "মনে হচ্ছে আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না, কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার ভাগ্য খুব ভালো। আপনার বান্ধবীর কাছ থেকে, বোধহয় আপনারই নির্দেশমতো, খবরটা যখন পাই তখন বেলা দুপুর। উন্মত্তের মতো মোটরসাইকেল নিয়ে মিউনিখ থেকে ওই পাহাড়ি টিলার বাড়িটায় আসি। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পৌছাই, আড়াই ঘণ্টায়। একদম কাঁটায় কঁটায়। কারণ কাঁটার এক চুল এদিক ওদিক হলে আপনি মরতেন। এক ব্যাটা বন্দুক উঁচিয়ে আপনাকে গুলি করতে যাচ্ছে যখন ঠিক তখনই আমি পৌছালাম।"

ঘরে গিয়ে দরজার হাতলে হাত রাখলো সে।

"আমার একটা উপদেশ আছে আপনার জন্যে। গাড়ির বীমা দাবি করুন, একটা ফোক্‌সওয়াগন কিনুন, হাম্বুর্গে ফিরে যান, সিগিকে বিয়ে করুন, বাচ্চাকাচ্চা হোক, সাংবাদিকাতার পেশায় লেগে থাকুন। পেশাদারদের সঙ্গে কখনো চ্যালেঞ্জে যাবেন না।"

জোসেফ চলে যাবার আধ ঘণ্টা পরে নার্স ফিরে এলো। "আপনার জন্যে একটা টেলিফোন এসেছে।"

সিগির ফোন। শুধু কান্না আর হাসি, হাসি আর কান্না। অজ্ঞাতনামা কেউ তাকে ফোন ক'রে জানিয়েছে, পিটার ফ্রাংকফুর্ট জেনারেল হাসপাতালে আছে।

"এক্ষুনি রওনা হচ্ছি, এই মুহূর্তে।" টেলিফোন রেখে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটা বাজলো।

"মিলার? আমি হফম্যান বলছি। এক্ষুনি সংবাদ-প্রচার-বার্তার টেপে দেখলাম, তোমার মাথায় চোট লেগেছে? ভালো আছো তো?"

"ভালো আছি, হের হফম্যান," মিলার জানালো।

"বাহ্‌! কতো দিনে সেরে উঠছো?"

"কয়েক দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবো। কেন?"

"ভালো খবর আছে, তুমি ঠিক পারবে। বুঝলে, জার্মানির কিছু বড়লোকের কন্যা স্কি কররেত গিয়ে সবসময় সুদর্শন তরুণ স্কি-শিক্ষকদের দিয়ে পেট বাঁধিয়ে

ফেলছে। বাভারিয়ায় একটা ক্লিনিক আছে তাদের গর্ভপাত ক'রে দেয়—বেশ মোটা ফি নেয়, বাপের কাছে একটি কথাও জানানো হয় না। মনে হচ্ছে তরুণ ষাঁড়গুলোর সঙ্গে ক্লিনিকের একটা সম্পর্ক আছে, বেশ কিছুটা ভাগ তারাও পায়। উত্তেজনায় ভরা কাহিনী, বুঝলে—*বরফে ব্যভিচার* কিংবা *আবার ল্যান্ডে অনাচার*। কবে আরম্ভ করতে পারবে?"

মিলার ভেবে নিলো। "পরের সপ্তাহে।"

"বাহ্, বেশ ভালো! হ্যা, শোনো, ওই যে, তোমার ওই নাৎসি-শিকার, তাতে পেলে কিছু? লোকটাকে খুঁজে পেয়েছিলে? কোন কাহিনী-টাহিনী আছে নাকি?"

"না, হের হফম্যান," আস্তে ক'রে মিলার বললো, "কোন কাহিনীই নেই।"

"নেই? আচ্ছা, ঠিক আছে। হাম্বুর্গে দেখা হবে তাহলে।"

ফ্রাংকফুর্ট থেকে জোসেফের বিমান লন্ডন হয়ে তেল আভিভের লদ বিমানবন্দরে যখন পৌছালো তখন মঙ্গলবার সন্ধ্যা। সবে গোধুলি নেমেছে। গাড়িতে ক'রে দু'জন লোক এসে তাকে তুলে নিয়ে গেলো হেড কোয়ার্টারে। কর্নেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলো যিনি করমর‍্যান্ট থেকে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছেন। প্রায় রাত দুটো বেজে গেলো আলোচনা শেষ হতে হতে; স্টেনোগ্রাফর সবকিছু লিখে নিলো। কাজ শেষ হলে কর্নেল পিঠ এলিয়ে বসলেন আয়েশ ক'রে। চরটিকে একটি সিগারেটও দিলেন।

বললেন "ভালোই কাজ করেছো। আমরাও কারখানাটা পরীক্ষা ক'রে দেখে কর্তৃপক্ষের কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—বেনামে অবশ্য। গবেষণা বিভাগটা উঠিয়ে দেয়া হবে। জার্মান কর্তৃপক্ষ যদি নাও দেন তো আমরা দেবো। বৈজ্ঞানিকরা জানতো না কাদের হয়ে কাজ করছে তারা। তাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করবো, বেশির ভাগই রাজি হয়ে যাবে তাদের গবেষণার ফলাফল নষ্ট ক'রে ফেলতে। কারণ তারা জানে কাহিনীটি যদি প্রচার হয়ে যায় তবে তাদের সমস্যা হবে, জার্মানিতে আজ জনমত ইস্রায়েলের পক্ষেই আছে। অন্যান্য শিল্প-উদ্যোগে তারা কাজ পেয়ে যাবে, মুখ বন্ধ রাখবে। বনও মুখ খুলবে না, আমরাও না। মিলারের খবর কি?"

"সেও মুখ খুলবে না। কিন্তু রকেটগুলোর কি হচ্ছে?"

মুখ দিয়ে কর্নেল ধূয়া ছাড়লেন। বাইরের দিকে চেয়ে আকাশে তারার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

"আমার মনে হয় ওগুলো আর উড়বে না। অন্তত ৬৭'র গ্রীষ্মকালের মধ্যে নাসেরকে তৈরি হতেই হবে। ভালকান কারখানার গবেষণাকর্ম যদি বন্ধ হয়ে যায় তো অন্য একটা কেন্দ্র স্থাপনা ক'রে রকেটগুলোর গাইডেন্স সিস্টেম বানানো ৬৭'র

www.boiRboi.blogspot.com

গ্রীষ্মের আগে কিছুতেই সম্ভব নয়।"

"তবে তো বিপদ কেটেই গেছে।"

কর্নেল হাসলেন। "বিপদ কখনো কাটে না। শুধু রূপ বদলায়। হয়তো এই বিশেষ বিপদটি কেটে গেছে, কিন্তু বড়গুলো এখনো আছে। হয়তো আমাদের আবার যুদ্ধে নামতে হতে পারে, সেটা শেষ হলে আবার। যাক্, তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত। বাড়ি যাও এখন।"

দেরাজ খুলে তিনি কিছু পোশাক এগিয়ে দিলেন। লোকটিও ততোক্ষণে টেবিলের ওপরে তার জাল জার্মান ছাড়পত্র, টাকাকড়ি, মানিব্যাগ, চাবির গোছা সব রেখে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পোশাক ছেড়ে নিলো। জার্মান পোশাকগুলো ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর কাছে জমা দিয়ে গেলো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্নেল স্মিত মুখে তার আপদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে বললেন," দেশে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি, মেজর ইউরি বেন শাউল।"

নিজের বেশভূষা নিজের পরিচয়ে ফিরে এসে খুব স্বস্তি পাচ্ছে মেজর। ১৯৪৭-এ ইস্রায়েলে এসে পালমাখে ঢুকে এই পরিচয় প্রথম গ্রহণ করেছিলো, এটাই আজ তার নিজস্ব পরিচয়।

ট্যাক্সি নিয়ে শহরতলীতে নিজের ফ্ল্যাটে চলে এলো সে। এইমাত্র তার যে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ছিলো ফ্ল্যাটের চাবি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। অন্ধকার শয়নকক্ষে স্ত্রী রিভকার ঘুমন্ত দেহটা ছায়া-ছায়া দেখা যাচ্ছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা কম্বলটাও উঠছে নামছে। বাচ্চাদের ঘরে উঁকি মেরে এলো। ওরাও ঘুমাচ্ছে, তার দুই ছেলে, ছয় বছরের শ্লমো আর দু'বছরের দভ।

বৌয়ের পাশে গিয়ে বিছানায় ঢুকতে ভীষণ ইচ্ছা করছিলো। কয়েকদিন ধরে ঘুমাবে। কিন্তু এখনো একটা কাজ বাকি। হাতের বাক্সটা রেখে দিয়ে চুপচাপ পোশাক ছাড়লো। অন্তর্বাস এবং মোজা ছেড়ে ফেলে কাপড়ের আলমারি খুলে কাপড়চোড় পরলো। ইউনিফর্মের প্যান্টটা পরে নিয়ে কালো চক্‌চকে বুটের ফিতা বাঁধলো। খাকি শার্ট আর টাই বেঁধে নিয়ে তার ওপর ব্যাটল জ্যাকেট পরে নিলো সে। তার একদিকে শোভা পাচ্ছে প্যারাট্রুপ অফিসারের ইস্পাত-চক্‌চকে পাখা আর পাঁচটা লাড়াইয়ের রিবন—সিনাই এবং সীমান্তের অপর পারের যুদ্ধের স্মারক।

সবশেষে মাথায় পরে নিলো লাল বেরেট টুপিটা। পোশাক পরা তার এখনকার মতো শেষ। একটা ব্যাগে কিছু জিনিস ভরে নিলো। বাইরে বেরিয়ে নিজের গাড়িতে যখন উঠলো তখন পূব আকাশে সামান্য রূপালী আলোর রেখা।

ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখ হয়ে গেছে সেদিন। শীতের মাস শেষ হতে আর মোটে তিন দিন বাকি। তবু মৃদু মৃদু হাওয়া বইছে, সুন্দর বসন্তের আগমনীবার্তা যেনো আকাশে বাতাসে।

www.boiRboi.blogspot.com

তেল আভিভের পূর্বদিক ধরে গাড়ি চালিয়ে জেরুজালেমের রাস্তায় এসে পড়লো। ভোরের শান্তসমাহিত এই ক্ষণটুকু তার খুব ভালো লাগে, চারদিকে কেমন অদ্ভুত শান্তি আর পরিচ্ছন্নতা। মরুভূমিতে পাহারা দিতে দিতে কতোবার এরকম মুহূর্তের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে; কতোবার কতো অরুণোদয় দেখেছে; মৃদু বাতাসে স্নিগ্ধ হয়ে গেছে দেহ; ভয়াবহ জ্বালাময় তাপের সূচনাও নেই, না হানাহানি-ঈর্ষা-দ্বেষ-মৃত্যুর দিনের মধ্যে এইটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ক্ষণ।

দু'পাশের সমতল উর্বর ভূমি, তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে জুদিয়ার গৈরিক পাহাড়ের দিকে। রামলে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো গ্রামটা জাগছে। রামলের পরে সেই সব দিনে ছিলো লাক্রুন সেলায়েন্তর ঘুরে একটা বাঁক, জর্ডানের সৈন্যবাহিনীকে এড়িয়ে যাবার জন্যে। মাইল পাঁচেকেরও বেশি ঘুরতে হোতো সেই পথটা দিয়ে। বাম দিকে দেখতে পেলো আরব লিজিয়নের জন্যে নাস্তার যোগাড় হচ্ছে। নীল ধোঁয়ার নরম পালক ছড়াচ্ছে বাতাসে।

জেরুজালেমের শেষ গিরি যখন অতিক্রম করলো, তখন আবু গশ গ্রামে অল্প কয়েক জন আরব মাত্র ঘুম ভেঙে উঠেছে। সূর্য এখন পূর্ব দিগন্ত ছাড়িয়ে দ্বিধাবিভক্ত শহরটি আরব অংশের পবর্তশীর্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে।

তার গন্তব্যস্থল ছিলো ইয়াদ ভাশেমের সমাধি মন্দির। গাড়িটাকে প্রায় পৌনে এক মাইল দূরে রেখে বাকি পথটুকু হেটেই গেলো। রাস্তার দু'পাশে উঁচু উঁচু গাছ, যারা বানাতে সাহায্য করেছিলো সেই ভিনধর্মী লোকদের স্মৃতিতে রোপিত। বিশাল সিংহদ্বারে এসে পৌছালো, ঝক্‌ঝকে পিতলের তৈরি। যাট লক্ষ ইহুদি মৃত্যুকে বরণ করেছিলো পবিত্রভূমিতে ধর্মের এই কীর্তি স্থাপনা করতে।

বৃদ্ধ দ্বাররক্ষক তাকে জানালো, এখনো সময় হয়নি খোলার। কিন্তু যখন বোঝালো কি চায় সে, আর আপত্তি করলো না। স্মৃতিগৃহের ভেতর দিয়ে যাবার সময় দু'পাশে চেয়ে চেয়ে দেখলো। পরিবার পরিজনদের জন্যে আগেও প্রার্থনা জানাতে এসেছে এখানে, কিন্তু এই ঘরের বিরাট বিরাট গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালগুলো তাকে সব সময়ই অভিভূত করে।

রেলিংয়ের কাছে এগিয়ে গেলো। ধূসর পাথুরে মেঝেতে কালো কালো অক্ষরে লেখা নামগুলো দিকে চেয়ে দেখলো। হিব্রু এবং রোমান, দু'রকম অক্ষরই রয়েছে। বেদীতে আলো নেই, কিন্তু অনির্বাণ দীপশিখাটি কৃষ্ণপাত্র থেকে তখনো জ্বলছে।

সেই আলোয় মেঝের ওপরে লেখা নামগুলো নজরে পড়ছে। অজস্র নাম : *অটসউইৎস, ত্রেব্লিঙ্কা, বেলসেম, র‍্যাভেনসব্রুখ, বুখেনওয়াল্ড*...সংখ্যাতীত। অবশেষে পেলো যা খুঁজছিলো। *রিগা*।

মাথায় ইয়ারমুলকা ঢাকবার প্রয়োজন ছিলো না, কারণ তার মাথায় রয়েছে লাল বেরেট। সেটাই যথেষ্ট। ব্যাগ থেকে একটা রেশমী শাল বের করলো— ট্যালিথ। আলটনার বৃদ্ধ লোকটির জিনিসপত্রের মধ্যেও এই রকম একটা শাল দেখেছিলো

www.boiRboi.blogspot.com

মিলার, কিন্তু সেটা কী বস্তু বুঝতে পারেনি। কাঁধে জড়িয়ে নিলো ট্যালিথ।

ব্যাগ থেকে প্রার্থনাপুস্তক বের ক'রে এনে ঠিক জায়গামতো খুললো। পিতলের রেলিংয়ের কাছে গিয়ে এক হাতে রেলিংটাকে আঁকড়ে ধ'রে অন্য হাতে প্রার্থনাপুস্তক নিয়ে, শাশ্বত দীপের জাজ্বল্যমান শিখার দিকে তাকিয়ে পাঁচ হাজার বছরেরও পুরনো স্তোত্র থেকে আবৃত্তি করলো :

'ইসগাদ্দাল
ভেয়িসকাদ্দাস
শেমেয় রাব্বাহ...'

এইভাবে তার মৃত্যুর একুশ বছর পরে, ইস্রায়েলি সৈন্যবাহিনীর একজন মেজর, প্রতিশ্রুত পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, সলোমন টউবেরের আত্মার উদ্দেশ্যে খাদ্দিশ পাঠ করলো।

এই পৃথিবীর সব ঘটনাপুঞ্জ সুন্দরভাবে শেষ হলে ভালোই হোতো। তবে তা খুব কমই ঘটে। মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ে জন্মে আবার মরে যায়। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলোর বেলায়ও ঠিক তাই ঘটেছিলো।

পিটার মিলার বাড়ি ফিরে গিয়ে সিগিকে বিয়ে ক'রে সাংবাদিকতায় মনোনিবেশ করে। লোকজন সকালের নাস্তায় কিংবা চুল কাটতে গিয়ে যেসব খবর পড়তে চায় সে ঐসব লেখাই লিখতো। ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মে সিগি তার তৃতীয় সন্তান প্রশব করে।

ওডেসার সদস্যরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এডুয়ার্ড রশম্যানের স্ত্রী দেশে ফিরে আসে এবং পরবর্তীতে তার স্বামীর কাছ থেকে একটি চিঠি পায়। তাকে জানানো হয় সে আর্জেন্টিনায় আছে। কিন্তু তার স্ত্রী তার কাছে ফিরে যেতে অস্বীকার করে। ১৯৬৫ সালে সে তার স্বামীর কাছ থেকে ডির্ভোসের জন্যে আর্জেন্টিনার আদালতে আবেদন করে। সেই আদালতে তার দাবি মঞ্জুর হবার আগেই জার্মানির আদালত তার ডির্ভোস মঞ্জুর করে দেয় ১৯৬৬ সালে। এখনও সে তার নিজের বিবাহপূর্ব নাম মিলার নিয়ে বসবাস করছে। জার্মানিতে হে নামটি হাজার হাজার নামের সাথে যুক্ত। লোকটার প্রথম স্ত্রী হেলা এখনও অস্ট্রিয়াতে বসবাস করছে।

ওয়েলউলফ তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি ক'রে দিয়ে স্পেনের ফরমেনতারিয়া দ্বীপে একটি এস্টট কিনে সেখানে বসবাস করছে।

রেডিও কারখানাটি বিক্রি ক'রে দেয়া হয়। হেলওয়ান রকেট প্রকল্পের সকল বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্পকারখানায় চাকরি জুটিয়ে নেয়। রশম্যানের সমগ্র পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

হেলওয়ানের রকেট কখনও আকাশে ওড়েনি। যদিও ফিউজলেজ আর জ্বালানী তৈরিই ছিলো। ওয়ারহেডগুলোও ছিলো নির্মানাধীন। যথাযথ গাইডিং সিস্টেমের অভাবে রকেটগুলো কোনো কাজেই আসেনি। ছয় দিনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ওগুলো মরুভূমিতে ধ্বংস ক'রে ফেলা হয়।

ওডেসার ফাইলটি প্রকাশিত হয়ে পড়লে এর সদস্যরা বিপদে পড়ে যায়। একজন আইনজীবি এর তদন্তে নেমে পড়ে, গঠিত হয় জেড-কমিশন।

চ্যান্সেলর এরহাদ ১৯৬৪ সালের শেষের দিকে ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে প্রবল চাপে প'ড়ে দেশব্যাপী একটি ইসু জারি করেন যাতে এসএস'র সম্পর্কে এবং তাদের অবস্থানের ব্যাপারে তথ্য দেবার জন্যে সবার কাছে আবেদন জানানো হয়। এই আবেদনে এতো বেশি সাড়া পাওয়া যায় যে, জেড-কমিশনকে রীতিমতো ভীমরি খেতে হয়। এই সব তথ্য বিশ্লেষণ ক'রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কয়েক বছর লেগে যায়। জার্মান-ইসরায়েল অস্ত্রচুক্তির পেছনে যেসব রাজনীতিক ছিলেন তাদের মধ্যে চ্যান্সেলর এ্যাডোনোয়ের বন এবং তাঁর প্রিয় নদী রাইনের কাছাকাছি রনডোর্ফ'র ভিলায় ১৯৬৭ সালের ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত বসবাস করেছেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেনগুরিয়েন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নেসেটের সদস্য ছিলেন। অবসরে গিয়ে অনেক বিষয়ে কথা বললেও হেলওয়ান রকেট এবং জার্মান বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে কখনও কিছু বলেননি। এই কাহিনীতে বর্ণিত সিক্রেটসার্ভিসের এজেন্টদের মধ্যে জেনারেল আমিত ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। আরব-ইসরায়েল'র ছয় দিন ব্যাপী যুদ্ধে তার গেয়েন্দা রিপোর্ট বেশ কাজে লেগেছিলো।

সাইমন উইজেন্থাল এখনও ভিয়েনাতে বসবাস করছে এবং এসএস'র সদস্যদের পাকড়াও করার কাজে ব্যস্ত আছে। এ কাজে সে বেশ সফলই হয়েছে বলা চলে। ১৯৬৮ সালে লিও মৃত্যুবরণ করলে তার দলের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

• • •

দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা। অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল। দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে।

যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল। আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে। সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন।

আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন ayan.00.84@gmail.com এ। আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন। এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন।

মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেষ্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা।

বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন। আপনাদের জীবন বইয়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম।

মোবাইলঃ 8801734555541
8801920393900